জাতপাতের রাজনীতি

সুজিত সেন সম্পাদিত

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ১৯৮৯

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৯

প্রচ্ছদ
অমিয় ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ওয়েলনোন প্রিন্টার্স
কলকাতা ৯

মুদ্রক
নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
দি শিবদুর্গা প্রিন্টার্স
৩২ বিডন রো
কলকাতা ৬

মা-বাবাকে

সব লোকে কয়, লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে, জাতির কি রূপ, দেখলাম না এই নজরে॥
কেউ মালা কেউ তসবী গলে
তাইত রে জাত ভিন্ন বলে
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কারের।
ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারীর তবে কি হয় বিধান
বামন চিনি পৈতের প্রমাণ
বামনী চিনি কি প্রকারে।
জগৎ বেড়ে জাতির কথা
লোকে গল্প করে যথাতথা
লালন বলে, জাতির ফাৎনা
ডুবিয়েছি সাধ-বাজারে॥

সূচি

প্রাসঙ্গিক

রাজনীতিতে জাতপাতের অস্তিত্ব ভারতীয় ব্যবস্থার যেন এক অনিবার্য অঙ্গ। নতুন গণতান্ত্রিক বাতাবরণ ও সমাজবাদী ভাবাদর্শ এই বিষবৃক্ষের মূলে আঘাত হানতে সমর্থ হলেও এদেশের নির্বাচনমুখী রাজনীতিক বাস্তবতা একে ক্রমশ জটিল রূপে দিয়েছে ও দিচ্ছে। তাই বিভিন্ন রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব ও সমাজতাত্ত্বিক বুদ্ধিজীবীর কাছে তা আজ বিশেষ আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ নিয়ে দেশে-বিদেশে বিশেষ গবেষণার আবহ গড়ে উঠেছে। জাতপাতের রাজনীতি নিয়ে বাংলায় / ইংরেজিতে কিছু পুস্তক লেখা হয়েছে। কিন্তু কোনো রচনাতেই ভারতীয় রাজনীতির মঞ্চে জাতপাতের ভূমিকাটির সম্যক মূল্যায়নধর্মী সবিশেষ বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির সামগ্রিকতা চোখে পড়েনি। আলোচ্য সংকলনে বিভিন্ন মতাবলম্বী বুদ্ধিজীবীর বক্তব্যকে একই সূত্রে গ্রথিত করার চেষ্টা হয়েছে। সম্পাদক হিসেবে আমার সামাজিক-প্রাতিস্বিক অভিজ্ঞান : আজকের এই ক্রান্তিমুহূর্তে ভারতীয় রাজনীতিতে জাতপাতের ভূমিকাটি সম্যকরূপে বুঝতে গেলে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিই সবচেয়ে যুগোপযোগী এবং তা অসংকোচে গ্রহিষ্ণু। তবে এক্ষেত্রে আমরা একই সঙ্গে বামপন্থী শিবিরের বিভিন্ন পথ-অনুসারী এবং মুক্তমনের অধিকারী র‍্যাডিকাল মানবতাবাদী সমস্ত বুদ্ধি-জীবীকেই সমান মর্যাদা দিয়েছি : কারো মতকেই ছোট করে দেখা হয়নি। আমরা মনে করি : দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সমস্যাকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার অধিকার বা আগ্রহ সবারই রয়েছে এবং অনিবার্যভাবেই তা থাকা দরকার। এদিক থেকে ভারতের রাজনীতিক সাহিত্যের একটি অবহেলিত বিষয়ের এটি এক অনন্য ও অবশ্যপ্রয়োজনীয় সংকলন।

বাহুল্য সত্ত্বেও উল্লেখ্য, সংকলনটি দুটি অংশে বিভক্ত : জাতপাতের রাজনীতির সাধারণ বক্তব্যভিত্তিক প্রবন্ধগুলি প্রথম অংশে (১) স্থান পেয়েছে এবং দ্বিতীয় অংশ (২) জাতি সমস্যার বিশেষ বিশেষ দিক সম্পর্কে পরিচয় বহন করছে। পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার জন্য এই পরিকল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

একটি কথা জানানো খুবই দরকার : সংকলনের বিভিন্ন প্রবন্ধে জাত ও জাতি পরিভাষাদুটি একই ধারণার ইঙ্গিতে বাহিত হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানে যদিও এই দুটি পরিভাষার দ্যোতনা / ব্যঞ্জনা ভিন্নমুখী : কাস্ট-এর অর্থ জাত আর নেশন-এর তর্জমা জাতি।

বর্তমান সংকলন সম্পর্কে আর একটি কথা অবশ্যই বলা প্রয়োজন : ভারতবর্ষে জাতপাতের রাজনীতির আরো অনেক বিশেষ দিক ছিল। সেই দিকগুলি আমরা বিভিন্ন বাস্তব কারণে আলোচনার চৌহদ্দিতে নিয়ে আসতে পারিনি। সম্পাদক হিসেবে আমি যা দিতে পারিনি তা ইতিমধ্যে অন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তি দিতে পারেন তো ভালোই নতুবা বারান্তরে সময় ও সুযোগ পেলে আমারই ইচ্ছে রইলো সেই ঘাটতি পূরণ করবার। আপাতত পাঠকের কাছে এটুকুই নিবেদন।

সুজিত সেন

পরিচায়িকা

১

বাঙালির ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে বর্ণ-বিন্যাসের সঙ্গে রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে বিভিন্ন বর্ণের সম্বন্ধের কথা আলোচনা করেছেন নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বর্ণ' ও রাষ্ট্র' প্রবন্ধে। তিনি দেখিয়েছেন ঃ বাঙালির ইতিহাসের আদিপর্বে ব্রাহ্মণ ও করণ-কায়স্থদের প্রভাবই রাষ্ট্রে সর্বাপেক্ষা বেশি কার্যকর ছিল। অম্বষ্ঠ-বৈদ্যদের প্রভাবও হয়তো সময়ে সময়ে কিছু কিছু ছিল, কিন্তু সর্বত্র সমভাবে ছিল এবং খুব সক্রিয় ছিল, এমন মনে হয় না। বৈশ্যবৃত্তিধারী বর্ণের লোকেরা রাষ্ট্রে অষ্টম শতক পর্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন, কিন্তু পরে তাঁদের প্রভাব কমে যায় এবং তাঁদের কোনো কোনো সম্প্রদায়, সৎশূদ্র পর্যায় থেকেও পতিত হয়ে পড়েন। কৈবর্তদের একটি সম্প্রদায় কিছুদিন রাষ্ট্রে খুবই প্রভাবশালী ছিলেন এবং পরেও সে-প্রভাব খুব সম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। আর কোনো বর্ণের কোনো প্রভাব রাষ্ট্রে ছিল বলে মনে হয় না।

বি টি রণদিভে তাঁর 'জাত-পাত, শ্রেণী ও সম্পত্তি সম্পর্ক' প্রবন্ধে জাতপাতের কুসংস্কার ও তার বিরুদ্ধে লড়াইকে শ্রেণীগত ও সম্পত্তি সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। উনিশ ও বিশ শতকের রাজনীতিক ও আর্থনীতিক ঘটনাবলীও এক্ষেত্রে বাদ যায় না। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির ক্রমবর্ধমান উপলব্ধি, জাতপাত-বিরোধী আন্দোলন ও বিদ্রোহ—এই সব কিছুই ছিলো একটি একক প্রক্রিয়ার অঙ্গ। লেখক বলছেন ঃ সাধারণ নিপীড়কের বিরুদ্ধে ব্যাপক ও তীব্র সংগ্রামের মাধ্যমেই কেবল জাতপাত-বিভেদের অবসান তথা জাতপাতগত সমতার ভিত্তি রচিত হতে পারে। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আলোকে কৃষি বিপ্লবের ওপর কমিউনিস্টরা গুরুত্ব প্রদান করতে পারলেই জাতপাতব্যবস্থার ভিত্তি ও দুর্গে প্রকৃত আঘাত হানতে পারবে। উল্লেখ্য ঃ মরগান ও এঙ্গেলসের ধারা বহন করে প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

'বর্ণাশ্রমী মানসিকতা বনাম শ্রেণীচেতনা' প্রবন্ধে প্রখ্যাত পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানী ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দেখিয়েছেন ঃ বর্ণাশ্রমী মানসিকতাই ভারতীয় জনমানসে প্রবল হয়ে উঠেছে—শ্রেণীচেতনা বিশেষ কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। বর্ণাশ্রমী মনোবৃত্তি জিইয়ে রাখার মূলে আছে আমাদের পুরোনো ঐতিহ্য ও বেদ-পুরাণের প্রতি অন্ধভক্তি, অবতারদের কার্যকলাপের প্রতি যুক্তিহীন শ্রদ্ধা। লেখক মনে করেন, 'কাস্ট'কে শুধু 'সোশ্যাল ফোর্স' হিসেবে গণ্য করলেই চলবেনা। 'কাস্ট'-এর মনস্তাত্ত্বিক শক্তিকেও স্বীকার করতে হবে, 'কাস্টিজম'-এর মানসিকতার বিশ্লেষণ ও 'কাস্ট প্রেজুডিস' পরিবর্তনের জন্য বস্তুবাদীভিত্তিক মনোবিদ্যার অনুশীলন ও আলোচনা করার প্রয়োজনকে স্বীকার করে নিতে হবে। সর্বোপরি, ভারতীয় চেতনা

থেকে জাতপাতকে দূর করতে গেলে তাবৎ প্রগতিবাদীদের সুসংগঠিত আর্থ-রাজনীতিক ও সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক আন্দোলন দরকার।

কি প্রতিক্রিয়াশীল, কি প্রগতিশীল—যে-কোনো রাজনীতিই জাতপাতের প্রকোপে পীড়িত। ভারতীয় জাতিসত্তাগুলির নিজস্ব বিশেষ বিশেষ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলির মোকাবিলার চেষ্টার সঙ্গে ব্যাপক আর্থনীতিক সংগ্রামের সমন্বয়সাধন করে শ্রেণীসংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য যে অনুশীলন ও গভীর মনীষার প্রয়োজন এদেশে বামপন্থী নেতৃত্বে তা অনুপস্থিত। এরপরে আবার যে নতুন প্রজন্ম আসবে যদি সময়োপযোগী বামপন্থী মতাদর্শ ও যথাযোগ্য কর্মসূচি এতদিনে উদ্ভূত হয় তাহলে হয়তো তাদের একত্রিত করে ভারতবর্ষের আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের লড়াইকে শ্রেণীসংগ্রামের রাস্তায় ফিরিয়ে আনা যাবে। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'জাতপাত ও ভারতীয় রাজনীতি' প্রবন্ধে এই বক্তব্যের এক বাস্তব-ধর্মী অনুভবী বিশ্লেষণ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

জাতিভেদের উচ্ছেদের জন্য কী ধরণের আচরণ ও আন্দোলনের প্রয়োজন আছে সেই বিষয়ের অবতারণা করেছেন অশোক রুদ্র তাঁর 'জাতিপ্রথা বিরোধিতা' নামক প্রবন্ধে। এই প্রথার পূর্ণ নিরাময়ের জন্য আশু প্রয়োজন মানুষের মনের আমূল পরিবর্তন। যে সমস্ত বামপন্থীরা দাবি করেন যে, সব সামাজিক সমস্যার সমাধান রাতারাতি হয়ে যাবে একবার প্রোলেতারিয়েত শ্রেণী রাজনীতিক ক্ষমতা দখল করলেই, তাঁদের ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। উনিশ ও বিশ শতকের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের সুফল হিসেবেই পশ্চিমবাংলায় জাতিপ্রথার দৌরাত্ম্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় কিছুটা শিথিল। বর্তমান কালেও এই ধরণের গণআন্দোলন প্রয়োজন। এবং আন্দোলনের লক্ষ্য হওয়া উচিত তথাকথিত নিচু জাতের লোকেদের প্রতি দয়ামায়া প্রদর্শন নয়, জাতিপ্রথাটার আমূল উচ্ছেদ। এবং এর প্রাথমিক পদক্ষেপ হওয়া উচিত 'পদবি বর্জন'।

'তথাকথিত নিচুজাত বলে কিছু নেই প্রকৃত হিন্দু ধর্মে।…'—এই দাবি করে যারবেদা কারাগারে আমরণ অনশন করেছিলেন গান্ধীজী, অর্ধশতাব্দী আগে। তাঁর ডাকে সেদিন সাড়া দিয়েছিলেন আম্বেদকার, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ উচ্চশিক্ষিত জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীরা। কিন্তু স্বাধীনতার চল্লিশ বছরের ইতিহাসে জাতপাত সাম্প্রদায়িকতা থেকে ভারতের মুক্তি ঘটেনি। ভারতের বামপন্থীরা, বিশেষত কমিউনিস্টরাই, গ্রামে এবং শহরে দুর্গত মেহনতী মানুষদের এই শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকেই ঐক্যবদ্ধ করেছেন জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে, শোষিত শ্রেণীভিত্তিতে, পরিচালিত করেছেন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের পথে। তেভাগার শ্রেণীসংগ্রাম এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তথাপি এরই পাশাপাশি কেন মহামারীর মতো বেড়েই চলেছে সারাভারতে সাম্প্রদায়িক ও জাতপাতের বিরোধ ও হিংস্র তাণ্ডব? কি তাদের শক্তির উৎস? কোথায় বিপ্লবী বামপন্থার দুর্বলতা?

তা না বুঝলে সমস্যার প্রতিকার একান্ত অসম্ভব। 'সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাতের সমস্যা ও শ্রেণীসংগ্রাম' প্রবন্ধে এইসব জটিল প্রশ্নের উত্তর নিরসনে ব্রতী হয়েছেন লেখক গৌতম চট্টোপাধ্যায়।

জাত এবং শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক কি? বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি-সম্পর্কের বর্তমান বিকাশ, নাগরিককরণ এবং বিভিন্ন জাতের সামাজিক গতিশীলতার সঙ্গেই বা এর সম্পর্ক কি? এইসব গুরুতর প্রশ্নের অবতারণা করে লেখক প্রদীপ বসু তাঁর 'জাতি, শ্রেণী ও আজকের ভারত' প্রবন্ধে বলছেন: আমরা যদি ভাবি জাতই হলো আসল, শ্রেণী এবং অর্থনীতি কিছু নয়—তাহলে কিন্তু ভুল হবে। আর্থনীতিক সংকট, বেকারী, কৃষিতে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন এবং অতিশূদ্র জাতের সামাজিক গতিশীলতার কারণে সমাজে এমন এক সংকট উপস্থিত হয়েছে যার প্রতিফলন জাতি দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপে দেখা যাচ্ছে। আর্থনীতিক এবং সামাজিক পরিবর্তন, শ্রেণী-বিশ্লেষণ এবং উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনই আজকের এই সমস্যার ওপর আলোকপাত করতে পারবে। অবশ্য এই বিচার করতে গিয়ে আমরা ভারতবর্ষের বিশেষ ঐতিহাসিক এবং সামাজিক অবস্থা নিশ্চয়ই ভুলে যাবো না।

'সাম্প্রতিক ভারতে জাত ও শ্রেণী' প্রবন্ধে লেখক অঞ্জন ঘোষ একটি মৌলিক সমাজতাত্ত্বিক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন: ভারতের বর্তমান রাজনীতিক বাস্তবতায় জাত কি লোপ পেয়ে যাচ্ছে এবং জাতের জায়গায় মানুষের যোগ্যতা অনুযায়ী সমাজবিন্যাসের ফলে কি শ্রেণীর উদ্ভব হচ্ছে? এর উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন এইভাবে: রাষ্ট্রের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা আদায় করার প্রশ্নে বা রাজনীতির ক্ষেত্রে মানুষকে সংঘবদ্ধ করার ব্যাপারে জাতের উপযোগিতা এখনো যথেষ্ট রয়েছে। তথাপি সম্প্রতিকালে জাত-শ্রেণী মিথষ্ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন জাতের সমাহারে শ্রেণীসদৃশ জাতসংঘের উদ্ভব হচ্ছে। বিভিন্ন জাত পৃথক পরিচয় পরিহার করে যত একত্রিত এবং সংঘবদ্ধ হবে জাত সম্পর্কে ধারণা ততই বদলাতে থাকবে। সকল নিপীড়িত গোষ্ঠীর আনুভূমিক সংঘবদ্ধতা গড়ার প্রয়াসে ভারতীয় সমাজের নিজস্ব বিশিষ্টতাদ্যোতক শ্রেণীগঠনের ইঙ্গিত আছে। এই অভিনব শ্রেণীর মধ্যে জাতের পরিচয় থেকে যেতে পারে, কিন্তু তাতে শ্রেণীসংঘর্ষ ব্যাহত হবে না।

স্নেহময় চাকলাদার রচিত 'পশ্চিমবঙ্গে জাতব্যবস্থার প্রকৃতি ও বামফ্রন্ট সরকারের নীতি' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য হলো: ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজনীতি জাতপাত ও বর্ণবিরোধের দ্বারা পীড়িত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাত ও বর্ণের প্রভাব নেই বললেই চলে। এর কারণ জানতে হলে অতীতের দিকে মুখ ফেরানো দরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের আনুপূর্বিক পর্যালোচনা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে তিনি পশ্চিমবঙ্গের জাতপাতের ভিত্তিমূলক উচ্ছেদের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকারের বর্তমান নীতির কথা উল্লেখ করেছেন। লেখকের মতে: বামফ্রন্ট সরকার জাতপাতের সমস্যাটিকে মূলত উৎপাদন-

সম্পর্কের ক্ষেত্রে শোষিত শ্রেণীর সমস্যা হিসেবে দেখে থাকেন। তাই তাত্ত্বিক দিক থেকে এই সরকার কৃষিবিপ্লবের জন্য আমূল পরিবর্তনকামী শ্রেণীসংগ্রামের ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'জাত-জাতি-জাতীয়তা' নামক প্রবন্ধে এস. এন. শ্রীনিবাস এর 'সংস্কৃতায়নের' ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন : এই প্রক্রিয়ায় দেখা যেত যে নিম্নতর জাতি উচ্চজাতির আচার-ব্যবহার আদবকায়দা অনুকরণ করে দাবি জানাচ্ছে, আমরা মোটেই নিকৃষ্ট নই, ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে আমরা উচ্চজাতিরই সমান। এই প্রক্রিয়া একটা সামাজিক অবস্থানগত পরিবর্তন আনতে পারলেও কোনো কাঠামোগত রদবদল আনতে পারেনি। ইদানিং কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত একটা দাবি শোনা যাচ্ছে। নিম্নজাতি আর বলে না, ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে আমরা উচ্চের সমান। বরং বলে আমরা পৃথক, অবদমিত, বঞ্চিত। অর্থাৎ নিচুজাতি আজ আর্থিক-রাজনীতিক দিক থেকে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তারা স্থিতাবস্থা ভাঙতে চায়। তত্ত্ববাহী মানুষেরা সংগ্রামী ভূমিকা নিচ্ছে। এই বক্তব্য সমাজমনস্ক লেখকের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও যূথচেতনার পরিচয় বহন করে।

আর্য সভ্যতার শুরু থেকে জাতপাতের ভেদ-বৈষম্য আজও অব্যাহত। আমাদের দেশে এপর্যন্ত বর্ণ তথা বর্গবিভেদের বিরুদ্ধে জাতে জাতে লড়াই যত না হয়েছে তার চেয়ে শ্রেণীসংগ্রামের অস্তিত্ব খুব কমই চোখে পড়ে। কিন্তু জাতপাতের রাজনীতির ভিত্তি নিহিত রয়েছে প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে। কৃষিবিপ্লবের মধ্য দিয়ে তার বিলুপ্তি ঘটিয়েই কেবল জাতপাত-ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটানো সম্ভব। এর জন্য জাত-বর্ণ-বর্গ-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গেই শ্রেণীসংহতি গড়ে তুলতে হবে। মানুষের মুক্তির জন্য চাই প্রকৃত সংগ্রামীমোর্চা। 'বর্গের লড়াই বনাম বর্ণের লড়াই' নিবন্ধে লেখক দীপংকর চক্রবর্তী অত্যন্ত দৃঢ়তার সংগে এই উপলব্ধি আমাদের সামনে হাজির করেছেন।

২

'তপশীলী, আদিবাসী ও এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ' শীর্ষক বিশেষ প্রবন্ধে মহাশ্বেতা দেবী তথ্য ও তত্ত্বের সাহায্যে আদিবাসীদের কাজ পাবার সমস্যাটি তুলে ধরেছেন : সাঁওতাল গ্রাজুয়েট হতে পারেন, এক্সচেঞ্জে নাম লেখাতে পারেন, তবু কাজের সুযোগ তিনি পান না। নাম লেখানো ছেলে-মেয়েদের গ্রামে প্রাথমিক স্কুল খোলা হয়, শিক্ষক নেয়া হয়, শিক্ষাপ্রাপ্ত আদিবাসী কিন্তু বেকারই থেকে যান। তারপর বহুবছর ব্যর্থ প্রতীক্ষার পর ওঁরা শিক্ষাতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এখানে আদিবাসীর চাকরির সমস্যা মেটাবার জন্য 'সংরক্ষণ নীতি' চালু করা হয়েছে। মজা হচ্ছে, 'এইসব আসন সংরক্ষিত,' এ ঘোষণা কিন্তু সত্যি সত্যি আদিবাসীর বেকার সমস্যার সমাধানে কোনো সাহায্য বলতে গেলে করছে না।-

ঘোষণাটি আদিবাসীর ক্ষেত্রে প্রহসনমাত্র। এই প্রেক্ষাপটের সূত্রধরে লেখক সাম্প্রতিক ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের উৎস সন্ধানে ব্রতী হয়েছেন: পুরুলিয়ার বংশীর মতো কোনো শিক্ষাপ্রাপ্ত, নাম লেখানো তপশীলী বা আদিবাসীকে যদি তেরো বছরেও এক্সচেঞ্জ থেকে ডাকা না হয়, তাঁদের মনে হবে যে তাঁরা ইচ্ছাকৃত নির্মম ঔদাসীন্যের ফলে অবহেলিত হচ্ছেন। তখন তাঁরা কেন বিক্ষুব্ধ হবেন না? বিক্ষোভের কারণ অপসারণ করলেই তো হয়।

শিবনারায়ণ রায় তাঁর 'ফুলে থেকে আম্বেদকার: এক অসমাপ্ত বিপ্লব' প্রবন্ধে বলতে চেয়েছেন—জ্যোতিরাও ফুলে ও ভীমরাও রামজী আম্বেদকার জাতপাতক্লিষ্ট হিন্দু সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী বিস্ফোরণের স্বাক্ষর রেখেছেন এবং তাঁদের অনিবার্য সীমাবদ্ধতা ও স্ববিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও অস্পৃশ্যতা ও জাতপাতের অসারতাকে স্বীকার করে বেদ ও ধর্মকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন।

'কৃষক আন্দোলন ও জাতপাত' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রবীণ কৃষক নেতা অনন্ত মাজী দেখাতে চেয়েছেন: যেহেতু আমাদের ব্যক্তিমানস, সমাজজীবন ও রাষ্ট্রিক কর্মকাণ্ড জাতপাতের প্রভাব থেকে এখনো মুক্ত হয়নি সেহেতু ভারতের কৃষক আন্দোলনও তার শিকার হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সংবিধানগত অধিকার কার্যকর করতে গেলে ব্যাপক কৃষক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন জরুরি। জাতপাতের প্রভাবমুক্ত ভারত গড়তে হলে বিভিন্ন ধরণের শোষণ বন্ধ করে বিভিন্ন জাতপাতের গরিব ও মেহনতী মানুষদের জীবন-জীবিকা, বাস্তুজমিতে নিরাপত্তা আনা বিশেষ প্রয়োজন।

'জাতপাত ও ট্রেডইউনিয়ন' প্রবন্ধে তিমির বসু তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রামী বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে চেয়েছেন: যদিও শ্রমিক আন্দোলন, বলা ভালো ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন তেমনভাবে জাতপাত-কণ্টকিত হয়নি কিন্তু সংগঠকদের ক্ষেত্রে সমস্যা যথেষ্টই রয়েছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশে অসমানতা রয়েছে, তারতম্য রয়েছে জাতপাতের প্রভাবে। তুলনামূলকভাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাতের প্রভাব কম সন্দেহ নেই। কিন্তু উচ্চবর্ণের আধিপত্য নেই—একথা একেবারেই ভিত্তিহীন। ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনে জাতপাত-সংক্রান্ত বিষয় তেমনভাবে আলোচিত হয় না তার কারণ লাল ঝাণ্ডা ইউনিয়ন ব্যাপারটার ওপর তেমন কোনো গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু ট্রেডইউনিয়ন সংগঠকদের প্রতি পদে জাতপাত, প্রাদেশিকতা এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের মোকাবিলা করতে হয়।

'পশ্চিমবঙ্গের লোধাশবর' প্রবন্ধে মহাশ্বেতা দেবীর মূল বক্তব্য এই রকম: লোধাশবর পশ্চিমবঙ্গের অবহেলিত উপেক্ষিত নির্যাতিত ও দলিত উপজাতিগুলির মধ্যে অন্যতম। এঁদের জীবিকার ভিত্তি ছিলো মূলত অরণ্যনির্ভর। কিন্তু বর্তমানে অবিরাম, নির্মম বন উচ্ছেদের ফলে বনভূমি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ফলে আজ তাঁরা বর্তমান ক্ষুধিত বর্বর সময়ের নাগপাশে ধরা পড়ে কোনমতে অস্তিত্বটুকু

টিকিয়ে রাখার জন্য লড়ছেন, হেরে যাচ্ছেন, তবু লড়ছেন। উল্লেখ্য যে, লোধাদের জীবনে দারিদ্র্যই একমাত্র অভিশাপ নয়। ব্রিটিশরা একসময় এঁদের 'অপরাধপ্রবণ' বলে আখ্যা দিয়েছিল এবং সাধারণ মানুষেরা আজও তাঁদের সেই চোখেই দেখে। রাজনীতিক দলগুলির এই ক্ষুদ্র উপজাতিদের অস্তিত্ব অবহেলা করার মুখ্য কারণ হলো এঁদের মধ্যে ভোটার সংখ্যা মাত্র কয়েক হাজার। নিম্নসংখ্যক হবার ফলে এঁরা কোনো দলেরই কাজে লাগছেন না। তাহলে লোধা সমস্যার সমাধান কিসে? লেখিকার মতে, বহু ব্যয়সাধ্য বৃহৎ পরিকল্পনা দিয়ে সমাধান আসবে না। লোধারা নিজেরাই গ্রামকে গ্রাম সমীক্ষা করে ছোট ছোট স্কীম করুক: লোধাদের উন্নয়নের দায়িত্ব লোধাদেরই দেয়া হোক। একটু উৎসাহ, একটু সাহায্য, একটু নির্দেশ পেলে ও'রা নিজেরাই এসব স্কীমকে বাস্তব রূপ দিতে পারবেন। বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার মধ্যেই যেভাবে হোক, বেঁচে থাকার একটা পথ খুঁজতে লোধারা আজ মরিয়া। লোধাদের ভালোবাসতে হবে, শ্রদ্ধা দেখাতে হবে, তাঁদের তিলে তিলে বোঝাতে হবে, যে সমাজে বাস করছেন আপনারাও তার এক অংশ। এই লেখাগুলি প্রকাশের পরে লোধা উন্নয়নে সে একটা ইতিবাচক লক্ষণ দেখা দিয়েছে তা মহাশ্বেতা 'সংযোজন' অংশে উল্লেখ করেছেন।

মনুষ্যত্বই মানুষের একমাত্র পরিচয় হওয়া উচিত ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে তা হয়নি: জাত-সম্প্রদায়ের গণ্ডী সৃষ্টি হয়েছে মানুষের পরিচয়ের ভিত্তি হিসেবে। মুসলিম সমাজও এর থেকে মুক্ত নয়। তবে এই সমাজের গঠনবিন্যাস ততোটা প্রাচীন নয় বলেই হিন্দুসমাজের মতো জাতপাতের প্রশ্নটি খুব একটা প্রকট হয়ে ওঠেনি। আমরা যারা প্রগতির কথা বলি তাঁদেরও এমন সদিচ্ছা নেই যাতে এই স্থূল জাত্যভিমান দূরীভূত হয়ে একটি রক্ষণশীলতামুক্ত আধুনিক সমাজ গড়ে উঠতে পারে। মানুষ যদি এই জাতপাতের শৃঙ্খলমুক্ত না হয় তবে সেই মানুষকে নিয়ে যে রাষ্ট্র, যে সমাজ, যে রাজনীতি—তা বৈষম্যময় হয়ে উঠতে বাধ্য। 'ইসলাম, জাতপাত ও প্রগতি' প্রবন্ধে লেখক রফিউদ্দিন তাঁর এই গভীর অনুভবী বিশ্লেষণ সবার সামনে হাজির করেছেন।

বাসব সরকার তাঁর 'দলিত রাজনীতি প্রসঙ্গে' তাত্ত্বিক আলোচনায় এইসব প্রশ্ন ও তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন: দলিত রাজনীতি বলতে কী বোঝায়? এর সূচনা কবে থেকে? দলিত আন্দোলন কেন বিপ্লবী বামপন্থী সংগ্রামের থেকে আলাদা? দলিত সমস্যা ও আন্দোলন ভারতে আমূল আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সংগ্রামে কীভাবে অন্বিত হবে?

'বর্ণ, বর্গ, মার্কসবাদ: মুক্তির পথ নবদলিত বিপ্লব?' প্রবন্ধে এ. কে. রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ জটিল সমস্যা ও তার সমাধানের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন: ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিতে এখনো পর্যন্ত জাতপাতের প্রশ্নটি জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে। এমনকি মার্কসবাদীরাও এই বর্ণদ্বন্দ্বের প্রকোপ থেকে পুরোপুরি মুক্ত নন। ভারতে তাই কোনো সমাজবিপ্লবের অভাবে বর্ণব্যবস্থাকে

ভেঙে বর্গব্যবস্থা হয়নি। বর্ণব্যবস্থাই কিছু উপরের পরিবর্তনের সঙ্গে আজকের বর্গব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্গ এবং বর্ণ সমার্থবোধক। শুধু তাই নয় বর্ণের নামে অত্যাচার দমন বর্গের নামে অত্যাচার দমনের থেকে অনেকগুণ বেশি। সমাজে এই জাতপাতের প্রত্যাবর্তন শ্রমের মর্যাদা যাও একটু প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল তাকে পিছনে ঠেলে দিয়েছে। কমিউনিস্টরা জনবাদী কিংবা নবজনবাদী বিপ্লবের কথা বলেন সেটা পুঁজিবাদী এবং সমাজবাদী বিপ্লবের যোগফল। কিন্তু ভারতবর্ষের বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে এটা এক সামাজিক এবং সমাজবাদী বিপ্লবের যোগফল হবে যাকে আমরা নবদলিত বিপ্লব সংজ্ঞা দিতে পারি যেটা এদেশে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এক রূপ হবে।

'অস্পৃশ্যতা ও রাজনীতি' নামক প্রবন্ধে লেখক হিতেশরঞ্জন সান্যাল তাঁর বক্তব্য এইভাবে বিশ্লেষণ করেছেন: শুচি অশুচির ভাব সব সমাজে সর্বকালেই আছে। কিন্তু হিন্দুসমাজে শুচি-অশুচিবোধ অতিশয় প্রবল ও ব্যাপক। অস্পৃশ্যতার অমানবিকতা এরই পরিণাম। অস্পৃশ্যতার নাগপাশ থেকে মুক্তির প্রশ্নে আজপর্যন্ত কোনো সার্বিক রাজনীতিক আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। অস্পৃশ্যতার বোধ বৃত্তি-সাপেক্ষ। বৃত্তির পরিবর্তনে অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে চেতনাও পাল্টায়। অস্পৃশ্য হিসেবে কিঞ্চিৎ দাক্ষিণ্যলাভ বা নির্বাচনী রাজনীতিতে হীন কৌশল দ্বারা নেতৃবৃন্দের মমতাভোগ বৃহত্তর অস্পৃশ্য সমাজের পক্ষে মুক্তির উপায় হতে পারে না। সকলের জন্য মানুষের মর্যাদা চাই। সমগ্র অস্পৃশ্য সমাজের আত্মশক্তির উদ্‌বোধন ভিন্ন তা সম্ভব নয়। এর জন্য ধৈর্যসহকারে দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের প্রয়োজন। কবে কিভাবে সে সংগ্রাম আরম্ভ হবে তা জানি না। প্রস্তুতির কোনো ইঙ্গিত এখনো নেই।

'আমরা দেশবাসী নই, আমরা আদিবাসী। যা বলতে পারেন, যারা দেশবাসী নয়, তারাই আদিবাসী।'—কথাগুলি একজন আদিবাসীর। ঔপনিবেশিক জনতত্ত্বে যাঁদের নাম 'আদিবাসী' এবং গান্ধীবাদী দৃষ্টিতে 'হরিজন' এই দেশের জনসম্প্রদায়ের সেই এক-চতুর্থাংশ মানুষ বিয়াল্লিশ বছরের স্বদেশী শাসনে যথার্থ 'দেশবাসী' হয়ে ওঠার মর্যাদা কি পেয়েছেন? এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে কমলেন্দু ধরের রচনা 'দেশবাসী আর আদিবাসী'।

লেখক সৌরীন ভট্টাচার্য তাঁর 'ম্যাক্স হেবার ও ভারতে জাতপাতের প্রশ্ন' নামক প্রবন্ধে বিখ্যাত জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনীতিবিদ ম্যাক্‌স ভেবারের দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতবর্ষে জাতপাতের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি নিয়ে এক মনোগ্রাহী তাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। এই দীর্ঘ প্রবন্ধেরই একটি অংশ: জাতি ও আদিবাসী। এই অংশে আদিবাসীর সঙ্গে প্রতিতুলনায় জাতির তফাত নির্দেশ করতে গিয়ে ম্যাক্‌স ভেবার যে পাঁচটি প্রধান চরিত্রের উল্লেখ করেছেন প্রাবন্ধিক তারই সমগ্র আলোচনা করেছেন। এবং শেষে বলেছেন: ম্যাক্‌স ভেবারের সমসাময়িকদের

প্রায় সত্তর বছর পরে এসেও দেখা যাচ্ছে ভারতে জাতপাতের প্রশ্নটি এখনো শিথিল হয়নি। কালাপানি পার হওয়া আজ আর কোনো ব্যাপার নয় ঠিক, তবে ছায়া মাড়ালে জাত যাওয়া তো আজও সত্যি। একুশ শতকের মুখে দাঁড়িয়েও আজ এই জাতপাত থেকে মুক্তির কোনো দিশা দেখা যাচ্ছে না।

'হিন্দুসমাজে জাত ও বর্ণব্যবস্থা' নামক প্রবন্ধে লেখক আনন্দগোপাল গুপ্ত প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত হিন্দুসমাজের জাত ও বর্ণব্যবস্থাকে সংস্কৃতায়নের আলোকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এবং পরিশেষে এই আশা পোষণ করেছেন সে বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই জাত ও বর্ণপ্রথা লোপ পেয়ে এক জাতপাত-হীন ও বর্ণপ্রথামুক্ত নতুন সমাজ আগামী দিনে প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রায় নব্বই বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন 'শূদ্রশাসনের' প্রতিষ্ঠা। এই শূদ্রশ্রেণীর অস্তিত্ব ও জাগরণ সম্পর্কে বিবেকানন্দ কী ধারণা পোষণ করেছেন মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তারই ওপর এক নতুন আলোকপাত করার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে স্বজিত সেনের প্রবন্ধ ঃ বিবেকানন্দ ও তাঁর শূদ্র শ্রেণী। উল্লেখ্য, সোভিয়েত দেশে বহু-বিতর্কিত পেরেস্ত্রৈকা ও গ্লাসনস্তের প্রসঙ্গটি এই প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে সম্যক বিবেচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

বর্ণ ও রাষ্ট্র

নীহাররঞ্জন রায়

বাঙালীর ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে বর্ণ-বিন্যাসের সঙ্গে রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে বিভিন্ন বর্ণের সম্বন্ধের কথা এখানে আলোচনা করা হইতেছে।

বাংলাদেশে গুপ্তাধিপত্যের আগে এই সম্বন্ধের কোনও কথাই বলিবার উপায় নাই; তথ্যই অনুপস্থিত। গুপ্তাধিকারের কালে ভুক্তির রাষ্ট্রযন্ত্রে অথবা বিষয়াধিকরণে কিম্বা স্থানীয় অন্য রাষ্ট্রাধিকরণের কর্তৃপক্ষদের মধ্যে যাঁহাদের নামের তালিকা পাইতেছি তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রায় নাই বলিলেই চলে। ভুক্তিপতি বা উপরিকদের মধ্যে যাঁহাদের দেখা মিলিতেছে তাঁহারা কেহ চিরাতদত্ত, কেহ ব্রহ্মদত্ত, কেহ জয়দত্ত, কেহ কুলবৃদ্ধি ইত্যাদি; ইঁহাদের একজনকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে হয় না। বিষয়পতিরা বা তৎস্থানীয়রা কেহ বেত্রবর্মণ, কেহ স্বয়ম্ভুদেব, কেহ শণ্ডক; ইহাদের মধ্যে বেত্রবর্মণ ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করিতে পারেন; স্বয়ম্ভুদেব সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন, ব্রাহ্মণ হইলে হইতেও বা পারেন, শণ্ডক যে অব্রাহ্মণ এ-অনুমান সহজেই করা চলে। তারপরেই নিঃসন্দেহে যাঁহারা রাজকর্মচারী তাঁহারা হইতেছেন পুস্তপাল এবং জ্যেষ্ঠ বা প্রথম কায়স্থ। ইঁহাদের কাহারও নাম শাম্বপাল, কাহারও কাহারও নাম দিবাকরনন্দী, পত্রদাস, দুর্গাদত্ত, অর্কদাস, করণ কায়স্থ নরদত্ত, স্কন্দপাল ইত্যাদি। এই সব নামও ব্রাহ্মণেতর বর্ণের, সন্দেহ করিবার কারণ নাই। অন্তত একজন করণ-কায়স্থ নরদত্ত যে সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন, সে-পরিচয় পাইতেছি। কুমারামাত্যদের মধ্যে একটি নাম পাইতেছি বেরজ্জস্বামী—যিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া কতকটা নিঃসংশয়ে বলা চলে। পুস্তপাল ও জ্যেষ্ঠ বা প্রথম কায়স্থদের সঙ্গে যাঁহারা স্থানীয় অধিকরণের রাষ্ট্রকার্য পরিচালনায় সহায়তা করিতেন তাঁহারা হইতেছেন নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ এবং প্রথম কুলিক; ইঁহাদের নামের তালিকায় পাওয়া যায় ধৃতিপাল, বন্ধুমিত্র, ধৃতিমিত্র রিভুপাল, স্থানুদত্ত, মতিদত্ত, ইত্যাদি ব্যক্তিকে; ইঁহাদের একজনকেও ব্রাহ্মণ বলা যায় না। বস্তুত, এই সব নামাংশ বা পদবী পরবর্তী কালের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েতর অন্য ভদ্রবর্ণের।

ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে (পূর্ব) বঙ্গেও এই একই অবস্থা দেখিতেছি। শুধু, সুবর্ণবীথি অন্তর্গত বারকমণ্ডলের বিষয়াধিনিযুক্তক ব্যক্তিদের মধ্যে দুইবার দুইজনের নাম পাইতেছি, গোপালস্বামী ও বৎসপালস্বামী। এই দুইজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, সন্দেহ নাই। জ্যেষ্ঠকায়স্থ, পুস্তপাল ইত্যাদির নামের মধ্যে পাইতেছি বিনয়সেন, নয়ভূতি, বিজয়সেন, পুরদাস ইত্যাদিকে; ইঁহারা অব্রাহ্মণ, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

অর্থাৎ, সপ্তম শতক পর্যন্তও রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণদের কোনও প্রাধান্য দেখা যাইতেছে না; বরং পরবর্তী কালে যাঁহারা করণ-কায়স্থ, অম্বষ্ঠ-বৈদ্য ইত্যাদি সংকর শূদ্রবর্ণ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন তাঁহাদের প্রাধান্যই দেখিতেছি বেশি, বিশেষভাবে করণ-কায়স্থদের।

শ্রেণী হিসাবে শিল্পী ও বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রাধান্যও যথেষ্ট দেখা যাইতেছে; বর্ণ হিসাবে ইঁহারা বৈশ্যবর্ণ বলিয়া গণিত হইতেন কিনা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। বৈশ্য বলিয়া কোথাও ইঁহাদের দাবি সমসাময়িক কাল বা পরবর্তী কালেও কোথাও দেখিতেছি না, এইটুকুই মাত্র বলা যায়। অনুমান হয়, পরবর্তী কালে যে-সব শিল্পী ও বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণী শূদ্র উত্তম ও মধ্যম সংকর বর্ণ পর্যায়ভুক্ত বলিয়া পাইতেছি, তাঁহারাই এই যুগে শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, কুলিক ইত্যাদির বৃত্তি অনুসরণ করিতেন। বুঝা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য বর্ণব্যবস্থা বিস্তৃতি লাভ করিলেও রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণেরা এখনও প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই; তাঁহারা সম্ভবত এখনও নিজেদের বর্ণানুযায়ী বৃত্তিতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। অন্যান্য বর্ণের লোকদের সম্পর্কে মোটামুটি বলা যায় যে, তাঁহারাও নিজেদের নির্দিষ্ট বৃত্তিসীমা অতিক্রম করেন নাই। রাষ্ট্রে করণ-কায়স্থদের প্রতিপত্তি বৃত্তিগত স্বাভাবিক কারণেই; শিল্পী ও বণিক-ব্যবসায়ীদের প্রতিপত্তির কারণ অর্থনৈতিক। শেষোক্ত কারণের ব্যাখ্যা অন্যান্য প্রসঙ্গে একাধিক বার করিয়াছি।

কিন্তু, ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও বর্ণ-ব্যবস্থার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে, রাষ্ট্রের সক্রিয় পোষকতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ক্রমশ তাঁহারা প্রতিপত্তিশীল হইয়া উঠিতে আরম্ভ করেন; ভূমিদান অর্থদান ইত্যাদি কৃপালাভের ফলে অনেক ব্রাহ্মণ ক্রমশ ব্যক্তিগতভাবে ধনসম্পদেব অধিকারীও হইতে থাকেন। এই সামাজিক প্রতিপত্তি রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হইতে বিলম্ব হয় নাই। করণ-কায়স্থেরাও রাজসরকারে চাকুরী করিয়া রাষ্ট্রের কৃপালাভে বঞ্চিত হন নাই; গ্রামে, বিষয়াধিকরণে, ভুক্তির রাষ্ট্রকেন্দ্রে সর্বত্র যাঁহারা মহত্তর, কুটুম্ব ইত্যাদি বলিয়া গণ্য হইতেছেন, রাজকার্যে সহায়তার জন্য যাঁহারা আহূত হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে করণ-কায়স্থ এবং অন্যান্য 'ভদ্র' বর্ণের লোকই সংখ্যায় বেশি বলিয়া মনে হইতেছে। প্রচুর ভূমির অধিকারী রূপে, শিল্প-ব্যবসায়ে অর্জিত ধনবলে, সমাজের সংস্কার, সংস্কৃতি ও বর্ণ-ব্যবস্থার নায়করূপে যে-সব বর্ণ সমাজে প্রতিপত্তিশীল হইয়া উঠিতেছেন তাঁহারা রাষ্ট্রে নিজেদের প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হইবেন, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। রাষ্ট্রেরও স্বার্থ হইল সেই সব প্রতিপত্তিশালী বর্ণ বা বর্ণসমূহকে সমর্থকরূপে নিজের সঙ্গে যুক্ত রাখা।

সাধারণত অধিকাংশ লোকই নিজেদের বর্ণবৃত্তি অনুশীলন করিতেন, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই সত্য, কিন্তু ব্যক্তিগত রুচি, প্রভাব-প্রতিপত্তি-কামনা, অর্থনৈতিক-প্রেরণা ইত্যাদির ফলে প্রত্যেক বর্ণেরই কিছু কিছু লোক বৃত্তি পরিবর্তন করিত, তাহাও সত্য। স্মৃতিগ্রন্থাদিতে যে নির্দেশই থাকুক বাস্তবজীবনে দৃঢ়বদ্ধ রীতিনিয়ম অনুসৃত যে হইত না তাহার প্রমাণ অসংখ্য লিপি ও সমসাময়িক গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। পাল-চন্দ্র এবং সেন-বর্মণ আমলে যথেষ্ট ব্রাহ্মণ রাজা, সামন্ত, মন্ত্রী, ধর্মাধ্যক্ষ, সৈন্য-সেনাপতি, রাজকর্মচারী, কৃষিজীবী ইত্যাদির বৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন; অম্বষ্ঠ-বৈদ্যেরা মন্ত্রী হইতেছেন; দাসজীবীরা রাজকর্মচারী, সভাকবি

ইত্যাদি হইতেছেন, করণ-কায়স্থেরা সৈনিকবৃত্তি চিকিৎসাবৃত্তি ইত্যাদি অনুসরণ করিতেছেন; কৈবর্তরা রাজকর্মচারী ও রাজ্যশাসক হইতেছেন; এ-প্রমাণের দৃষ্টান্ত অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত অনবরতই পাওয়া যাইতেছে।

পাল-রাষ্ট্রযন্ত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় রাষ্ট্র ও সমাজপদ্ধতির পূর্বোক্ত রীতিক্রম সুস্পষ্ট ও সক্রিয়। প্রথমেই দেখিতেছি, রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণদের প্রভাব ও আধিপত্য বাড়িয়াছে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রীদর্ভপাণি, পৌত্র কেদারমিশ্র ও প্রপৌত্র গুরবমিশ্র রাজা ধর্মপালের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর চারিজন পালসম্রাটের অধীনে পালরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই ছিলেন বেদবিদ্‌ পরমশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ রাজনীতিকুশল। আর একটি ব্রাহ্মণ-বংশের—শাস্ত্রবিদ্‌শ্রেষ্ঠ যোগদেব, পুত্র তত্ত্ববোধভূ বোধিদেব এবং তৎপুত্র বৈদ্যদেব—এই তিনজন যথাক্রমে তৃতীয় বিগ্রহপাল, রামপাল এবং কুমারপালের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এই পরিবারও পাণ্ডিত্যে, শাস্ত্রজ্ঞানে, এক কথায় ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতিতে যেমন কুশলী ছিলেন তেমনই ছিলেন রাজনীতি ও রণনীতিতে। নারায়ণপালের ভাগলপুর লিপির দূতক ভট্ট গুরব ব্রাহ্মণ ছিলেন, সন্দেহ নাই। প্রথম মহীপালের বাণগড়লিপির দূতক ছিলেন ভট্ট শ্রীবামন মন্ত্রী; ইনিও অন্যতম প্রধান রাজপুরুষ সন্দেহ নাই। এই রাজার রাজগুরু ছিলেন শ্রীবামরাশি; ইনি বোধ হয় একজন শৈব সন্ন্যাসী ছিলেন। বৌদ্ধবাজার লিপি "ওঁ নমো বুদ্ধায়" বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু প্রথম দুই শ্লোকেই বলা হইতেছে, "সরসীসদৃশ-বারাণসী-ধামে, চরণাবনত-নৃপতি-মস্তকাবস্থিত কেশপাশ-সংস্পর্শে শৈবালাকীর্ণরূপে প্রতিভাত শ্রীবামরাশি নামক গুরুদেবের পাদপদ্মের আরাধনা করিয়া, গৌড়াধিপ মহীপাল [যাঁহাদিগের দ্বারা] ঈশান-চিত্রঘণ্টাদি শতকীর্তিরত্ন নির্মাণ করাইয়াছিলেন…।" কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন "চিত্রঘণ্টেশী" নবদুর্গার একতম রূপ; কাজেই, ঈশান চিত্রঘণ্টাদি অর্থে নবদুর্গার বিভিন্ন রূপ সূচিত হইয়া থাকা অসম্ভব নয়। শ্রীবামরাশি নামটিও হঠাৎ যেন শৈব বা শাক্ত লক্ষণের সূচক।

একটি ক্ষত্রিয়বর্ণ প্রধান রাজপুরুষের নাম বোধ হয় পাওয়া যাইতেছে ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে; ইনি মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণবর্মা। এই সামন্ত নরপতিটি যেন অবাঙালী বলিয়াই মনে হইতেছে। কিছু কিছু বণিকের নাম পাইতেছি, যেমন বণিক লোকদত্ত, বণিক বুদ্ধমিত্র; নামাংশ বা পদবী দেখিয়া মনে হয় ইঁহারা পরবর্তীকালের 'ভদ্র' সংকরবর্ণীয়, বৃত্তি অবশ্যই বৈশ্যের, কিন্তু রাষ্ট্রে বর্ণ হিসাবে বা শ্রেণী হিসাবে ইঁহাদের কোনও প্রাধান্য নাই। করণ-কায়স্থদের প্রভাব ব্রাহ্মণদের প্রভাবের সঙ্গে তুলনীয় না হইলেও খুব কম ছিল না। রামচরিত-রচয়িতা সন্ধ্যাকরনন্দীর পিতা প্রজাপতিনন্দী ছিলেন করণদের মধ্যে অগ্রণী এবং রামপালের কালে পালরাষ্ট্রের সান্ধিবিগ্রহিক। আর এক করণ-শ্রেষ্ঠ শব্দপ্রদীপ গ্রন্থের রচয়িতা; তিনি স্বয়ং তাঁহার পিতা ও পিতামহ সকলেই ছিলেন রাজবৈদ্য; দুইজন পাল

রাজসভার, একজন চন্দ্র-রাজসভার। বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপিতে ধর্মাধিকার-পদাভিষিক্ত জনৈক শ্রীগোনন্দন এবং মদনপালের মনহলি-লিপিতে সান্ধিবিগ্রহিক দূতক জনৈক ভীমদেবের সংবাদ পাইতেছি—ইঁহারাও করণ-কায়স্থকুলসম্ভূত বলিয়া মনে হইতেছে। কৈবর্ত দিব্য বিদ্রোহী হইবার আগে পালরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান রাজপুরুষ বা সামন্ত ছিলেন, সে কথা তো আগেই একাধিকবার বলা হইয়াছে। সামন্ত নরপতিদের মধ্যেও করণ-কায়স্থদের দর্শন মিলিতেছে। ত্রিপুরা পট্টোলীর মহারাজা লোকনাথ নিজেই ছিলেন করণ। কিন্তু করণদের প্রভাব পালরাষ্ট্রে যতই থাকুক, ঠিক আগেকার পর্বের মতন আর নাই। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতকের রাষ্ট্রে সর্বত্রই যেন ছিল করণ-কায়স্থদের প্রভাব, অন্তত নামাংশ বা পদবী হইতে তাহাই মনে হয়। পালচন্দ্র-পর্বে ঠিক ততটা প্রভাব নাই ; পরিবর্তে ব্রাহ্মণ প্রভাব বর্ধমান।

কম্বোজ-সেন-বর্মণ পর্বের রাষ্ট্রে এই ব্রাহ্মণ প্রভাব ক্রমশ বাড়িয়াই গিয়াছে। ভবদেবভট্ট ও হলায়ুধের বংশের কথা পূর্বেই একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি ; এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। একাধিক পুরুষ ব্যাপিয়া সেন-বর্মণ রাষ্ট্রে এই দুই পরিবারের প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রবল। তাহা ছাড়া, অনিরুদ্ধভট্টের মত ব্রাহ্মণ-রাজগুরুদের প্রভাবও রাষ্ট্রে কিছু কম ছিল না। অধিকন্তু, পুরোহিত, মহাপুরোহিত, শান্ত্যাগারিক, শান্ত্যাগারাধিকৃত, শান্তিবারিক, তন্ত্রাধিকৃত, রাজপণ্ডিত প্রভৃতিরও প্রভাব এই পর্বের রাষ্ট্রগুলিতে সুপ্রচুর, এবং ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য প্রভাবের পরিচয় বিশেষভাবে কিছু পাওয়া যাইতেছে না ; বরং বল্লালচরিত, বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের বর্ণতালিকা হইতে মনে হয়, শিল্পী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীভুক্ত অনেক বর্ণ রাষ্ট্রের অকৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়া সমাজে নামিয়া গিয়াছিল। বণিক-ব্যবসায়ীদের প্রতি সেনরাষ্ট্র বোধ হয় খুব প্রসন্ন ছিল না। একমাত্র বিজয়-সেনের দেবপাড়া লিপিতে পাইতেছি বারেন্দ্রক-শিল্পীগোষ্ঠী-চূড়ামণি রাণক শূলপাণিকে। বৈদ্যদের প্রভাব পরিচয়ের অন্তত একটি দৃষ্টান্ত আমাদের জানা আছে, বৈদ্যবংশ-প্রদীপ বনমালী কর রাজা ঈশানদেবের পট্টনিক বা মন্ত্রী ছিলেন ; কিন্তু সংবাদটি বঙ্গের পূর্বতম অঞ্চল শ্রীহট্ট হইতে পাওয়া যাইতেছে যেখানে আজও বৈদ্য-কায়স্থে বর্ণ-পার্থক্য খুব সুস্পষ্ট নয়। একই অঞ্চলে দেখিতেছি দাস-কৃষিজীবীরা রাজকর্মচারী এবং সভাকবিও হইতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণদের পরেই রাষ্ট্রে যাঁহাদের প্রভাব সক্রিয় ছিল তাঁহারা করণ-কায়স্থ ; ইঁহাদের প্রভাব হিন্দু আমলে কখনও একেবারে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না ; কারণ-কায়স্থদের বর্ণগত বৃত্তিই বোধ হয় তাহার কারণ। সেন-রাজসভার কবিদের মধ্যে অন্তত একজন করণ-কায়স্থ উপবর্ণের লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয় ; তিনি উমাপতিধর। মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণি-গ্রন্থের সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, উমাপতি লক্ষ্মণসেনের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের সংকলয়িতা কবি শ্রীধরদাসও বোধ হয় করণ-কায়স্থ ছিলেন ; শ্রীধর নিজে ছিলেন মহামাণ্ডলিক, তাঁহার পিতা বটুদাস ছিলেন মহাসামন্ত-

চূড়ামণি। বিজয়সেনের বারাকপুর লিপির দূতক শান্তিনাগ, বল্লালসেনের সান্ধিবিগ্রহিক হরিঘোষ, লক্ষ্মণসেনের মহাসান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণদত্ত, এই রাজারই অন্যতম প্রধান রাজকর্মচারী শঙ্করধর, বিশ্বরূপসেনের সান্ধিবিগ্রহিক নাঞ্চী সিংহ এবং কোপিবিষ্ণু, ইত্যাদি সকলকেই করণ-কায়স্থ বলিয়াই মনে হইতেছে। লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি ধোয়ী কিন্তু ছিলেন জাতে তন্তুবায়, তন্তুবায়-কুবিন্দকেরা উত্তম-সংকর বা সৎশূদ্র পর্যায়ের লোক, একথা স্মরণীয়।

রাষ্ট্রে বিভিন্ন বর্ণের প্রভাবের মোটামুটি যে-পরিচয় পাওয়া গেল তাহা হইতে অনুমান হয়, ব্রাহ্মণ ও করণ কায়স্থদের প্রভাব-প্রতিপত্তিই সকলের চেয়ে বেশি ছিল। করণ-কায়স্থদের প্রভাবের কারণ সহজেই অনুমেয়; ভূমির মাপ-প্রমাপ, হিসাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণ, পুস্তপালের কাজকর্ম, দপ্তর ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ, লেখকের কাজ প্রভৃতি ছিল ইঁহাদের বৃত্তি। স্বভাবতই, তাঁহারা রাষ্ট্রে এই বৃত্তিপালনের যতটা সুযোগ পাইতেন অন্যত্র তাহা সম্ভব হইত না। কাজেই এক্ষেত্রে বর্ণ ও শ্রেণী প্রায় সমার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে তাহা বলা চলে না; ইঁহারা বৃত্তিসীমা অতিক্রম করিয়াই মন্ত্রী, সেনাধ্যক্ষ, ধর্মাধ্যক্ষ, সান্ধিবিগ্রহিক ইত্যাদি পদ অধিকার করিতেন। রাজগুরু, রাজপণ্ডিত, পুরোহিত, শান্ত্যাগারিক ইত্যাদিরা অবশ্যই নিজেদের বৃত্তিসীমা রক্ষা করিয়া চলিতেন, বলা যাইতে পারে। কোন্ সামাজিক রীতিক্রমানুযায়ী ব্রাহ্মণেরা রাষ্ট্রে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন তাহা তো আগেই বলিয়াছি। বৈশ্যবৃত্তিধারী বর্ণ-উপবর্ণ সম্বন্ধে বলা যায়, যতদিন শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা উন্নত ছিল, ধনোৎপাদনের প্রধান উপায় ছিল শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য, ততদিন রাষ্ট্রেও তাঁহাদের প্রভাব অনস্বীকার্য ছিল, কিন্তু একাধিক প্রসঙ্গে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, অষ্টম শতকের পরে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার কমিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রেও বৈশ্যবৃত্তিধারী লোকদের প্রভাব কমিয়া যাইতে থাকে। পাল-রাষ্ট্রেই তাহার চিহ্ন সুস্পষ্ট। বল্লাল-চরিতের ইঙ্গিত সত্য হইলে সেনরাষ্ট্র তাঁহাদের প্রতি সক্রিয়ভাবে অপ্রসন্নই ছিল। তাহা ছাড়া, বৃহদ্ধর্ম-ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণও সে-ইঙ্গিত সমর্থন করে। রাষ্ট্রে ইঁহাদের প্রভাব থাকিলে সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে ইঁহারা এতটা অবজ্ঞাত অবহেলিত হইতে পারিতেন না।

যাহা হউক, এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে, ব্রাহ্মণ ও করণ-কায়স্থদের প্রভাবই রাষ্ট্রে সর্বাপেক্ষা বেশি কার্যকর ছিল। অম্বষ্ঠ-বৈদ্যদের প্রভাবও হয়তো সময়ে সময়ে কিছু কিছু ছিল, কিন্তু সর্বত্র সমভাবে ছিল এবং খুব সক্রিয় ছিল, এমন মনে হয় না। বৈশ্যবৃত্তিধারী বর্ণের লোকেরা রাষ্ট্রে অষ্টম শতক পর্যন্ত প্রভাবশালীই ছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহাদের প্রভাব কমিয়া যায় এবং তাঁহাদের কোনও কোনও সম্প্রদায় সৎশূদ্র পর্যায় হইতেও পতিত হইয়া পড়েন। কৈবর্তদের একটি সম্প্রদায় কিছুদিন রাষ্ট্রে খুব প্রভাবশালীই ছিলেন, এবং পরেও সে-প্রভাব খুব সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। আর কোনও বর্ণের কোনও প্রভাব রাষ্ট্রে ছিল বলিয়া মনে হয় না।

জাত-পাত, শ্রেণী ও সম্পত্তি-সম্পর্ক

ঘি টি রণদিভে

আজকের জাত-পাত ব্যবস্থা ও কুসংস্কারগুলিকে এবং একই সঙ্গে এর বিরুদ্ধে লড়াইকে কিছুতেই বোঝা যাবে না, যদি না আমরা এদেশে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে একে বিচার করি।

এসময়ের প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা ছিলো সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় চেতনার বিকাশ এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ক্রমবৃদ্ধি, যার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছিলো শ্রমিক-কৃষকদের সংগ্রাম। এসবই বৃটিশদেরকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেছিল।

একক প্রক্রিয়া

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম; জাতীয় ঐক্যের ক্রমবর্ধমান উপলব্ধি, জাত-পাত বিরোধী আন্দোলন ও বিদ্রোহ—এই সব কিছুই ছিলো একটি একক প্রক্রিয়ার অঙ্গ। এই প্রক্রিয়াটি ছিলো আধুনিক জাতি ('nation') গঠন—যার মধ্যে বিভিন্ন অংশ নতুন ব্যবস্থার মধ্যে সমতা ও সমান মর্যাদা দাবী করছিলো। প্রক্রিয়াটি ছিলো ক্রমিক ও ধীরগতি— প্রথম দিকে বিভিন্ন জাত (caste) ও আধা জাতগুলি বিভিন্নভাবে নিজেদের আকাংক্ষাকে মূর্ত করছিলো। অনেকে সরাসরি সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল হয়েছিলো, অনেকে আবার হিন্দু সমাজে তাদের অসম অবস্থান সম্পর্কে সবেমাত্র সচেতন হয়ে উঠেছিলো এবং জাত-গত বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করছিল। পরবর্তী পর্যায়ে এই বিভিন্ন সংগ্রামগুলি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সাধারণ সংগ্রামের মধ্যে অনেকটাই মিশে গিয়েছিলো, যদিও কেউ কেউ আবার শেষ পর্যন্ত তাদের সংগ্রামের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলো। বাস্তবত এটা ছিলো একটা ভাঙনের প্রক্রিয়া, বা, অন্যভাবে বলতে গেলে, বংশানুক্রমিক জাত-পাত-ব্যবস্থা-যুক্ত প্রাচীন হিন্দু সমাজের নস্যাৎকরণের প্রক্রিয়া। মার্কস এই ভাঙনের ও নস্যাৎকরণের প্রক্রিয়াটিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "হিন্দুস্তানের সমস্ত ঘটনা-পরম্পরা যতোই বিচিত্র রকমের জটিল, দ্রুত ও ধ্বংসাত্মক ব'লে মনে হোক না কেন, সমস্ত গৃহযুদ্ধ, অভিযান, বিপ্লব, দিগ্বিজয় ও দুর্ভিক্ষ তার উপরিভাগের নীচে নামেনি। কিন্তু ইংল্যান্ড ভারতীয় সমগ্র সমাজ-কাঠামোটাকেই ভেঙে দিয়েছে, পুনর্গঠনের কোনো লক্ষণ এখনো পর্যন্ত দৃশ্যমান হচ্ছে না। পুরোনো জগৎটা হারিয়ে গেছে, অথচ অর্জিত হয়নি কোনো নতুন জগৎ —এর ফলে হিন্দুর বর্তমান দুর্দশার ওপর অদ্ভুত ধরণের এক বিষাদের জন্ম দিয়েছে, এবং বৃটিশ-শাসিত ভারতকে তার সমস্ত প্রাচীন ঐতিহ্য ও সমগ্র অতীত ইতিহাস থেকে পৃথক ক'রে দিয়েছে।" হিন্দুদের এই পুরোনো জগৎকে ভেঙে পড়তে দেখে

মার্কস মোটেই দুঃখিত হননি। কেননা, তিনি জানতেন, তা প্রতিষ্ঠিত ছিলো দানবিক জাত-পাতের বৈষম্য ও ক্রীতদাসত্বের ওপর। "একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, ছোটো ছোটো এই গোষ্ঠীগুলি ছিলো জাত-পাত-ভেদ ও ক্রীতদাসত্ব দ্বারা কলুষিত, বাস্তব পরিস্থিতির প্রভু হিসেবে মানুষকে উন্নীত না ক'রে তাকে তারা করেছে বাহ্যিক অবস্থার অধীন, স্বয়ং বিকশিত একটি সমাজব্যবস্থাকে পরিণত করেছে প্রাকৃতিক নিয়তিতে, এবং এভাবে কার্যকর করেছে প্রকৃতির নৃশংসতাময় পূজা, অধঃপতনের প্রমাণ দিয়েছে প্রকৃতির প্রভু মানুষকে হনুমান দেবতারূপী মানুষ ও শবলাদেবীরূপী গরুর অর্চনায় হাঁটু গেড়ে নত করার মধ্যে দিয়ে।"[১]

ভারতীয় সমাজের রূপান্তর ঘটানোটা ঔপনিবেশিক শাসনের স্বার্থের অনুকূল ছিলো না। পুরোনো সমাজের—এর স্তরবিন্যাস ও অর্থনৈতিক ভিত্তির—পরিবর্তনটা ছিলো অত্যন্ত ধীরগতি ও যন্ত্রণাকর। ফলত, ন্যূনতম আধুনিক পুঁজিবাদী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো জাত-পাত ব্যবস্থার ধারক পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-সম্পর্কের ওপর। বৃটিশ উপনিবেশবাদের স্বার্থেই দরকার ছিলো শক্তিশালী একটি দেশীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে বিকশিত হতে না দেওয়া। তারা ভারতীয় জনগণকে শোষণ করতে আগ্রহী ছিলো তাদের পশ্চাৎপদতার ভিত্তিকে টিকিয়ে রেখেই—যেমন, গ্রামীণ ভূমি-সম্পর্ককে যথাসম্ভব অটুট রেখে কেবলমাত্র তাদের নিজের স্বার্থেই তাকে কিছুটা ঘষা-মাজা ক'রে।

ফলত, কার্যকর হয়েছিলো দুটি পরস্পরবিরোধী প্রক্রিয়া। আধুনিক সম্পর্কের সূচনা—রেলপথ, ডাক ও তার বিভাগ, ওয়ার্কশপ ও কিছু কলকারখানা, ক্রমবিকাশমান পণ্য-বিনিময় এবং আমদানি-রপ্তানি—পুরোনো ব্যবস্থার এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জাত-পাত ব্যবস্থার, ভাঙনের প্রবণতার গতিবেগ বৃদ্ধি করেছিলো। দ্বিতীয়ত, সামন্তদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমর্থন অর্জন করার উদ্দেশ্যে পুরোনো ভূমি-ব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখার মধ্যে নিহিত ছিলো ঔপনিবেশিকতার মৌলিক স্বার্থ, এবং এর অর্থই ছিলো জাত-পাত ব্যবস্থার বিন্যাসের প্রতি তাদের সমর্থন।

পুনরুজ্জীবন ও সমঝোতা

জাতীয় আন্দোলনের নেতারা, হিন্দু উচ্চবর্ণ থেকে আসা নতুন বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরাও কিন্তু আগ্রহী ছিলেন জাত-পাত ব্যবস্থার সঙ্গে সমঝোতা করতে। আজ থেকে একশো বছর আগে বিরাজমান পিছিয়ে-থাকা অর্থনৈতিক অবস্থার কথা সহজেই অনুমান করা যায়। এইসব বুদ্ধিজীবীদের তখন সবেমাত্র বর্ণপরিচয় ঘটছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সাথে। তখনও তাদের পেছনে দেশীয় শিল্প-পুঁজিপতিদের দৃঢ় ভিত্তি গড়ে ওঠেনি। তারা তখন নীচু বর্গের মানুষদের থেকেও বিচ্ছিন্ন, এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্মীয় সংস্কারে সামান্যতম আঘাত করতেও ভীত। তাছাড়া, বৃটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা

তখন বারবার ভারতের অতীতকে সামনে তুলে ধরছেন তাদের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার দাবীকে জোরদার করার জন্য। ফলত, পুনরুজ্জীবনের ভাবনা-চিন্তা ও মতাদর্শও প্রশ্রয় পেয়েছিলো বিশেষভাবে।

ফলত, বিরাজমান দুর্গন্ধযুক্ত আস্তাকুড় এবং অবক্ষয়ী ও দুর্নীতিগ্রস্ত আধ্যাত্মিকতা থেকে, ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম সমাজ ব্যবস্থার ভগ্নাবশেষ থেকে, এক উবে-যাওয়া সভ্যতার রাজকীয় ঐশ্বর্যের শূন্যাবশেষ থেকে, তারা কল্পনার জাল বিছিয়ে গড়ে তুলতে ও পুনঃস্থাপন করতে চাইলেন হিন্দু সভ্যতার এক সোনালী স্বপ্ন— একটি 'পবিত্র' হিন্দু সংস্কৃতি, যা তারা তুলে ধরতে পারেন একটি আদর্শ হিসেবে, আলোকবর্তিকা হিসেবে। ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদের পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে ফেলা বৃটিশ বুর্জোয়া সংস্কৃতি ও মতাদর্শের বাঁধভাঙা জোয়ারের বিরুদ্ধে তারা তুলে ধরতে চাইলেন পুনর্গঠিত হিন্দু মতাদর্শের দুর্বল ঢালটিকে, যদিও বাস্তব পরিস্থিতিতে তার অস্তিত্বের কোনো স্বাভাবিক ভিত্তি ছিলো না। এই মতাদর্শের অতি উগ্র প্রবক্তারা সমস্ত সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক প্রগতিকেই নস্যাৎ করতে চাইলেন আগ্রাসীদের সংস্কৃতি হিসেবে, সমস্ত ধরণের জীর্ণ ও প্রাচীন ঐতিহ্য, এমনকি কুসংস্কারগুলিকেও, বিশেষ সুবিধে ও প্রগতিবিরোধী মানসিকতাকে দেওয়া হলো শ্রদ্ধা ও পূজার আসন।[২]

অবশ্য পাশ্চাত্য পদ্ধতির বিরোধিতার সঙ্গে যুক্ত করা হলো গণতন্ত্র ও শিল্প বিকাশের দাবীকে। পুনরুজ্জীবনমূলক ভিত্তির অর্থ দাঁড়ালো জাত-পাত ব্যবস্থার পক্ষে ওকালতী, একে জিইয়ে রাখা এবং এর বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে অস্বীকার করা। বিবাহের বয়স বৃদ্ধি-সহ যে কোনো ধরণের সামাজিক সংস্কারেরই বিরোধিতা করলেন তিলক। তিলক জাত-পাত ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন, তার পক্ষেই তাই তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। এমনকি গান্ধী, যিনি জাতীয় আন্দোলনের এক ভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, তিনি পর্যন্ত একইভাবে পুনরুজ্জীবনবাদের ওপর নির্ভর করেছিলেন। প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি পাশ্চাত্য চিকিৎসা, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও রেলব্যবস্থা সহ যা কিছু পাশ্চাত্যের, তার বিরুদ্ধেই প্রকাশ্যে প্রচার চালিয়েছিলেন। গান্ধী ঘোষণা করেছিলেন : "ঈশ্বর মানুষের গতিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে চেয়েছিলেন বলেই মানুষকে মাত্র দু'টি পা দিয়েছিলেন। কিন্তু মানুষ উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে রেল গড়ে তুলেছে।" সে সময় বারবার তিনি জোর দিয়েছেন রামরাজ্য স্থাপনের ওপর। পরবর্তীকালে তার দৃষ্টিভঙ্গি আরেকটু আধুনিক ও 'বুর্জোয়া চরিত্রের' হয়ে উঠলেও, এবং অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তার আন্দোলন সত্ত্বেও, সারা জীবন তিনি পুনরুজ্জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরই শিকার রয়ে গিয়েছিলেন। ১৯২১-এ তিনি নিজেকে সনাতনপন্থী হিন্দু ব'লে ঘোষণা করেছিলেন : "আমি নিজেকে সনাতনপন্থী হিন্দু ব'লে ঘোষণা করছি, কারণ (১) আমি বেদ, উপনিষদ, পুরাণ এবং সমস্ত হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে—এবং সেহেতু অবতারবাদে ও পুনর্জন্মে—বিশ্বাস

করি ; (২) আমি বর্ণাশ্রম ধর্মে বিশ্বাস করি, এবং সেটা পুরোপুরি বৈদিক অর্থে, আজকের প্রচলিত ও স্থূল অর্থে নয় ; (৩) আমি গোরক্ষায় বিশ্বাস করি—বর্তমানে প্রচলিত অর্থের চেয়ে বৃহত্তর অর্থে ; (৪) আমি মূর্তি-পূজোয় অবিশ্বাস করি না।"৩

এরকমই ছিলো জাতির জনকের মতাদর্শ, যিনি জাতীয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই মতাদর্শ সত্ত্বেও তিনি সক্ষম হয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ মানুষকে জাতীয় আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে এবং সাময়িকভাবে হলেও তাদের জাত-গত পার্থক্যকে ভুলে যেতে। তিনিই ১৯২০-২১-এ সক্ষম হয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে সাধারণ সংগ্রামে সামিল করতে। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট ছিলো যে, এই পুনরুজ্জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির, এবং এভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম থেকে জাত-পাত-বিরোধী সংগ্রামকে বিযুক্ত করার ফলশ্রুতিতে জাত-পাতগত বিভেদ অব্যাহতই থাকবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যেকার প্রাচীর দূর করা সম্ভব ছিলো না।

জওহরলাল নেহরুর আধুনিক ও ধর্ম-নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও গান্ধীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই জাতীয় আন্দোলনে প্রাধান্য স্থাপন করেছিলো। সমালোচকরা এই প্রগতিবিরোধী মানসিকতাকেই ভ্রান্তভাবে জাত-পাতগত চাপের সামনে একমাত্র আত্মসমর্পণ ব'লে বিবেচনা করেছেন, এবং উচ্চবর্ণের জাতীয় নেতাদের জাত-পাতের মনোভাবের ফলেই কেবল এটা গড়ে উঠেছে ব'লে মনে করেছেন। দেশীয় সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-সম্পর্কের কাছে আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের মৌলিক আত্মসমর্পণই কিন্তু জাত-পাত ব্যবস্থাকে জিইয়ে রেখেছে। আত্মগতভাবে জাত-পাতমনস্কতা যে এব্যাপারে কোনো ভূমিকা নেয়নি তা নয়, কিন্তু অন্যান্য কৃষি-কাঠামোকে মৌলিকভাবে মেনে নিলে সেটা নিতান্তই অনিবার্য হয়ে পড়ে।

কৃষি-বিপ্লবের ভয়

এরকমই ছিলো প্রথম দিকে দু-মুখো বুদ্ধিজীবী সমাজের ভূমিকা। উদীয়মান বুর্জোয়াদের আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থের পক্ষে দাঁড়িয়ে এবং নতুন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দাবী উপস্থাপিত করে তা সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ করেছে, কিন্তু একই সঙ্গে জোট বেঁধেছে পুরোনো সামন্তব্যবস্থা ও সংস্থাগুলির সঙ্গে, এবং বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করার জন্যই এটা করতে হয়েছে বলে অজুহাত হাজির করেছে। মহারাষ্ট্রে এবং অন্যত্র মহাজন-বিরোধী আইনগুলির বিরোধিতা শুধুমাত্র জাত-পাতগত জোটের ফলে ঘটেনি, বরং তা ঘটেছে শ্রেণীগত জোটের অঙ্গ হিসেবেই। তা শুধুমাত্র সরকারী চাপের বিরুদ্ধেই কৃষকদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে এবং ল্যান্ড ট্যাক্স প্রভৃতির বিরোধিতা করেছে, কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত কৃষি-সম্পর্ক নিয়ে কোনো পদক্ষেপ কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকার করেছে। যদিও পরবর্তী প্রজন্মের জাতীয়

নেতৃবৃন্দ পুরোপুরি ঠিক একইরকম অবস্থান বজায় রাখতে পারেননি এবং জাত-পাতগত অসন্তোষ ও ভূমি-সম্পর্ক দুই নিয়েই তাদের নানারকম কুটকৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছে, তবুও মূলত তাদের অবস্থান একই থেকে গেছে।

১৯২০ সালে কংগ্রেস প্রকাশ্যেই জমিদারদের পক্ষে তার পক্ষপাতিত্ব ঘোষণা করে এবং জমিদারদের অত্যধিক হারে খাজনা না দেবার জন্য কৃষকদের তিরস্কার করে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে ১৯২২-এর ১২ই ফেব্রুয়ারী গৃহীত বরদলোই প্রস্তাবে নিম্নলিখিত অংশগুলিও ছিলো: "ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেস কর্মী ও সংগঠনগুলিকে রায়তদের একথা জানিয়ে দেবার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে যে, জমিদারদের খাজনা দেওয়া থেকে বিরত হওয়াটা কংগ্রেস সিদ্ধান্তের বিরোধী, এতে দেশের সামগ্রিক স্বার্থই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ওয়ার্কিং কমিটি জমিদারদের এই মর্মে আশ্বাস দিচ্ছে যে, কংগ্রেস আন্দোলন কোনভাবেই তাদের আইনগত অধিকার ব্যাহত করতে আগ্রহী নয়। এবং এমনকি রায়তদের বিক্ষোভ থাকলেও কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তার মীমাংসা করতে হবে।" একথা বলা হয়েছিল এমন এক সময়ে, যখন যুক্তপ্রদেশে (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) ও অন্যত্র ব্যাপক কৃষকজনতা জমিদারদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করছে।

পরবর্তীকালে জমিদারদের পক্ষে এরকম স্থূল ওকালতির পুনরাবৃত্তি হয়নি, তখন কৃষকজনতার কাছে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে আবেদন জানাতে হয়েছে, কংগ্রেস তখন প্রজাদের প্রতি ন্যায়বিচার ইত্যাদি কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে। কিন্তু তার কৃষিবিপ্লবের বিরোধিতা তথা জমিদারদের সঙ্গে জোটবদ্ধতা অব্যাহতই থেকেছে। গান্ধী যে একদা করদ রাজ্যগুলিকে 'ভারতীয় ভারত' ব'লে অভিহিত করেছিলেন এবং বছরের পর বছর ধরে কংগ্রেস যে এইসব রাজ্যে ব্যাপক আন্দোলনের বিরোধিতা ক'রে গেছে, সেটা নিশ্চয়ই অকারণে ঘটেনি।

এই কৃষি-বিপ্লব-ভীতি এবং দেশীয় প্রগতিবিরোধী শক্তিগুলির সঙ্গে জোটবদ্ধতা মোটেই সুফল প্রসব করেনি। সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা করার মতো আত্মবিশ্বাসহীন দুর্বল শিল্প-পুঁজিপতিদের নির্ভর করতে হয়েছে প্রতিষ্ঠিত বিত্তবান শ্রেণীগুলির ওপর, যাদের মধ্যে থেকে আবার বুদ্ধিজীবী সমাজের একাংশ উঠে এসেছে। তাছাড়া বিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদী সংকটের কালে বুর্জোয়ারা দৃঢ় সামন্তবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করতে অক্ষম হয়েছে। মার্কসবাদীরা এটা লক্ষ্য করেছেন। বস্তুত এরই পরিপ্রেক্ষিতে লেনিন ঘোষণা করেছেন যে, কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই রাশিয়ায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবেও নেতৃত্ব দিতে সমর্থ, এবং এর সাফল্যের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্ব একান্তভাবেই আবশ্যিক। ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত বিপ্লবগুলি থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই কৃষি-বিপ্লব-সহ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনগুলি সফল হয়েছে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়েছে। চীন, কোরিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি এরই সাম্প্রতিক নিদর্শন। কৃষি বিপ্লব সম্পূর্ণ

না হলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামই বিপথে চালিত হয়, এবং অনেকক্ষেত্রে তা ফ্যাসিজম-এর জন্ম দেয়—যেমন ঘটেছে ইন্দোনেশিয়ায়। অধিকাংশ পিছিয়ে থাকা দেশে, যেখানে বুর্জোয়াশ্রেণী কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে এবং কৃষি-বিপ্লবের ক্ষতি করতে পেরেছে, সেখানেই প্রাক্-পুঁজিবাদী মতাদর্শ ও সম্পর্ক অব্যাহত থেকেছে, এবং ফলত উৎখাত হয়ে গেছে। প্যান-ইসলামবাদ, ইসলামিক প্রজাতন্ত্র, 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র' এবং অন্যান্য বহু প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক মতাদর্শ এখন পর্যন্ত মানুষের মনে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে, কেননা যে জমিতে সেগুলি জন্ম নেয় সেই প্রাক্-পুঁজিবাদী সম্পর্কগুলি এখনও বিদ্যমান রয়েছে। সমাজ-সংস্কারকরা ভারতে কৃষি-বিপ্লবের সঙ্গে জাত-পাতগত ও সাম্প্রদায়িক বৈষম্য, দৃষ্টিভঙ্গি ও কুসংস্কারের মধ্যেকার এই সম্পর্কটিই ধরতে পারেননি। তাদের চোখে জাত-পাতগত বিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা ছিলো উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে সম্পর্কহীন কিছু অন্যায় বিষয় মাত্র, শুধুমাত্র এসবের নিন্দা করলে এবং যারা এসবের প্রশ্রয় দিচ্ছে তাদের এসব বর্জন করতে বললেই সব কিছু দূর হয়ে যাবে, আর কিছু করার দরকার নেই; সেই সংগ্রামকেই বর্তমান সমাজব্যবস্থার সঙ্গে, এর প্রাক্-পুঁজিবাদী ও পুঁজিবাদী ভিত্তির সঙ্গে, এর শ্রেণী শোষণের উৎস'র সঙ্গে যুক্ত করার কোনো কারণ নেই; সাধারণ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বা আধুনিক শ্রেণীসংগ্রামের অঙ্গ হিসেবে এই সংগ্রাম পরিচালনা করার তাই কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

কমিউনিস্ট পার্টি

কমিউনিস্ট পার্টিই ছিলো একমাত্র পার্টি যা অস্পৃশ্যতা ও জাত-পাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে কৃষি-বিপ্লব বা সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সঙ্গে যুক্ত করেছিলো। একমাত্র এই পার্টিই বাস্তবে হিন্দু-মুসলিম বিভেদের অবসানের চাবিকাঠি হিসেবে কৃষি-বিপ্লব ও শ্রেণীসংগ্রামকে দেখেছিলো। সি পি আই-এর ১৯৩০-এর 'প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশন'-এ বলা হয়েছিলো:

> আমাদের দেশে বৃটিশ শাসনের ফলে এখনও রয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাসরা, কোটি কোটি সামাজিকভাবে অস্পৃশ্য শ্রমজীবী মানুষেরা, সমস্ত অধিকার থেকে যারা বঞ্চিত হয়ে আছে। বৃটিশ শাসন, জমিদারী ব্যবস্থা, প্রতিক্রিয়াশীল জাত-পাত ব্যবস্থা, ধর্মীয় ভণ্ডামি এবং ক্রীতদাসত্ব ও ভূমিদাসত্বর সমস্ত অতীত ঐতিহ্য ভারতীয় জনগণের টুঁটি চেপে ধরে আছে, তাদের মুক্তির পথে বাধা সৃষ্টি করছে। এর ফলেই, এই বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষেও রয়ে গেছে অস্পৃশ্য মানুষেরা, যাদের কোনো অধিকার নেই অন্যান্যদের সঙ্গে মিশবার, একই কুয়ো থেকে জল নেবার, বা একই স্কুলে পড়াশুনা করার।
>
> ভারতীয় জনগণের এই কলঙ্কের চিরকালের জন্য অবসান ঘটাবার বদলে গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা জাত-পাত ব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখার ব্যবস্থা করছেন,

যা আবার এই অস্পৃশ্যদের অস্তিত্বের ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। একমাত্র জাত-পাত ব্যবস্থার গান্ধী মার্কা ধরণেরও নির্মম উৎখাত, একমাত্র কৃষি-বিপ্লব ও বৃটিশ শাসনের ধ্বংসাত্মক উৎখাত, এই সমস্ত অস্পৃশ্য শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আইনগত মুক্তির পথ খুলে দিতে পারে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তাই সমস্ত অস্পৃশ্যদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে বৃটিশ শাসন ও জমিদারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রমিকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী মোর্চায় সামিল হবার জন্য।

কমিউনিস্ট পার্টি তাদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে বৃটিশ ও প্রতিক্রিয়াশীল দালালদের চাতুরীতে বিভ্রান্ত না হতে—যারা চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশের মেহনতী মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে এবং একে অন্যের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করতে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি লড়াই চালাচ্ছে ক্রীতদাসত্ব, জাত-পাত ব্যবস্থা এবং জাত-পাত বিভেদের (সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি) সমস্ত রূপের সম্পূর্ণ অবসানের জন্য। কমিউনিস্ট পার্টি সংগ্রাম চালাচ্ছে অস্পৃশ্য ও অন্যান্য সমস্ত মেহনতী মানুষের সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত সাম্যের জন্য।

কমিউনিস্টরা জানতেন যে, একটি ঔপনিবেশিক দেশে শিল্প বিকাশের ধীর গতি কৃষকদের মধ্যে সর্বহারা চেতনার বিকাশের চাইতে তাদের অনেক বেশি নিঃস্ব ক'রে ফেলবে। এমনকি শহরের কারখানায় চলে আসতে যারা বাধ্য হয়েছে, তাদের গ্রামীণ মানসিকতা সহজে দূর হয় না—যেমন, প্রথমদিকে তারা তাদের গ্রামীণ যোগসূত্র অটুটই রেখে দিয়েছিলো, প্রতি বছরে অন্তত দু'মাস তারা গ্রামে কাটাতো। তাছাড়া প্রতিদিন গ্রাম থেকে নতুন নতুন লোক আসার ফলে তাদের দৃঢ় শ্রেণী মানসিকতা গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া বারবার ব্যাহত হয়েছে। এসব থেকেই স্পষ্ট ধরা পড়ে যে, গ্রামাঞ্চলে প্রাক্-পুঁজিবাদী ভূমি-সম্পর্কের ওপর আঘাত হানাটা ছিলো বিশেষ জরুরী।

সাম্রাজ্যবাদের কূটকৌশলের ফলে…গ্রামগুলি যেমন আর্থিক ও বাণিজ্যিক অর্থনীতির প্রবাহে এসে যাচ্ছে, ঠিক একই সঙ্গে কৃষকদের নিঃস্বকরণের প্রক্রিয়া চলছে। …অন্যদিকে উপনিবেশগুলিতে শিল্প বিকাশের বিলম্বিত প্রক্রিয়া সর্বহারাকরণের প্রক্রিয়ায় বিশেষ বাধা সৃষ্টি করছে।…যে পুঁজিবাদ উপ-নিবেশিক গ্রামগুলিকে নিজের ট্যাক্স ও বাণিজ্য ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ক'রে ফেলেছে এবং প্রাক্-পুঁজিবাদী সম্পর্কগুলিকে পাল্টে দিয়েছে (যেমন, গ্রামসমাজের ধ্বংস) তা কিন্তু এসবের মধ্য দিয়ে কৃষকসমাজকে প্রাক্-পুঁজিবাদী বন্ধন ও শোষণ থেকে মুক্তি দেয়নি, শুধু আর্থিক একটি রূপ দিয়েছে…এমনকি তাদের ঋণের ভিত্তিতে বংশানুক্রমিক এক ধরণের ক্রীতদাসত্বের পর্যন্ত জন্ম দিয়েছে।[৪]

১৯৬৮তে জাতীয় সংহতির ওপর সি পি আই (এম) কর্তৃক প্রদত্ত স্মারকলিপিতে বলা হয়েছিলো ঃ

সম্প্রতি পার্লামেন্ট এবং সমগ্র দেশ অন্ধ্র প্রদেশের কাঞ্চিকাচারিয়া গ্রামে প্রকাশ্য দিবালোকে একজন হরিজন খামার-ভৃত্যকে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় ন্যায্যভাবেই নিন্দা জানিয়েছে। সংবাদপত্রে তপশীলী জাতি ও আদিবাসী এবং অন্যান্য পিছিয়ে-থাকা গোষ্ঠীর ওপর অত্যাচারের অসংখ্য ঘটনা প্রকাশিত হচ্ছে। এটা কোনো বিশেষ অঞ্চল বা রাজ্যে সীমাবদ্ধ কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নয়। সমগ্র দেশ জুড়ে এটা একটা সাধারণ ঘটনা হিসেবেই ঘটছে—এবং এটাই হচ্ছে আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে স্বাধীনতার ২০ বছর পরে এবং তপশীলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য সৃষ্ট অসংখ্য আইন-কানুন ও কমিশনের পরেও বিদ্যমান অস্পৃশ্যতার অশুভ বিধি এবং সামাজিক নির্যাতন ও নৃশংসতার ঐতিহ্য ! এটা হচ্ছে সেই একই জাত-পাত ও সামাজিক ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত সামন্ত ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী ও 'নয়া ধনীদের' বিকাশের ফলশ্রুতি। এটা হচ্ছে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তির অবসান ঘটাবার ব্যাপারে এবং জমিদারীপ্রথা অবসানের, কৃষকদের জমি দেবার এবং তাদের কর্ম-সংস্থান, জমি, ন্যায্য মজুরী ও বাসস্থানের সুবন্দোবস্তের নিশ্চিতির ব্যাপারে সরকারী ব্যর্থতার ফলশ্রুতি। এটা হচ্ছে সমষ্টি উন্নয়ন, পঞ্চায়েতরাজ, সমবায় প্রভৃতির ব্যাপারে কংগ্রেস সরকারের অনুসৃত নীতিসমূহের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে কায়েমী জমিদারী স্বার্থের প্রাধান্য বৃদ্ধির ফলশ্রুতি। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্র এবং বিশেষত পুলিশ ও আদালত এই উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হচ্ছে। কাজেই, এটা মোটেই বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, এই ধরণের নৃশংস কার্যকলাপ বাড়ছে এবং গ্রামীণ জীবনের প্রচণ্ড দানবিকীকরণ ঘটছে, এবং সমস্ত মানবিক মূল্যবোধ ও শুভবুদ্ধি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এইসব হতভাগ্যেরা তাদের ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়ে যদি মরীয়া পন্থা গ্রহণ করে এবং গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক জাত-পাতগত দাঙ্গা শুরু হয় তবে সেটা মোটেই কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার হবে না, কারণ ইতিমধ্যেই দিগন্তে এসবের ইঙ্গিত ধরা পড়ছে। বর্তমান সাম্প্রদায়িক বা ভাষা দাঙ্গার পাশাপাশি আমরা তখন দেখতে পাবো জাত-পাতগত দাঙ্গা। প্রাচীন সামন্ত ও আধা-সামন্ত এবং নয়া ধনীদের প্রাধান্যের অবসান ঘটিয়ে ন্যূনতম অর্থনৈতিক জীবনধারণের মানের এবং জমি, কর্মসংস্থান ও সামাজিক সমতার নিশ্চিতি দিতে পারলেই কেবল এই বিপদ দূর করা সম্ভব হতে পারে। গণতান্ত্রিক জনমত ও জনশক্তি দৃঢ়ভাবে গড়ে তুলে তাই সরকারকে বাধ্য করতে হবে যাতে তারা গ্রামীণ গরীবদের এবং হরিজন ও পিছিয়ে থাকা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গ্রামীণ নিপীড়কের পক্ষে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহারের বর্তমান নীতি বর্জন করে, এবং তার বদলে রাষ্ট্রযন্ত্রকে পূর্ণমাত্রায় কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহার ক'রে গ্রামাঞ্চলে মৌলিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তর ঘটাতে বাধ্য হয়।[৫]

কাজেই কমিউনিস্টরা কখনোই একথা বলেননি যে, বস্তাপচা ভূমিব্যবস্থা ও

বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম ছাড়াই জাত-পাত, অস্পৃশ্যতা বা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি উঠে যাবে ; বা গ্রাম ও শহরের শ্রেণীসংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে শুধুমাত্র জাত-পাত ব্যবস্থার নিন্দা করলেই এ ব্যবস্থা রাতারাতি অদৃশ্য হয়ে যাবে। তারা জানতেন যে, এই শ্রেণীসংগ্রাম চালাতে হবে এমন এক জনগণকে, যারা এখনও জাত-পাতগত কুসংস্কারগুলি থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়নি, যাদেরকে এখনও শোষিত হিসেবে তাদের সাধারণ পরিচয়টি আবিষ্কার করার জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্বের প্রশ্রয় না দিয়ে পরিচালিত এই বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যেই অর্জন করতে হবে সেই প্রকৃত ও কার্যকর ঐক্য।

কমিউনিস্টরা আরো দেখেছিলেন যে, জাত-পাত ব্যবস্থা ক্রমশঃ ভাঙনের পথে যাচ্ছে ; প্রত্যেক জাতের মধ্যে বিত্তবান ও বিত্তহীনদের মধ্যেকার বৈষম্য বাড়ছে, এবং নিঃস্বভবনের প্রক্রিয়া প্রত্যেক জাতকেই প্রভাবিত করেছে। প্রায় সমস্ত কৃষক জাতই এই প্রক্রিয়ার শিকার হচ্ছে। ফলত, নতুন এক সাধারণ ঐক্যসূত্র গড়ে উঠেছে সমস্ত জাতের নীচুতলার মানুষদের মধ্যে—সাধারণ সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় যে ঐক্যসূত্রকে গুরুত্ব দেওয়া ও সংহত করা প্রয়োজন। এ কারণেই জাত-পাতগত বিভেদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে এই ঐক্যসূত্রের ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে শুধুমাত্র শ্রেণীবৈষম্যকে স্বীকার করে এবং জাত-পাতগত বৈষম্যকে অস্বীকার ক'রে জাত-পাতের বদলে শ্রেণীকে স্থাপন করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বাস্তবে যেখানে জাত-পাতগত পার্থক্যের মধ্যেই একটি শোষিত শ্রেণী ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হচ্ছে, এটা হচ্ছে সেই বাস্তবের সাথেই সঙ্গতিপূর্ণ হবার প্রক্রিয়া। এই দ্বিবিধ প্রক্রিয়াকে উপলব্ধি করতে না পারলে সংস্কারবাদের শিকার হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

জাতীয় ঐক্য এবং জাত-পাত

জাতীয় আন্দোলনের বিস্তৃতি অনিবার্যভাবেই জাত-পাত ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুটা পরিবর্তন এনেছিলো। জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের পেছনে ন্যূনতম ঐক্য গড়ে তোলার জন্য জাত-পাত ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে তার পূর্বেকার অপরিবর্তনীয় দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা পাল্টাতে বাধ্য হয়েছিলো। নীচুতলার বিভিন্ন জাত-পাত সমন্বিত কৃষক ও গ্রামীণ জনতার কাছে পেঁছোবার প্রয়োজনীয়তাই বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের এ ব্যাপারে একটু নমনীয় করেছিলো, এবং জনগণের পক্ষে তাদের উত্থাপিত গণতান্ত্রিক দাবী-দাওয়াগুলির সাথে সঙ্গতিরক্ষার জন্যও এটা দরকার ছিলো। জাত-পাত ব্যবস্থার বিলোপের কথা না বললেও তাই জাত-গত সমতার কথা বলতে হয়েছিলো। সাধারণভাবে জাত-পাতের এবং বিশেষভাবে অস্পৃশ্যতার সমস্যার মুখোমুখি হয়ে তারা এ প্রসঙ্গে সামন্ত ভূমিব্যবস্থার সাথে তাদের সমঝোতার লাইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বুর্জোয়া নেতৃত্ব এমন একটা নীতি গ্রহণ করেছিলো, যা কথায় তাদের আগের অবস্থান থেকে আলাদা হলেও

মর্মবস্তুর বিচারে একই ছিলো। গান্ধী অস্পৃশ্যতাকে পাপ ব'লে চিহ্নিত করেছিলেন :

> অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ হচ্ছে এমন একটা প্রায়শ্চিত্ত যা হিন্দুধর্ম ও তাদের নিজেদের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকেই বর্ণহিন্দুদের করতে হবে। শুদ্ধিকরণ দরকার 'অস্পৃশ্যদের' নয়, বরং উচ্চবর্ণেরই। অস্পৃশ্যদের এমন কোনো পাপ নেই যা তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। আমাদের অহংকারই আমাদের উচ্চ বর্ণহিন্দুদের নিজেদের পাপ সম্পর্কে অন্ধ করে রাখে এবং সেই একই জিনিষ আমরা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেখি আমাদের নিপীড়িত ভাইদের ক্ষেত্রে যাদেরকে আমরাই নিপীড়িত ক'রে রেখেছি এবং নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছি। এই নিপীড়িত জাতগুলিকে অস্বীকার করার বদলে আমি নিজেই বরং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে চাই। যদি তারা অস্পৃশ্যতার কলঙ্কের ছিটেফোঁটাও বজায় রাখে এবং এভাবে তাদের মহান ধর্মকে বিকৃত করে, তাহলে হিন্দুরা কখনও স্বাধীনতার দাবী জানাবার বা তা অর্জন করার যোগ্য হবে না। আমি হিন্দুধর্মকে আমার জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসি ব'লেই এই কলঙ্ক আমার কাছে এক অসহ্য বোঝা ব'লে মনে হয়। আমাদের জাতের এক-পঞ্চমাংশের সমতার ভিত্তিতে মিলবার অধিকার অস্বীকার করলে ভগবানকেই আমাদের অস্বীকার করা হবে—তা যেন আমরা না করি।[৬]

এই আবেগপূর্ণ আবেদনে কিছুই অনুক্ত থাকেনি। কিন্তু জমিদার ও হিন্দুধর্মকে জিইয়ে রাখার জন্য একইরকম আবেগপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা গোটা ব্যাপার-টাকেই একটা আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় পর্যবসিত করেছে।

ভূমিব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের কথা ভাবতে অনিচ্ছুক জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সমাজ সংস্কারকেই তাদের প্রধান রণধ্বনি হিসেবে তুলে ধরেছিলো। শিক্ষা, সামাজিক মেলামেশা, বিভিন্ন জাতের একত্রে খাওয়াদাওয়া, "প্রথমত ও শেষত আমরা ভারতীয়" জাতীয় প্রকাশ্য ঘোষণা ইত্যাদির বাইরে জাতীয় আন্দোলনকে যেতে দিতে বুর্জোয়াদের শ্রেণী সমন্বয় প্রস্তুত ছিলো না।

আমরা এক্ষুনি দেখবো যে জাতপাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম বুর্জোয়াদের শ্রেণীস্বার্থকেই ব্যাহত করতো। তাদের প্রায় সমস্ত নেতারাই এসেছিলেন উচ্চবর্ণ থেকে, ফলে তাদের সমঝোতার দৃষ্টিভঙ্গিই জোরদার হতো। তাহলে কীভাবে, এইসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কংগ্রেসের এই স্পষ্টত প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী-নীতি জনসাধারণকে টানতে এবং বৃটিশদের পশ্চাদপসরণ করাতে সমর্থ হলো? কীভাবে বিভিন্ন নীচুজাতের মানুষ সমন্বিত কৃষকসমাজ বিরাট সংখ্যায় যোগ দিতে পারলো? বস্তুত জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার আবেদনই তাদের আকৃষ্ট করেছিলো, কেননা তাদের দুঃখদুর্দশার কারণ হিসেবে বিদেশী শাসনকে চিহ্নিত করতে তাদের অসুবিধে হয়নি। এটাই ছিলো নতুন শ্রেণী-বাস্তবতা—সাম্রাজ্যবাদী

শোষণের পটভূমিকায় গড়ে-ওঠা ঐক্য—কংগ্রেস যার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলো, এবং যারাই এর বিরোধিতা করেছিলো, তারাই অনিবার্যভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিলো। পুরোনো সামন্ত সম্পর্কের সঙ্গে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সমন্বয় চিরাচরিত শ্রেণী-কাঠামোর মধ্যে একটি জাতীয় ঐক্যের অনুভূতির বিকাশ ঘটিয়েছিলো।

সাম্রাজ্যবাদ

এক জাতীয় ছত্রছায়ায় কংগ্রেসী নেতারা যখন বিভিন্ন জাত ও গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেষ্টা করছে তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাও নিশ্চুপ হয়ে ছিলো না। জাতীয় বুর্জোয়ার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তারা তুলে ধরেছিলো মুসলিম, পিছিয়ে থাকা জাত ও অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী, সরকারী চাকরীতে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রভৃতির প্রস্তাব। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো পিছিয়ে থাকা গোষ্ঠীগুলির মধ্যে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলে সাধারণ সংগ্রাম থেকে তাদের সরিয়ে আনা, গণপ্রতিরোধে ভাঙন ধরানো এবং পৃথক জাত-পাতগত স্বাতন্ত্র্যবোধকে জিইয়ে রাখা। বিরাজমান জাত-পাতগত বৈষম্য, হিন্দুদের হাতে অস্পৃশ্যদের দানবিক নির্যাতন, এবং হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিভেদ তাদের এই চক্রান্তের পক্ষে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিলো।

কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এ খেলা সাম্রাজ্যবাদীরা খেলতে পারেনি। তারা নিজেরাই বিরাজমান ভূমিব্যবস্থার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করার ফলে অস্পৃশ্য ও অন্যান্য নীচুজাতের মানুষদের অবস্থার কোনো প্রকৃত পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়নি। স্বয়ং আম্বেদকরকে তাই সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে হয়েছিল:

> আমার আশংকা হচ্ছে এই যে, এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার কথা বৃটিশরা তুলে ধরছে তা পাল্টাবার জন্য নয়, বরং তাদের এই দুশ্চিন্তা যাতে ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে সেজন্য। আপনাদের সম্পর্কে বৃটিশ সরকার বিরাজমান অবস্থাকেই মেনে নিয়েছে এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাকে রক্ষা করেছে, ঠিক যেন সেই চীনা দর্জির মতো, যে পুরোনো একটা কোটের অনুকরণে কোট তৈরী করতে গিয়ে সগর্বে তার পুরোপুরি নকল ক'রে একটা নতুন কোট তৈরী করেছিলো, এমনকি তার ছেঁড়া ফাটা ও তাপ্পিগুলোও…আপনাদের সমস্যাগুলি আপনাদের মতো ভালোভাবে কেউ দূর করতে পারবে না, এবং আপনারাও সেটা পারবেন না, যদি রাজনৈতিক ক্ষমতা আপনাদের হাতে না আসে। বৃটিশ সরকার থাকলে এই ক্ষমতার সামান্যতম অংশও আপনারা পাবেন না। একমাত্র স্বরাজ সংবিধান হলেও আপনার রাজনৈতিক ক্ষমতা পেতে পারেন, এবং তা না হলে কিছুতেই আপনারা আপনাদের জনসাধারণের মুক্তি আনতে পারবেন না।[৭]

আমরা এক্ষুনি দেখবো যে, তিনটি শক্তিশালী শ্রেণীস্বার্থ—সাম্রাজ্যবাদীদের,

জমিদারদের এবং বুর্জোয়া নেতৃত্বের—জমিদার ও প্রাক্-পুঁজিবাদী ভূমিব্যবস্থা বজায় রাখার মাধ্যমে জাতপাতব্যবস্থার পক্ষেই কার্যত কাজ করে চলেছিলো।

স্বাধীনতা উত্তর সমঝোতা

সেই একই জিনিষ চলেছে স্বাধীনতার পরেও। প্রশাসনিক যন্ত্রের সাহায্যে অস্পৃশ্য ও অন্যান্যদের ছিঁটেফোটা সুবিধে দিয়ে মিথ্যে আশা জাগিয়ে তোলার প্রক্রিয়া নতুন শাসকশ্রেণীগুলিও চালিয়ে যাচ্ছে। সংবিধান জাত-পাত নির্বিশেষে আইনের চোখে সমান অধিকার দিয়েছে; পার্লামেন্ট অস্পৃশ্যতাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু ভূমি-সম্পর্কের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন হয়নি, যদিও এর মৌলিক অপসারণই কেবল অস্পৃশ্যতা ও জাত-পাত ব্যবস্থার মূলে আঘাত আনতে পারতো। ফলত নতুন শাসকেরা বৃটিশদের মতো একইরকম প্রতারণার পথ অনুসরণ করছে—চাকরী সংরক্ষণ, কলেজে আসন সংরক্ষণ, সরকারী উচ্চপদে সংরক্ষণ প্রভৃতির।

এই বুর্জোয়া-জমিদার সরকারের ভূমিসংস্কার আইনগুলি তৈরীই হয়েছে পুরোনো সম্পর্কগুলিকে তাদের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে ঘষা-মাজা করার জন্য। আইনত জমিদারী ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়েছে, কিন্তু মৌলিক কাঠামোটি ও তজ্জনিত বৈষম্য অপরিবর্তিতই রয়েছে। এবং প্রণীত আইনগুলিই কার্যকর হয়নি, ফলতঃ উদ্বৃত্ত জমিবণ্টনের আইনটি বিরাট এক প্রহসনে পরিণত হয়েছে এবং কংগ্রেসী আইন প্রণয়নের পরেও জমির কেন্দ্রীভবন বেড়েছে।

আগের মতোই প্রশাসন ও শ্রেণী-শাসন জাত-পাত ও অস্পৃশ্যতা জিইয়ে রাখার অর্থনৈতিক কাঠামোর পক্ষে দাঁড়িয়েছে। মুখে তারা যা-ই বলুক না কেন, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক বুর্জোয়া-জমিদার সমঝোতার পক্ষে অন্য কিছু করা সম্ভবই নয়। বহু বিজ্ঞাপিত বিশ দফা কর্মসূচীর শোচনীয় পরিণতি এরই প্রমাণ বহন করছে।

এই পরিস্থিতিতেই তাই এটাই স্বাভাবিক যে, জনগণ জাত-পাত বিভেদের শিকার হবেন, মেহনতী মানুষেরা জাতপাতের ভিত্তিতে বিভক্ত হবেন এবং তাদের সাধারণ ঐক্যের—যা প্রতিনিয়ত গড়ে উঠছে—কথা বিস্মৃত হবেন। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এটাই যে, সর্বহারাদের এক নতুন শ্রেণী গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াই ভূমিব্যবস্থা অব্যাহত থাকার ফলে বিলম্বিত হচ্ছে, এবং পুরোনো জাত-পাতভিত্তিক মতাদর্শই প্রাধান্য বিস্তার ক'রে যাচ্ছে। ভারতে স্বাধীনতা-উত্তর প্রধান শ্রেণী-স্বার্থ বাস্তবত জাত-পাত বিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি জিইয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হচ্ছে।

জাত-পাত-বিরোধী স্রোত

আর এমনকি কংগ্রেসের আবির্ভাবেরও আগে থেকে জাত-পাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে

সরাসরি আঘাত হানার যে স্রোত কাজ করেছিলো, তার কী হলো? সাহসের সঙ্গে দানবিক জাত-পাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে-দাঁড়ানো সেই প্রতিবাদ আন্দোলনগুলির কেন এমন শোচনীয় পরিণতি হলো? এক সময় দেশের বেশ কিছু অংশে ঝড়ের মতো আবির্ভূত অ-ব্রাহ্মণ আন্দোলনগুলি কোথায়ও জাত-পাত ব্যবস্থাকে ধাক্কা দিতে সমর্থ হয়নি। আম্বেদকারের মতো একজন অসাধারণ নেতার নেতৃত্ব সত্ত্বেও অস্পৃশ্যদের বিরাট আন্দোলনগুলি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। অস্পৃশ্যদের বিরুদ্ধে জঘন্য নির্যাতন অব্যাহতই রয়েছে। এই আন্দোলনগুলি বা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের শর্ট-কাট পথও সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। এটাই তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে এক নির্মম পরিহাস যে, এই নয়া বৌদ্ধদেরও আবার আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাদেরকে তপশীলভুক্ত জাতি হিসেবে গণ্য করবার জন্য দাবী তুলতে হচ্ছে।

হিন্দুসমাজে তথাকথিত নীচুতলার বা নীচুজাতির লোকেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাহলে কেন এই সংখ্যাগরিষ্ঠরা এই জাত-পাতগত বৈষম্যের কলঙ্ক দূর করতে এবং কিছু ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের লোকের চক্রান্তকে বিধ্বস্ত করতে পারছে না? বাস্তব ঘটনা হচ্ছে এটাই যে, জাত-পাত-বিভেদের বিষ তার শিকারদের পর্যন্ত—অর্থাৎ নীচুজাতির মানুষকে, যারা বিভিন্ন জাত বা আধা-জাতে বিভক্ত—আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। প্রত্যেকে তার জাতির প্রতি কৃত অন্যায়কে স্বীকার করলেও, তারাই আবার উচ্চতর জাতের দোহাই দিয়ে অন্যদের ওপর কৃত অন্যায়কে দূর করতে এগিয়ে আসতে রাজী হয় না। যেমন, মহারাষ্ট্রের অ ব্রাহ্মণ আন্দোলনে সমস্ত নীচুতলার ও জাতের মানুষ অন্তর্ভুক্ত ব'লে শোনা গেলেও অস্পৃশ্যরা কিন্তু যেমনকার তেমনই রয়ে গেছে। একসময়ে তাই আম্বেদকার পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, মারাঠারা ব্রাহ্মণদের চেয়েও অস্পৃশ্যদের বেশি নির্যাতন করছে।

বস্তুত কংগ্রেসের জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্ব যে জাত-পাতের প্রশ্নে তাদের সমঝোতা-মূলক নীতি ও পুনরুজ্জীবনবাদী নীতি নিয়েও চলতে পেরেছেন, তার কারণটি হচ্ছে এই যে, এইসব নীতি জনসাধারণের মধ্যেও বিষাক্ত প্রভাব বিস্তার করেছে।

এ বিষয়ে প্রথম দিককার জাত-পাত বিরোধী নেতারা কংগ্রেসী নেতাদের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা ছিলেন। এটাই অনিবার্য ছিলো যে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জাত-পাত ব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ার জেগে উঠবে। এই দুটোই ছিলো একই প্রক্রিয়ার—প্রাক্-পুঁজিবাদী সম্পর্কের মহাসমুদ্রের মধ্যে এক নতুন জাতি গঠনের প্রক্রিয়ার অঙ্গ।

জাত-পাত-বিভেদ ও জাত-পাতগত চেতনার বিরুদ্ধে আক্রমণ হানতে গিয়ে জাত-পাত-বিরোধী অ-ব্রাহ্মণ নেতারা প্রাচীন সামন্ত যুগের মতাদর্শ ও উপরি-কাঠামোর ওপরেই আঘাত হানছিলেন। সমাজ পরিবর্তনের জন্য ওই মতাদর্শ ও চেতনার ওপর আঘাত হানা ও ওই উপরি-কাঠামোর স্বরূপ উদঘাটন ও অপসারণ দরকার ছিলো। অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ধীরে ধীরে উন্নতি ঘটুক এবং নতুন অর্থনৈতিক বাস্তবতা

ও নতুন শ্রেণীর বিকাশ ঘটুক, তাহলেই জাত-পাত ব্যবস্থা ও জাত-পাতগত চেতনা নিজে নিজেই অন্তর্হিত হয়ে যাবে—এ ধরণের যুক্তির কোনো ভিত্তিই নেই। কোনো প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শের বিরুদ্ধে লড়াই না চালালে সেটা অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পথে, অর্থনৈতিক কাঠামোকে পাল্টানোর পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবেই। সেটা পরিবর্তনের পথরোধ করবে। ভারতেও জাত-পাতগত প্রাধান্য ও চেতনা এ ধরণের এক প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে, জনগণের বিপ্লবী ঐক্য গড়ে তোলার পথে বাধা সৃষ্টি করছে। কাজেই প্রথম দিককার জাত-পাত-বিরোধী নেতারা এই জাত-পাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে খুবই ভালো কাজ করেছিলেন। এটা এ কারণেই আরো ভালো ছিলো যে, তৎকালীন জাতীয় নেতারা উচ্চবর্ণ উদ্ভূত হয়ে এবং বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের আরেক অংশের প্রতিনিধিত্ব ক'রে তখনও পর্যন্ত উচ্চজাত-পাতের চেতনা থেকে মুক্ত হতে পারেননি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ, যেমন তিলক, এই জাত-পাত ব্যবস্থার প্রচণ্ড সমর্থক ছিলেন। তিনি সম্মতির বছর (age of consent) বিলেরই শুধু বিরোধিতা করেননি, এমন কি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাবেরও তিনি বিপক্ষে ছিলেন। আগেই আমরা দেখিয়েছি, জাত-পাতের ব্যবস্থার এ ধরণের, এবং পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থার সঙ্গে সমঝোতার মধ্যেই নিহিত ছিলো সামন্ত সম্পর্কের সঙ্গে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের সমঝোতা ও জোটবদ্ধতা। এ প্রসঙ্গে তাই মহারাষ্ট্রের জাত-পাত-বিরোধী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা ও পরিণতি উপলব্ধি করার জন্য এই আন্দোলনের বিকাশ নিয়ে একটু আলোচনা করাটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

জ্যোতিবা'র আন্দোলন

মহারাষ্ট্রের জাত-পাত-বিরোধী আন্দোলন জ্যোতিবা ফুলে'র বিরাট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত। জ্যোতিবা ছিলেন একজন মহান ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতন্ত্রী এবং দরিদ্র ও নির্যাতিত জাতগুলির বন্ধু। কখনোই তিনি তাদের স্বার্থকে সবচেয়ে প্রাধান্য দিতে দ্বিধা করেননি। বিধবাবিবাহ, শিক্ষা, মদের দোকান, জাত-পাতগত শোষণ, আমলাতান্ত্রিক নিপীড়ন, অথবা সুদ ও জমি দখল, ভারতের অর্থনীতির লুণ্ঠন, নতুন কোনো বাজার স্থাপন বা জনগণের স্বার্থহানি ক'রে ভাইসরয়কে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য সাজসজ্জা, কিংবা রাজকীয় অতিথির জন্য ভোজসভা—সমস্ত ব্যাপারেই তিনি নিঃসংকোচে ও নির্ভয়ে জনগণের স্বার্থের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। অস্পৃশ্যদের প্রতি তাঁর আবেগপূর্ণ সমর্থন ছিলো অভূতপূর্ব, তাঁর ন্যায়বোধ সমস্ত নিপীড়িত জাতের পক্ষে থাকতো, কোনোরকম জাত-পাতগত পক্ষপাতিত্বই তাঁর ছিলো না। তাছাড়া মুসলিম ও খ্রীশ্চানদের জন্য তিনি সমানাধিকার দাবী করতেন। কাজেই এই আন্দোলন যে প্রথমে 'সত্যসাধক' আন্দোলন নামে অভিহিত হতো, তাতে বিস্ময়ের কিছু ছিলো না—কেননা এই আন্দোলন ছিলো ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যযুক্ত হিন্দু সামাজিক

বিন্যাসের সমস্ত অসত্য, অন্যায় ও ভণ্ডামিরই বিরুদ্ধে। ব্রাহ্মণ ও তাদের মতাদর্শের বিরুদ্ধে তিনি চালিয়ে গেছিলেন এক ধারাবাহিক অভিযান।

হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমতার পক্ষে ও জাত-পাতগত প্রাধান্যের বিরুদ্ধে যে কোন আন্দোলনেরই একটি ব্রাহ্মণ-বিরোধী প্রবণতা থাকতে বাধ্য। আরো কয়েকটি উপাদান এর পেছনে কাজ করেছিলো। জ্যোতিবাদের প্রজন্ম পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর রাজত্বের দুঃস্বপ্ন কিছুতেই ভুলতে পারে নি। জ্যোতিবা'র জীবনীলেখক কীয়ার 'লোকহিতবাদী' থেকে দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের রাজত্বের বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবে : "কৃষকরা এমনকি খরা বা দুর্ভিক্ষের সময়েও তাদের প্রাপ্য খাজনা দিতে অসমর্থ হলে তিনি তাদের ছেলেমেয়েদের গরম কড়াই থেকে ফুটন্ত তেল ঢালতেন; তাদের ন্যুব্জ পিঠের ওপর চাবুক মারার অনুশীলন চলতো, তাদের মাথা গুঁজে দেওয়া হতো দমবন্ধকরা ধোঁয়ার মধ্যে, তাদের নাভিদেশে ও কানে বারুদ ছড়িয়ে দেওয়া হতো।" 'লোকহিতবাদী' থেকে উদ্ধৃত করে আবার জানানো হয়েছে যে, বৃটিশরা বাজীরাওকে ক্ষমতাচ্যুত করলে নারীরা উল্লাসভরে বলেছিলো : "বাজীরাও-রাজত্ব শেষ হয়েছে, এতেই আমরা খুশি। শয়তানটার উপযুক্ত পরিণতিই হয়েছে।" দ্বিতীয় বিষয়টি ছিলো এই যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানো সত্ত্বেও হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণরাই প্রভুত্ব করতো, এবং অব্রাহ্মণদের নীচুজাতের লোক ব'লে ঘৃণা করতো। শেষত, বৃটিশ শাসনাধীনে নতুন বুদ্ধিজীবীদের উদ্ভব ঘটেছিলো প্রধানত উন্নত ব্রাহ্মণ সমাজ থেকেই—অফিসার, অধ্যাপক, নিম্নপদস্থ আমলা, লেখক, সম্পাদক প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি তারাই দখল করেছিলো, এবং এভাবে জাগিয়ে তুলেছিলো পুরোনো দুঃস্বপ্নের পুনরাবৃত্তির আশংকা।

জ্যোতিবা অনিবার্যভাবে তাঁর ন্যায়সঙ্গত ক্রোধ ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করলেও, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি মোটেই সংকীর্ণ ছিলো না, বরং ছিলো গণতান্ত্রিক। সেকারণেই তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে সবচেয়ে আপোষহীন যোদ্ধা। তাঁর সঙ্গে তাঁর বিরোধীদের সমঝোতার কোনো প্রশ্নই ওঠেনি—কেননা তিনি হিন্দুসমাজের কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে স্থান করে নিতে আগ্রহী ছিলেন না।

জ্যোতিবা ছিলেন নতুন বুদ্ধিজীবী সমাজের একজন। শুধুমাত্র উচ্চবর্ণের মধ্যেই বুদ্ধিজীবী সমাজ ও গণতান্ত্রিক ভাবধারার বিকাশ ঘটেনি—নীচুতলাতেও তার অঙ্কুরোদ্গম ঘটেছিলো। জ্যোতিবা ছিলেন বঞ্চিতদের স্রোতের প্রতিনিধি—কারণ তা এসেছিলো হিন্দুসমাজের সবচেয়ে নীচু বর্গের কৃষকদের মধ্যে থেকে। তাঁর রাজনৈতিক ধ্যানধারণা ছিলো অন্যান্য অংশের বুদ্ধিজীবীদের মতোই। তাদের সঙ্গে তাঁর গভীরতম পার্থক্য ছিলো হিন্দুসামাজিক কাঠামোর বিরুদ্ধে তাঁর আপোষহীন সংগ্রামের মধ্যে। অস্পৃশ্যদের পক্ষে তাঁর দৃঢ় অবস্থান, ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংগ্রাম, জাত-পাত ব্যবস্থার ও আর্যতত্ত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন,

সম্পূর্ণ সমতার জন্য দাবী, হিন্দু-মুসলিম সমতার দাবী, নীচুবর্ণের মানুষদের জন্য শিক্ষার দাবী এবং নারী-পুরুষ সমানাধিকারের দাবী—এসবই ছিলো পুরোনো সামাজিক বিন্যাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কর্মসূচী। এটা ছিলো লক্ষ্ণৌএর হিন্দু-মুসলিম চুক্তি বা গান্ধী জাতীয় ঐক্য কর্মসূচীর তুলনায় সমতা ও ঐক্যের অনেক বেশি প্রগতিশীল কর্মসূচী। এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হতে পারতো কেবলমাত্র ভারতের সমস্ত ভূমি-সম্পর্ক ও বৃটিশ শাসনের মৌলিক অবসানের মধ্যে দিয়েই—যদিও এইকর্মসূচীর প্রণেতা নিজে সচেতনভাবে তা উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁর ধারণা ছিলো শিক্ষা ও চেতনার বিস্তার, জাত-পাত-বিরোধী চেতনা এবং ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য ও বৃটিশ শাসনাধীনে উন্নতির ব্যাপারে শুধুমাত্র উচ্চবর্ণের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমেই তাঁর কর্মসূচী বাস্তবায়িত করা যাবে। কাজেই, পরবর্তীকালের অব্রাহ্মণ নেতারা এই কর্মসূচীর পক্ষে আবেগপূর্ণ সমর্থনের অবস্থান থেকে যে অনেকটাই সরে এসেছিলেন, তা মোটেই আকস্মিক ছিলো না—কেননা, এই কর্মসূচী ধরে এগোতে গেলে অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো গ্রামাঞ্চলে প্রাধান্যবিস্তারকারী জাত ও শ্রেণীগুলির—যার মধ্যে অব্রাহ্মণেরাও ছিলো—জমির ওপর একাধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করা।

মতাদর্শগতভাবে জ্যোতিবার কর্মসূচী ছিলো হিন্দুসমাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রয়োগ। অর্থাৎ, এটা ছিলো সমস্ত ভূমি-সম্পর্কভিত্তিক পুরোনো সমস্ত উপরি-কাঠামোর ওপর আপোষহীন আক্রমণ। এখানেই নিহিত ছিলো উচ্চবর্ণের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে জ্যোতিবার মৌলিক পার্থক্য—তারা বৃটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে গিয়ে সমঝোতা গড়ে তুলেছিলো দেশীয় প্রতিক্রিয়া এবং সামন্তবাদী ভিত্তি ও উপরি-কাঠামোর সঙ্গে ; আর জ্যোতিবা নিয়েছিলেন সেই উপরিকাঠামোর বিরুদ্ধে এক আপোষহীন সংগ্রামের অবস্থান, তিনি দাবী করেছিলেন তার অবসান। অধিকতর কোনো অনুকূল পরিস্থিতিতে এটাই মৌলিক ভূমি-সম্পর্কের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জে পরিণত হতে পারতো।

জাত-পাত-বিরোধী আন্দোলনে সুবিধেবাদ

জ্যোতিবা'র মৃত্যুর পর এই আন্দোলন তার সামগ্রিক চরিত্রটিই হারিয়ে ফেলেছিলো। এর প্রমাণ হয় এই ঘটনায় যে, তারপর এর নেতৃত্বে চলে আসেন কোলাপুরের মহারাজা, একজন সামন্ত রাজা। তাকে 'ক্ষত্রিয়' ব'লে গণ্য করা হোক—তাঁর এই দাবী আন্দোলনের এক নতুন সমঝোতামূলক পর্যায়ের সূচনা করে। জ্যোতিবা মারা যান ১৮৯৬-এ, দশ বছরের মধ্যে আন্দোলনের এই নতুন নেতা মারাঠাদের জন্য 'বেদোক্ত অধিকার' দাবী (ক্ষত্রিয় হিসেবে স্বীকৃতি) করতে শুরু করেন, এবং আর মাত্র দু' দশকের মধ্যে আন্দোলন পুরোপুরি বিপরীতমুখী হয়ে পড়ে—ক্ষত্রিয়দের বদলে দাবী ওঠে ব্রাহ্মণ হিসেবে স্বীকৃতির। তার নিজের

গোষ্ঠীর, বিশেষত মারাঠাদের, হিন্দুসমাজের মধ্যে অনুকূল অবস্থানের জন্য, এবং পরবর্তীকালে বৃটিশ শাসনে উঁচু পদ পাবার জন্য এক সুবিধেবাদী প্রবণতা আন্দোলনকে গ্রাস ক'রে ফেলে।

দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণবিরোধী কথাবার্তা শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ-বিরোধীই হয়ে দাঁড়ায়, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে তা পরিচালিত হয় না। আরো বেশী পরিমাণে তা পরিণত হয়ে দাঁড়ায় নীচুবর্গ থেকে উদ্ভূত বুদ্ধিজীবীদের জন্য উঁচু পদ পাবার আকাঙ্ক্ষায়। ফলত ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে লড়াই বৃটিশ নির্ভর হয়ে পড়ে। বাস্তবে এর ফলে ১৯২০-র দশকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জোয়ারের প্রথম স্তরে এর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এই অব্রাহ্মণ নেতৃত্ব। এর পরিণতিতে গ্রাম ও শহরের মানুষ যখন জালিওয়ানওয়ালাবাগের গণহত্যার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফুঁসছে, বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী যখন প্রিন্স অফ ওয়েলস্-এর সফরের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে, তখন কোলাপুরের মহারাজা পুণায় বিপুলসংখ্যক কৃষককে জড়ো করছে প্রিন্সকে স্বাগত জানাবার জন্য, প্রিন্সকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে শিবাজী স্মারক-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের গৌরব অর্জনের।

এটা নিশ্চয়ই জ্যোতিবা যে সর্বাত্মক বিদ্রোহের সূচনা করতে চেয়েছিলেন, তার যোগ্য পরিণতি ছিলো না। হিন্দু সামাজিক বিন্যাসের সম্পূর্ণ অবসানের জন্য তাঁর কর্মসূচী সফল হবার একমাত্র পথ ছিলো এই কর্মসূচীকে সামন্ত ও আধা-সামন্ত ভূমি-সম্পর্ক ধ্বংসের এবং গণতান্ত্রিক জনগণের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের— অর্থাৎ এককথায়, গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করার—কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত করা। কংগ্রেসের আপোষকামী নেতৃত্ব এবং অব্রাহ্মণ আন্দোলনের নতুন নেতৃত্ব কেউই এটা করতে পারেনি—কারণ, উভয়েই উদ্ভূত হয়েছিলো একই শ্রেণী থেকে। এর পরিণতিতে সব ফ্রন্টেই পশ্চাদপসারণ ঘটেছিলো, ফলে বুর্জোয়া নেতৃত্ব সক্ষম হয়েছিলো তাদের পেছনে জনতাকে জড়ো করতো। বিলীন হয়েছিলো জনগণের স্বাধীন ও বৈপ্লবিক সংহতির জন্য পথিকৃৎ-এর স্বপ্ন। যে আন্দোলনের সম্ভাবনা ছিলো বিপ্লবী অভ্যুত্থানের পথে কৃষকদের স্বাধীন ভাবে সমবেত করার, তা-ই অবনত মস্তকে মেনে নিয়েছিলো বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্ব।

আবার ভূমিগত স্বার্থ

কংগ্রেসের মধ্যে অব্রাহ্মণ আন্দোলনের বিলীন হয়ে যাবার পেছনে কারণগুলি কী ছিলো? প্রথমত, কৃষকসমাজের সঙ্গে যুক্ত নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আবেগ অনুভব করতে পেরেছিলো। তাই তাদেরকে জাতীয় আন্দোলন থেকে আগেকার বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে উঠে কৃষকসমাজকে নিয়ে এতে যোগ দিতে হয়েছিলো। দ্বিতীয়ত, মৌলিক প্রাক্-পুঁজিবাদী ভূমি-সম্পর্কের অর্থাৎ কৃষক-শোষণ ও জাত-পাত-বিভেদের ভিত্তির ওপর আঘাত হানবার সাহস দেখাতে পারলেই কেবল তারা

একটি স্বতন্ত্র পথ অনুসরণ করতে পারতো। কংগ্রেস নেতৃত্বের মতো এই অব্রাহ্মণ বুদ্ধিজীবীরাও তা করতে প্রস্তুত ছিলো না। এখানেই তাদের জাত-পাতগত বিভেদ অন্তর্হিত হতে শুরু করে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বুর্জোয়া পটভূমিকায় তারাও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মতোই সমঝোতার পথ ধরে, পথিকৃৎ-এর আপোষবিরোধী নীতি বিসর্জন দেয়, কংগ্রেসের মধ্যে ঢুকে পড়ে, এবং পরবর্তীকালে কংগ্রেসী মন্ত্রীত্বে যোগ দেয়, জনগণের ওপর নির্যাতন চালায় এবং জাত-পাতগত বিভেদকে জিইয়ে রাখে। তাই স্বাধীনতা উত্তরকালে দেখা যায়, অধিকাংশ অব্রাহ্মণ বুদ্ধিজীবী, এমনকি এক-আধজন অস্পৃশ্যদের নিয়ে গঠিত মন্ত্রীসভাও আগেকার ভূমি-সম্পর্ক ও জমিদারদের স্বার্থরক্ষার কংগ্রেসী ঐতিহ্যকেই বজায় রাখে, এবং জাত-পাত ব্যবস্থার বিলোপের জন্য কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করে না। জাত-পাতগত নির্যাতন, বিশেষত হরিজনদের ওপর, মহারাষ্ট্রেও তাই কোনো অংশে কম নয়।

জাত-পাত বিরোধী আন্দোলন কৃষি-বিপ্লব থেকে বিচ্ছিন্ন হলে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হলে কী হয়, তা মহান জাত-পাত-বিরোধী সংগ্রামী পেরিয়ার ই ভি রামস্বামীর জীবন থেকে সহজেই বোঝা যাবে। রামস্বামী প্রথমে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, স্বাধীনতার পক্ষে প্রচার চালিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃত্বের জাত-পাতগত কুসংস্কারের জন্য প্রচণ্ড বিক্ষোভে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে যান। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি অনেক দূরে সরে যান, কিছু সময়ের জন্য কৃষি-সম্পর্কের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ফিরে এসেও আবার তিনি এমন সব সমঝোতা ও পন্থার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন, যা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে কখনোই পৌঁছুতে পারে না। এন রাম তাই মার্গুরিট রস বার্ণেটের 'দি পলিটিকস অফ কালচারাল ন্যাশনালিজম ইন সাউথ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে পেরিয়ারের জাত-পাত অবসানের পন্থার সার-সংকলন করেছেন এভাবে :

> এমন একজন যুবক যিনি সামাজিক আচার-ব্যবহারের জাত-পাতভিত্তিক অনুশাসন ভেঙেছেন সাহসের সঙ্গে; যিনি যৌবনে সন্ন্যাস ও ধর্মের মধ্যে বুদ্ধিগত ও সামাজিক প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন; যিনি একজন আন্তরিক কংগ্রেসকর্মী হিসেবে সর্বান্তঃকরণে স্বাধীনতা ও সামাজিক সংস্কারের পথে সক্রিয় থেকেছেন এবং এজন্য নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যয় করতেও পিছ-পা হননি; যিনি কংগ্রেসের উচ্চবর্ণ ভিত্তিক কুসংস্কার ও সামাজিক কূপমণ্ডুকতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে সমাজ-সংস্কারের পতাকাকে উঁচুতে তুলে ধরেছেন, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ঘুরে এসে কিছু সময় প্রচণ্ড উৎসাহে কমিউনিজমের পক্ষে প্রচার চালিয়েছেন এবং জমিদারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সম্মেলন সংগঠিত করেছেন; যিনি আত্মসম্মান সংঘের নেতা হিসেবে দুর্ভাগ্যবশত জাতীয়তা-বিরোধী জাস্টিস পার্টির সঙ্গে সহযোগিতার ফাঁদে পড়েছেন; যিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের নেতা ও প্রচারক হিসেবে

দ্রাবিড়নাড়ু দাবী করেছেন এবং উত্তর ভারতের প্রাধান্যের ও হিন্দী চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছেন, যিনি জাষ্টিস পার্টির নেতা হিসেবে জনগণের চোখে সম্পূর্ণ অসম্মানিত হয়েছেন, যিনি দ্রাবিড় কাজাঘাম নেতা হিসেবে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে বৃটিশদের তাঁবেদারী করেছেন; যিনি একটি বিষাদের প্রতিমূর্তি হিসেবে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধিতা করেছেন, স্বাধীনতা দিবসকে 'শোকের দিবস' ব'লে অভিহিত করেছেন এবং 'ব্রাহ্মণ রাজে'র হাত থেকে মুক্তি দাবী করেছেন; যিনি নবগঠিত দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম পার্টিকে সমর্থন করেছেন এবং সি রাজাগোপালাচারির নেতৃত্বে গঠিত কংগ্রেস মন্ত্রিসভার বিরোধিতা করেছেন; যিনি 'কামরাজ কংগ্রেস'কে 'প্রকৃত তামিলদের' স্বার্থের প্রতিনিধি ব'লে সমর্থন করেছেন; যিনি ক্ষমতাসীন ডি এম কে কে সমর্থন করেছেন; যিনি মূর্তিবিরোধী হিসেবে তাঁর দীর্ঘ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তামিল ভাষা ও সংস্কৃতির বিরোধিতা করেছেন; যিনি সমাজসংস্কারের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন শ্রেণী-বিশ্লেষণ এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের কোনো বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব ছাড়াই ·।[৯]

পেরিয়ার জাত-পাতের বিরুদ্ধে বিরাট এক বিক্ষোভ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই তার লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। এর সাম্প্রতিক প্রমাণ মিলেছে ভিল্লুপুরম দাঙ্গায়, যাতে কয়েকজন হরিজন নিহত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ করা দরকার যে, ডি এম কে সরকারের শাসনাধীনেই তাঞ্জাবুর জমিদারদের গুণ্ডারা হরিজন কৃষি-মজুরদের বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে ৭০ জনের বেশী নারী ও শিশুকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে। এবং এই হত্যাকাণ্ডের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সবাই ছাড়া পেয়েছে।

আম্বেদকার

হরিজনদের বিরুদ্ধে বর্তমান ও পূর্ববর্তী সরকারের শাসনকালে সংঘটিত দানবিক অত্যাচারগুলিই স্বাধীনতা পরবর্তী তিন দশক ধরে কীভাবে পুরোনো অত্যাচার ও অন্যায়গুলি অব্যাহত রয়েছে তা দেখিয়ে দিচ্ছে। জীবনের প্রথমদিকে হরিজনদের পক্ষে সবচেয়ে অসাধারণ ও অক্লান্ত যোদ্ধা আম্বেদকার উচ্চবর্ণের ভণ্ডামিগুলি উদ্ঘাটন করে দিয়েছেন, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন, এবং পরবর্তীকালে হরিজনদের জন্য জমি ও আলাদা বসবাসের ব্যবস্থা দাবী করেছেন। এগুলি অবশ্যই কৃষিবিপ্লব ছাড়া অর্জন করা সম্ভব ছিলো না। কিন্তু ভূমিদাসসুলভ নির্ভরতার হাত থেকে রক্ষার জন্য হরিজনদের মধ্যে জমিবণ্টনের ধারণাটি ছিলো খুবই সঠিক। সমস্ত জমিদারদের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামের মাধ্যমেই কেবল তা একই সাথে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হতে পারতো।

শেষদিকে তিনি হিন্দুসমাজের বঞ্চনা থেকে বাঁচবার জন্য তার অনুগামীদের

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে বলেছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও অসম ভূমি-সম্পর্ক ভিত্তিক সমাজবাস্তবতা পরিবর্তিত হয়নি। প্রেম ও সমতার অনুসন্ধান যে বাস্তবায়িত হয়নি সাম্প্রতিক নৃশংস অত্যাচারের ঘটনাগুলিই তার প্রমাণ বহন করছে। এবং অবস্থার ট্র্যাজেডিটা ছিলো এখানেই যে, সবচেয়ে নির্যাতিত গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত মতাদর্শগতভাবে সমতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা, আবো চাকরী, আসন সংরক্ষণ, শিক্ষার সুযোগ প্রভৃতির বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পাবেননি। বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধ্বংসের ব্যাপারটা তাদের চেতনাতেই ধরা পড়েনি। অন্য সবার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে ভূমি-সম্পর্কের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তাটাও তারা অনুভব করতে পারেননি। এইসব গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত বুদ্ধিজীবীরা কিছু আগে বা পরে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাঠামোটিকেই মেনে নিয়েছেন, এবং জমি ও শিল্পক্ষেত্রে বর্তমান সম্পত্তি-সম্পর্ককে ব্যাহত না করে গণতান্ত্রিক অধিকারের সাধারণ ঘোষণাতেই তারা সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন।

কংগ্রেস নেতৃত্ব ও তাদের শঠতার বিরুদ্ধে আম্বেদকারের চেয়ে বেশি কেন্দ্রীভূত আঘাত কেউ হানতে পারেননি। এবং তা সত্ত্বেও তিনিই ছিলেন সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত কংগ্রেস, যাকে গণতন্ত্রের ব্যাপারে শেষ কথা ব'লে অভিহিত করেছে সেই ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। এবং এই সংবিধানের অধীনেই হরিজনদের ঘরবাড়ী পোড়ানো ও লুটপাট করা হয়েছে, তাদের স্ত্রী-কন্যারা ধর্ষিতা হয়েছে, নির্বিচারে তাদেরকে খুন কবা হয়েছে। কাজেই আম্বেদকার যে শেষ পর্যন্ত নিজেকে প্রবঞ্চিত মনে করতেন, তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

শ্রমিকশ্রেণী

এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিকাশ এবং জাত-পাত ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের প্রচার তেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারেনি। কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক আন্দোলন ছিলো দুর্বল, এবং এখনও পর্যন্ত কৃষি-বিপ্লব সংগঠিত করার পক্ষে তা দুর্বলই রয়ে গেছে। সাধারণ নিপীড়কের বিরুদ্ধে ব্যাপক ও তীব্র সংগ্রামের মাধ্যমেই কেবল জাত-পাত বিভেদের অবসান তথা জাত-পাতগত সমতার ভিত্তি রচিত হতে পারে। এ ধরণের ঐক্য অর্জিত হয়েছিলো তেলেঙ্গানার সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেখানে হরিজন কৃষিমজুর এবং উঁচুবর্গের কৃষকরা একসঙ্গে লড়াই চালিয়েছিলো। কৃষি-বিপ্লবের ওপর কমিউনিস্টদের গুরুত্ব প্রদান একই সঙ্গে জাত-পাত ব্যবস্থার ভিত্তি ও দুর্গে আঘাত হানার দিকে পরিচালিত হয়েছিলো।

কিন্তু তখনও পর্যন্ত প্রধানত জমির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শ্রমিকশ্রেণী পুরোপুরি আধুনিক শ্রেণীর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। তখন তারা ছিলো গঠনের প্রক্রিয়ায়। তবুও, দিনের পর দিন সমস্ত জাত ও গোষ্ঠীর সঙ্গে একসঙ্গে ধর্মঘটে

অংশগ্রহণ করে তারা শ্রেণী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। তাদের শ্রেণী অনুভূতি বারবার জাত-পাত বা সম্প্রদায়ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। প্রথম থেকেই জাত-পাত ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের প্রচার আন্দোলন এই শ্রেণী সংহতি গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে।

সংস্কারবাদের প্রভাব

যাই হোক, জাত পাতগত ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ এখনও রয়ে গেছে এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের স্বার্থে এখনও তা ব্যবহৃত হচ্ছে, অবশ্য শহরাঞ্চলে ও শ্রমিকদের মধ্যে ধীরগতিতে এ সম্পর্কিত চেতনা বিকাশের পেছনে অন্য কারণও কাজ করেছে। শ্রমিক শ্রেণীর একটা বেশ বড়ো, এমনকি প্রধান, অংশ এখনও জাতীয় বুর্জোয়া ও তাদের সমর্থকদের দ্বারা প্রভাবিত। ধর্মঘট ও সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে তারা সমাজে বিরাজমান শ্রেণীসম্পর্ক এবং রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণীচরিত্র ঢেকে রাখতে বিশেষ চেষ্টা করে এবং যৌথ সংগ্রামগুলিকে নেহাৎ অর্থনীতিবাদে পরিণত করে। এসব, এবং তার সাথে সাথে কৃষকসমাজ ও নিপীড়িত জাতগুলির অবস্থার কথাকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রচেষ্টা শ্রমিকশ্রেণীকে জাত-পাতের প্রভাব থেকে মুক্ত করার পথে বাধা সৃষ্টি করে।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে, জাত-পাত ব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম কিছু পরিমাণে অবহেলিত হয়েছে। সে কারণেই সি পি আই (এম) তার সাম্প্রতিক প্লেনামে সামন্ত ও আধা-সামন্তবাদী মতাদর্শের বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রাম গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সংগ্রাম ছাড়া এবং জাত-পাতগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সক্রিয়তা ছাড়া অর্থনৈতিক আন্দোলন থেকে উদ্ভূত সাধারণ চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আর এই মতাদর্শগত সংগ্রামকে শুধুমাত্র ভূমি-সম্পর্কসহ বর্তমান সামাজিক কাঠামোকে পুরোপুরি পাল্টাবার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে যুক্ত করলেই চলবে না—বিশেষত হিন্দুধর্মের এবং সাধারণভাবে ধর্মের, সামাজিক-অর্থনৈতিক ভূমিকাকে সঠিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর সামনে তুলে ধরতে না পারলে এই সংগ্রাম কখনোই সফল হতে পারবে না। জাত-পাত ব্যবস্থার অবসানের দাবীকে এখন আর হিন্দু সামাজিক সংস্কারের একটি বিষয় হিসেবে এবং আমাদের সময়কার মূল সংগ্রামগুলি—অর্থাৎ কৃষি-বিপ্লবের সংগ্রাম, একচেটিয়া ও সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ ও প্রাধান্যের অবসান ঘটাবার সংগ্রাম যা পরিণতি পাবে সমাজতন্ত্রে—থেকে বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপিত করা যায় না।

অতীত অভিজ্ঞতা থেকে ধরা পড়েছে, যে সমস্ত শক্তি এই মূল সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্নভাবে জাত-পাতবিরোধী সংগ্রাম গড়ে তুলতে গেছে, তারাই ব্যর্থ হয়েছে এবং অকিঞ্চিৎকর ফলাফল প্রসব করেছে। এটাও ধরা পড়েছে যে, বিচ্ছিন্নভাবে

নয়, বরং সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও শ্রেণী-সংগ্রামের অঙ্গ হিসেবেই এই জাত-পাত-বিরোধী সংগ্রামকে গড়ে তুলতে হবে। জাত-পাতগত বৈষম্য ও অন্যায় আধুনিক কালের সমস্ত শ্রেণীগত অন্যায়ের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেগুলির অবসান ঘটাতে গেলে তাই দরকার সমস্ত শোষিত জনগোষ্ঠীর সাধারণ সংগ্রাম, তারা যে জাতের লোকই হোক না কেন।

প্রথম পর্যায়ে এটা বেশ অসুবিধেজনক হতেই পারে, কেননা একজন হরিজনকে এজন্য যে অ-হরিজন গরীব কৃষকের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মেলাতে হবে, অনেক সময়েই জমিদার বা তার জাতির পক্ষে সে হরিজনটির ওপর অত্যাচার চালিয়েছে। এখানেই আসছে কৃষক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা—যার মধ্যে দিয়ে অস্পৃশ্য হরিজন, কৃষিমজুর ও গরীব কৃষককে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে তাদের সাধারণ শোষক জমিদারদের বিরুদ্ধে। সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে কৃষকদের মধ্যে জাত-পাতবিরোধী প্রচার ও শিক্ষার মাধ্যমে জাত-পাতগত বিভেদ দূর ক'রে ফেলতে হবে।

নতুন পরিস্থিতি

স্বাধীনতা-পরবর্তী তিন দশকের কংগ্রেসী শাসনে এমন একটা নতুন পরিস্থিতি জন্ম নিয়েছে, যখন গ্রামাঞ্চলে অনেক বেশী তীব্র হয়ে ওঠা শ্রেণীসংগ্রামকে জমিদার শ্রেণী ও তাদের দালালরা এবং বুর্জোয়া-জমিদার সরকার বিভিন্ন জাত-পাতের মধ্যে লড়াইয়ে রূপান্তরিত করার চক্রান্ত চালাচ্ছে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী এই তিন দশকে পুঁজিবাদী পথে যাত্রার ফলে চরমতম দারিদ্রের ও বেকারত্বের তীব্রতা বেড়েছে গ্রামে শহরে প্রায় একইভাবে। জাত-পাত -নির্বিশেষে কোটি কোটি মানুষ নিঃস্ব হয়ে পড়ছে, অন্যদিকে মুষ্টিমেয়দের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে জমি ও পুঁজি। ৩০ বছরের কংগ্রেসী ভূমিসংস্কারের পরেও, হরিজনরা ছাড়াও আবির্ভাব ঘটেছে বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন মজুরের। "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রদত্ত তথ্য অনুসারে, গ্রামীণ পরিবারগুলির সম্পদের (প্রধানত কৃষি-জমি) কেন্দ্রীকরণের অনুপাত ১৯৬০-৬১-তে ছিলো ০.৬৫, ১৯৭১-৭২-এ তা বেড়ে হয়েছে ০.৬৬। এদের মধ্যে সবচেয়ে গরীবদের হাতে রয়েছে ০.১ শতাংশ সম্পদ এবং সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশের হাতে রয়েছে ১৯৭১-৭২ এবং ১৯৬১-৬২ দুটি ক্ষেত্রেই মোট সম্পদের অর্ধেকেরও বেশি।"[১০] এই কেন্দ্রীভবনের ফলে আদিবাসী ও হরিজনরা তো জমি থেকে উৎখাত হয়েইছে, তাছাড়া জাত-পাত নির্বিশেষে বিপুল সংখ্যক কৃষকও জমি হারাতে বাধ্য হয়েছে।

গরীবদের উৎপাদনের উপকরণ থেকে বঞ্চিত করার এই প্রক্রিয়া—যা নাকি পুঁজিবাদী পথেরই একটি বৈশিষ্ট্য—হাজার হাজার মানুষকে রাস্তায় ঠেলে দিয়েছে। "গ্রামীণ শ্রমশক্তির পূর্ণ কর্মসংস্থানের পেছনে কাজ করেছে···প্রতিযোগিতামূলক আধুনিক শিল্পের পেছনে কারিগর ও হস্তশিল্পীদের ধারাবাহিক কর্মচ্যুতি।

একইভাবে, শহরের বেকারত্ব শুধু সংকটাপন্ন শিল্পগুলির শ্রমিকদের, শ্রমিকবাহিনীতে নবাগতদের এবং চারপাশের গ্রামীণ এলাকা থেকে কাজ করতে-আসা শ্রমিকদের কর্মচ্যুতির ফলেই ঘটেনি, তাছাড়া বিপুলসংখ্যক আত্ম-নিয়োজিত ব্যক্তি ও ক্যাজুয়াল শ্রমিকরাও এক সংকটাপন্ন জীবনযাপন করছে।···ভারতে দারিদ্র্যের পরিমাপ করার বিভিন্ন চেষ্টা হয়েছে, এবং এর বিভিন্ন সংজ্ঞার ভিত্তিতে বলা যায়, অন্তত ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ মানুষ ন্যূনতম জীবনধারণের মানের নীচে অবস্থান করছে। ভোগের ক্যালোরি-মাত্রা ভিত্তিক সাম্প্রতিক হিসেব অনুসারে ১৯৭৭-৭৮এ শহরাঞ্চলে অন্তত ৪১ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলে ৪৮ শতাংশ লোক দারিদ্র্যরেখার নীচে রয়েছে। এই সংজ্ঞার ভিত্তিতে গরীবদের মোট সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে প্রায় ২৯ কোটি।”[১১]

বাস্তবত, গরীবদের মোট সংখ্যা ওপরের হিসেব থেকেও অনেক বেশী, কেননা দারিদ্র্যরেখার যা-ইচ্ছে-তাই সংজ্ঞার ভিত্তিতেই এ হিসেব পাওয়া গেছে। আর গ্রামে ও শহরের বেকারত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পেযেছে প্রচণ্ডভাবে। রেজিস্টার্ড বেকারদের সংখ্যা শুধু বড়ো বড়ো শহরাঞ্চলেই ১ কোটির বেশি, আর মোট বেকার সংখ্যা ৪ কোটি ছাড়িয়ে গেছে (সরকারী হিসেবে স্বভাবতই সংখ্যাটা কমিয়ে দেখাবার চেষ্টা চলে। পরিকল্পনা দলিলের হিসেবে ১৯৭৩-এ পুরোপুরি বেকারদের সংখ্যা ছিলো ৪০ লক্ষ। এর সঙ্গে ক্যাজুয়াল চাকুরেদের ধরলেই সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়ায় ১·৮৬ কোটি)।

কাজেই, একদিকে যেমন কেন্দ্রীভবন ঘটছে জমি ও পুঁজির, অন্যদিকে ঠিক তেমনি কেন্দ্রীভবন ঘটছে অর্থনৈতিক দারিদ্র্য ও বেকারত্বের। এটাই হচ্ছে গত তিনটি দশক ধরে দ্রুত বিকশিত শ্রেণী-বাস্তবতা।

সামাজিক বৈষম্যের ব্যাপার তো আছেই, তাছাড়াও হরিজন ও মেহনতী মানুষদের জাত-পাতগত সমস্যা এখন অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে গেছে ভূমিহীনতা ও কর্মহীনতার সঙ্গে—পুঁজিবাদী পথে এদের সবার সাধারণ শোষণের ফলে। অতীতে এই বাস্তবতাকে অনুধাবন তেমনভাবে করা যায়নি। এখন এটা এতোই স্পষ্ট যে, একে এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই।

তাই জমির পুনর্বণ্টন, জমিদারদের বিশেষত উচ্চবর্ণের জমির ওপর একাধিপত্যের অবসান আজ সমস্ত ভূমিহীন ও বেকারদের সাধারণ স্বার্থেই দরকার।

পিছিয়ে-পড়া চেতনা

কিন্তু ভুক্তভোগীদের চেতনা এই বাস্তবতা থেকে রয়েছে পিছিয়ে। সাধারণ সংগ্রাম গড়ে তোলার বদলে, মনে হচ্ছে, জাত-পাতগত সংগ্রাম এক নতুন চরম মাত্রা অর্জন করছে, জাতিগুলির একটি আরেকটির বিরুদ্ধে এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ছে যা আগে কোনোদিন ঘটেনি, এবং এই অভ্যন্তরীণ বিবাদই যেন আজকের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে পিছিয়ে পড়া জাতগুলির জন্য চাকরী সংরক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠিত আন্দোলনগুলির অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ, গাড়ী-ঘোড়া পোড়ানো,

রেলপথ উৎপাটন ইত্যাদি এরই সাক্ষ্য দিচ্ছে। উচ্চবর্ণের এইসব প্রতিবাদী কর্মসূচীই চরম রূপ গ্রহণ করে সমস্তিপুর নির্বাচনে, যখন অধিকাংশই উচ্চবর্ণ থেকে আসা আমলারা শুধু কংগ্রেস (ই) প্রার্থীকে (উচ্চবর্ণের) সাহায্যই করেনি, উপরন্তু জনতা সরকারের একজন মন্ত্রীকে পর্যন্ত গ্রেপ্তার করার উপক্রম করেছিলো।"

সরকারী নীতিও সুনিশ্চিতভাবেই সাধারণ সংগ্রামকে জাত-পাতগত সংঘর্ষে রূপান্তরিত করার এই প্রক্রিয়ায় সহায়তা করছে—যা নাকি নিজেদের শ্রেণীশাসন টিকিয়ে রাখার বুর্জোয়া-জমিদার পন্থা। জমি, চাকরী, সরকারী, সুবিধে, ঋণ, শিক্ষাগত সুবিধে প্রভৃতির এসব প্রতিযোগিতা সহজেই তীব্রতা পাচ্ছে এবং জাত-পাতগত সংঘর্ষের দিকে সেগুলিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যাচ্ছে। পিছিয়ে পড়া জাতগুলির সমস্যা, হরিজন ও আদিবাসীদের জন্য চাকরী সংরক্ষণের সমস্যা, প্রমোশন ইত্যাদির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সমস্যা—এসব কিছুই শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে বিবাদ জাগিয়ে তুলছে, এবং কায়েমী স্বার্থ একেই ব্যবহার ক'রে নিপীড়িত শ্রেণী হিসেবে তাদের ঐক্যে ফাটল ধরাচ্ছে।

ভূমি ও একচেটিয়া স্বার্থের সঙ্গে আবদ্ধ বুর্জোয়া জমিদার সরকার বেকারত্ব ও দারিদ্র্য দূরীকরণের দাবীকে নীচুবর্গের জাতগুলিকে ছিটেফোঁটা 'রিলিফ' সরকারী চাকরীতে সংরক্ষণ, কলেজে আসন, শিক্ষা ও প্রমোশনের সুযোগ—দিয়ে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে।

কিন্তু কোনোভাবেই এসব ছিটেফোঁটা 'রিলিফ' দারিদ্র্য ও বেকারত্বের সমস্যার সমাধান বা হরিজন ও অন্যান্য নীচুবর্গের মানুষদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। এসবের ফলে এসব জাতের কিছু ব্যক্তি হয়তো কিছু সুবিধে পাবে, তাদের উন্নতির পথও হয়তো প্রশস্ত হবে, কিন্তু তাদের সামাজিক অবস্থানের তাতে কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। শাসকশ্রেণীগুলির দিক থেকে দেখতে গেলে, এইসব সুবিধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রথমতঃ, চাকরীর জন্য সাধারণ প্রতিযোগিতায়, তা মেহনতী মানুষের এক অংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়। দ্বিতীয়তঃ, কিছু অংশের মধ্যে তারা এমন একটা ধারণা তৈরী করে যে, সরকারই তাদের প্রকৃত বন্ধু, কাজেই তাদের লড়াইকে এই বুর্জোয়া কাঠামোর মধ্যেই সীমিত রাখা উচিত। এভাবে বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর বিরুদ্ধে সবচেয়ে নীচুবর্গের মৌলিক চ্যালেঞ্জকে অনেকাংশেই ব্যাহত করা যায়।

সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম

কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন হরিজন ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বৈষম্য চলছে, গণতান্ত্রিক ও শ্রমিক আন্দোলন তাদের চাকরী সংরক্ষণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধের বিরোধিতা করতে পারে না। বরং মেহনতীদের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সেগুলিকে সমর্থনই করা উচিত।

একই সঙ্গে সমস্ত জাতের সমস্ত মেহনতী এই শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে যে, এই সুযোগ-সুবিধে একটি সমস্যারও সমাধান করতে পারবে না—নীচুবর্গের মানুষদের অবস্থারও উন্নতি ঘটবে না, বেকার সমস্যারও সমাধান হবে না, বরং এগুলি শুধু মূল শত্রু জমিদার ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দিক থেকে তাদের দৃষ্টি সরিয়ে নেবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণ ঐক্যবদ্ধ শ্রেণীসংগ্রাম গড়ে তোলা যাবে একমাত্র তখনই, যখন শ্রমিকশ্রেণী, গণতান্ত্রিক ও কৃষক আন্দোলন জাত-পাতগত প্রাধান্যের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাবে এবং জাত-পাতগত নির্যাতনেব ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করবে।

ইতিমধ্যেই গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীসংগ্রাম ছড়িয়ে পড়েছে। হরিজনদের ওপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণের একটা কারণই হচ্ছে এই যে, তারা আর ভূমিদাসত্বের বন্ধন মেনে নিতে চাইছে না, তারা আধুনিক শ্রমিক হিসেবে নির্দিষ্ট অবস্থার মধ্যে কাজ করতে চাইছে। শ্রমেব গতিশীলতা, উচ্চতব হারে মজুরি, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার ও জমি চাষের অধিকার—এসব দাবীই অনেকাংশে যে বিবাদের জন্ম দিচ্ছে তা-ই শেষ পর্যন্ত হরিজনদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় পরিণতি পাচ্ছে। এসব কিছুই অস্পৃশ্যতার পেছনকার প্রকৃত অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুস্পষ্ট করে তুলছে। এইসব সংগ্রাম কৃষক সংগ্রামেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, ঐক্যবদ্ধভাবে এ লড়াই চালানো দরকার।

এ ব্যাপারে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠবার জন্য অগ্রণী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। চাকরী ও প্রমোশনের সংরক্ষণের প্রশ্নে এখানেও সমস্যার উদ্ভব ঘটছে। শ্রেণী সংহতির মানসিকতা নিয়েই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

নতুন পরিস্থিতি এটাই দাবী করছে যে, অন্যান্য মেহনতী মানুষের সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্নভাবে জাত-পাতগত সংগ্রাম চালালে চলবে না। প্রথমদিকে নীচুবর্গের মানুষদের সংগ্রাম এক জাতের বিরুদ্ধে অন্য জাতের লড়াইয়ের ভিত্তিতে পরিচালিত হবার মধ্যে একটি অনিবার্যতা ছিলো। এটা আরো বেশি অনিবার্য ছিলো হরিজনদের ক্ষেত্রে, কেননা তাদের মানবিক অস্তিত্বকেই স্বীকার করা হতো না। এ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে একটি বিচ্ছিন্নতা সেখানে অন্য জাতের মধ্যেও যে মেহনতী শোষিত মানুষ রয়েছে এবং তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েই সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে হবে—এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতো না। নীচুবর্গের জাতগুলির মধ্যেকার কায়েমী ও সুবিধেবাদী স্বার্থ তাদের অনুগামীদের সাধারণ সংগ্রাম থেকে সরিয়ে রাখতে চাইতো, যাতে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা যায়। অবশ্যই এর পরিবর্তন ঘটাতে হবে, এবং জাত-পাতগত নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পতাকাকে অবনত না করেই সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে যাতে গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির সাধারণ সংগ্রামের সঙ্গে তাকে যুক্ত করা যায়।

কেননা একথা উপলব্ধি করা খুবই জরুরী যে, বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক

ব্যবস্থার ভিত্তিতে রয়েছে এমন একটি সম্পত্তি-সম্পর্ক, যা জাত-পাতগত ও শ্রেণীগত দু' ধরণের শোষণ ও নির্যাতনকেই বজায় রাখছে। অর্থনীতিতে জমিদার ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের প্রাধান্য এবং বুর্জোয়া-জমিদার শাসন বজায় রেখেই অস্পৃশ্যতা বা জাত-পাতগত বিভেদের অবসান ঘটানো যাবে—এই চিন্তা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। বর্তমান বুর্জোয়া জমিদার শাসনের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতির সমস্যার সঙ্গে জাত-পাতের সমস্যা অনিবার্যভাবেই সংযুক্ত হয়ে রয়েছে।

নির্দেশিকা ঃ

১। কার্ল মার্কস : 'ভারতে বৃটিশ শাসন' / নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন, জুন, ১৮৮৩

২। আর পাম দত্ত ঃ 'ইণ্ডিয়া টুডে' / মনীষা, কলকাতা, ১৯৭০, পৃঃ ৩২৭

৩। এম কে গান্ধী : 'ইয়ং ইণ্ডিয়া', / অক্টোবর, ১৯২১

৪। 'উপনিবেশ সংক্রান্ত থিসিস' ঃ কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেস / ১৯২৮

৫। সি পি আই (এম) : 'জাতীয় সংহতি প্রসঙ্গে স্মারকলিপি' / ১৯৬৮

৬। এম কে গান্ধী : 'দি ষ্টোরি অফ্ মাই এক্সপেরিমেণ্টস উইথ ট্রুথ'

৭। বি আর আম্বেদকার ঃ 'সারা ভারত নির্যাতিত শ্রেণীসমূহের কংগ্রেসে বক্তৃতা' / ১৯৩০

৮। দ্রষ্টব্য ঃ গেল ওমভেট ঃ 'কালচারাল রিভোল্ট ইন এ কলোনিয়াল সোসাইটি : দি নন-ব্রাহ্মিণ মুভমেণ্ট ইন ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া' / বোম্বাই, ১৯৭৬

৯। এন রাম ঃ 'প্রি-হিস্টরি অ্যাণ্ড হিস্টরি অফ ডি এম কে', সোস্যাল সাইণ্টিষ্ট, ডিসেম্বর, ১৯৭৭

১০। গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ঃ 'ড্রাফ্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যান', ১৯৭৮-৮৩, পৃঃ ১১

১১। ঐ / পৃঃ ২-৩

---

* মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ ঃ দীপঙ্কর চক্রবর্তী

বর্ণাশ্রমী মানসিকতা বনাম শ্রেণীচেতনা

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে Megasthenes ভারতীয় সমাজ সংগঠনের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন : বিশেষ বিশেষ বৃত্তি অনুযায়ী ভারতীয় জনগণ ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত, এই জাতিবিভাগ, অনড় এবং অনমনীয়, পিতামাতার বৃত্তি ও জাতি নির্ধারিত ; মানুষ মাত্রই জন্মনির্ধারিত জাতি-গণ্ডীর মধ্যে থাকতে বাধ্য ; যে জাতিতে জন্ম, সেই জাতির মধ্যেই বিবাহ অবধারিত। দু'হাজার তিনশো বছরের মধ্যে গ্রামীণ উৎপাদন-বণ্টন ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটলেও, রদবদল অনেক কিছু ঘটেছে। কিন্তু সেই অনুপাতে বর্ণাশ্রম মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে কি ? জাতি সংগঠন সম্পর্কে ১৯৬৭ সালেও সুরজিৎ সিংহ মন্তব্য করেছেন—'Social reformers and political leaders in India tend to regard the caste system as major stumbling block to national integratien, economic development and the regeneration of the nation'। ১৯৭০ সালে সমাজতাত্ত্বিক Mandelbaum লিখছেন : কোনো পল্লীবাসী ভারতীয়কে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে তিনি কে, তাহলে তিনি শুধু নামটি জানিয়েই চুপ করে থাকবেন না, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জাতি ও গ্রামের পরিচয় দেবেন। একথা সবারই জানা যে বর্ণাশ্রমভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতি অনেকদিন হল ভেঙে পড়েছে, পৈত্রিক পেশা বা বৃত্তি অবলম্বনে অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হচ্ছে না ; তবুও বর্ণাশ্রমী মানসিকতা থেকে দেশবাসী মুক্ত হতে পারেননি। কথা উঠবে, নগরবাসী শিক্ষিত মানুষ ও কলকারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের মধ্যে কি জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রমী মানসিকতার অবসান ঘটেনি ? সুরজিৎ সিংহের ওপরে উদ্ধৃত মন্তব্য ও অন্যান্য নামী নৃতাত্ত্বিক-সমাজতাত্ত্বিকদের 'স্যাম্পল সারভে'র (Sample Survey) ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিবেদন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পুরণো ঐতিহ্যপ্রীতি—বর্ণাশ্রমী মানসিকতা, জন্মান্তর ও কর্মফলে বিশ্বাস, অদৃষ্টবাদের প্রভাব ইত্যাদি, শিক্ষিত নাগরিক, শিল্পনগরীর শ্রমিক ও যন্ত্রকুশলীদের মধ্যে এখনও স্পষ্টভাবেই বিদ্যামান। কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে শিল্পনগরীতে মেসিন চালাচ্ছেন যেসব শ্রমিক, তাঁরাও জাতিভেদবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত। যতদূর মনে হয় রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-এর একটি প্রতিবেদনে এই ধরনের বক্তব্য আছে।

জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রম প্রথার বুনিয়াদ উৎপাদন বন্টন ব্যবস্থা বর্তমান না থাকা সত্বেও আঁধসোধ এখনও অটুট আছে। এ-নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে খ্রীষ্টপূর্ব যুগে বুদ্ধ, মহাবীর ; মধ্যযুগে চৈতন্য, কবির, উনিশ শতকের 'ইয়ং বেঙ্গল' ও আরো অনেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আন্দোলন করেছেন। এইসব বর্ণাশ্রমবিরোধী আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। বর্তমান শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে

মার্কসবাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে · 'সমাজতন্ত্র' ও 'কমিউনিজম'-এর ধারণা প্রসারলাভ করেছে। স্বাধীনতার পর প্রযুক্তিবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সম্প্রসারণ ঘটেছে, আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত কল-কারখানার সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সেই অনুপাতে শ্রেণীচেতনার বিকাশ ঘটেছে কি? আমার পরিচিত মার্কসবাদীদের অনেকেই বলেন যে, শ্রেণীচেতনা নিঃসন্দেহে বিকাশলাভ করছে। বর্ণাশ্রমী মানসিকতা গ্রামীণ সমাজে বিদ্যমান, একথা মেনে নিলেও চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। আরো দ্রুত শিল্পায়ন ও সাক্ষরতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। ভিত্তিহীন অধিসৌধ বেশিদিন টিঁকে থাকতে পারে না। হরিজন ও অহিন্দু উপজাতীয় মানুষের ওপর নিগ্রহ নির্যাতন আগের তুলনায় বেড়েছে স্বীকার করে তাঁরা বলেন যে, এই নিগ্রহ-নির্যাতন আসলে অর্থনীতি-কেন্দ্রিক—শ্রেণীসংঘর্ষের অভিব্যক্তি। ক্ষেতচাষী ও ভাগচাষীর মধ্যে হরিজন ছাড়া আরো অনেকে আছেন, তাঁদের ওপর বর্বর নির্যাতনের সংবাদ আমরা অনেক কম শুনতে পাই কেন?—এই প্রশ্নের জবাবে মার্কসবাদী বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা বয়সে তরুণ এবং আশু বিপ্লবে বিশ্বাসী, তাঁরা বলেন যে, বুর্জোয়া সংবাদ-সংস্থা তাদের স্বার্থে সংবাদকে বিকৃত করে, গোপন করে।

শুধু বুর্জোয়া সংবাদ সংস্থার খবরের ওপর নির্ভর করে আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি না। সদ্য প্রকাশিত তপশিলী জাতি ও ট্রাইব কমিশনের একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে যে, গত দশ বছরে এইসব নিম্নবর্ণের মানুষদের অবস্থা আগের তুলনায় অনেক বেশি শোচনীয় হয়েছে। সাপ্তাহিক নিউ এজ (New Age Oct. 21. 1979) থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি: "The report has revealed the shocking fact that in 10 years the number of landless among the scheduled castes has increased from 345 to 580 (50%) per thousand and from 197 to 330 (67·8 percent) per thousand among the scheduled tribes. During the same period the number of cultivators among these sections declined from 378 to 279 and from 681 to 576 per thousand respectively."

সংবিধানে এদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিশেষ রক্ষাকবচ থাকা সত্ত্বেও এদের অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটছে কেন? এই ক্রমাবনতি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে গ্রামীণ কৃষকদের সকলেরই পক্ষে সমান হারে ঘটছে কি-না আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কমিশনের রিপোর্টের বয়ান দেখে মনে হয়েছে নিম্নবর্ণের মানুষই বেশি পরিমাণে জমি হারিয়েছে, জীবিকার্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ঐ সাপ্তাহিকে একটু পরেই লেখা হয়েছে: And yet the poor and marginal farmers belonging to the scheduled castes have lost their lands to the rich in larger numbers. There are laws in each state against alienation of

tribal land. And yet there has been 68% increase in the number of landless among them. ত্রিপুরা রাজ্যে আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষার আইনকে কার্যকর করতে গিয়ে শোনা যাচ্ছে, ওখানকার বামপার্টি অনেক উচ্চবর্ণের মানুষের সমর্থন হারিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে শ্রেণীচেতনা ও বর্ণাশ্রমী মানসিকতার বিরোধে বর্ণাশ্রমী মনোভাবই জয়লাভ করে। সমস্যা যেখানে মূলত আর্থনীতিক, সেখানেও বর্ণাশ্রম-মানসিকতার প্রভাবকে অগ্রাহ্য করে সমস্যার বিশ্লেষণ ও সমাধান সম্ভব নয় বলে আমি মনে করি। আদিবাসী ও নিম্নবর্ণের মানুষের ওপর অত্যাচার বেশি হবার কারণ এই যে, উচ্চবর্ণের মানুষ জানে, শাসক গোষ্ঠীর আইন-শৃংখলা বজায় রাখার ভার যাঁদের ওপর ন্যস্ত, তাঁদের বেশিরভাগই নিজেদের ভাই-ব্রাদার এবং বর্ণাশ্রমী মনোবৃত্তির অংশীদার। আমার ধারণার সমর্থনে আর একটি বামপন্থী পত্রিকা থেকে কিছু তথ্য পরিবেশন করছি। "The high caste communal and antisecular influence of R.S.S. Janasangh within the Janata Party gave caste Hindus the feeling of being able to gate away even with murder in so far as the Dalits and the tribals were the victims". (Marxist Review ; Vol XIII, No 3, p. 123)। লেখক জনতা সরকারের সংগঠিত সাম্প্রদায়িক-ভাবাপন্ন উচ্চবর্ণ-হিন্দু পার্টির বিশেষ প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। আমি কিন্তু মনে করি, সাম্প্রদায়িক সংগঠন নিমিত্ত মাত্র। পুলিশ, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, উকিল, ব্যারিস্টার—শতকরা ৮০ জনই নিম্নবর্ণ ও আদিবাসী মানুষকে ঠিক মানুষ বলে গণ্য করেন না ; তাদের বেদনা অনুভূতি, উচ্চবর্ণের মানুষকে স্পর্শ করে না। রাষ্ট্র ও সমাজের পরিচালক, নায়ক, উপনায়করা ওইসব মানুষজনকে পূর্ব-জন্মের কর্মফলে অধঃপতিত ও বর্বরদের মতো নীতিহীন বিবেকহীন বলে বিবেচনা করেন। এই অধমদের থেকে এঁরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তাই খরা, দুর্ভিক্ষ বা মহামারীর হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য দেবীপূজায় ছাগ মহিষের মতো এদেরও মাঝে মাঝে উৎসর্গ করা হয়। হরিজন ও আদিবাসী নিধন-নির্যাতন গত দু-বছরে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে নিঃসন্দেহে। একটি পত্রিকায়, এই হিসেবে বলা হয়েছে যে ১৯৬৬-৭৬—এই দশ বছরে নির্যাতনের সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজারের মতো, তারপরের দেড় বছরের সংখ্যা উনিশ হাজারে ছাড়িয়ে গেছে ('India Today', Oct 15, 1978)। এই নির্যাতন বৃদ্ধির একটি কারণ নির্যাতিতের এক অংশের মধ্যে জঙ্গী মনোভাবের উন্মেষ।

চুক্তিবদ্ধ দাস ও ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন ও বেগার খাটতে অস্বীকার করা থেকে বহু দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়েছে জানি। কিন্তু আদিবাসী ও হরিজনদের বিরুদ্ধে উচ্চবর্ণের মালিক-মহাজন যতখানি হিংস্র ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়েছেন উচ্চবর্ণের বা মধ্যবর্ণের আন্দোলন দমনে ততখানি হয়েছেন বলে আমার মনে হয় না। উপরন্তু বর্ণ-বিদ্বেষকে কাজে লাগিয়ে, সর্বহারাদের এক গোষ্ঠীকে অন্য

গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে তাঁরা লাভবান হচ্ছেন। শ্রেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে খুব কম ক্ষেত্রেই উচ্চবর্ণের, মধ্যবর্ণের-মানুষেরা হরিজন-আদিবাসী ক্ষেতমজুরদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন। এদিকে মার্কসবাদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একজন লিখেছেন : "It is no longer possible to ignore and neglect the existence of caste as a social reality. While largely the left in India was traditionally taking a class reductionist view—assuming that the relevance of caste will automatically be weakened in the class struggle, it has become visible by now that caste is being consciously now used by reactionary forces in order to destroy and prevent class organisations. Caste as a social force therefore must be much more consciously tackled in the political and economic struggle." (Marxist Review, Vol. XIII, no 3 P 124).

আমি মনে করি 'কাস্ট' (Caste)-কে শুধু 'সোশ্যাল ফোর্স' হিসেবে গণ্য করলেই চলবে না। 'কাস্ট'-এর মনস্তাত্ত্বিক শক্তিকেও স্বীকার করতে হবে, 'কাস্টিজম' (casteism)-এর মানসিকতার বিশ্লেষণ ও 'কাস্টপ্রেজুডিস' পরিবর্তনের জন্য বস্তুবাদ-ভিত্তিক মনোবিদ্যার অনুশীলন ও আলোচনা করার প্রয়োজনকে স্বীকার করে নিতে হবে।

তাছাড়া ঘটনাস্থলে গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করলে কিন্তু দেখা যাবে যে জমি-দখলের লড়াই ও মালিক-ক্ষেতমজুর বিরোধের ঘটনা ছাড়াও অনেক অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ ব্যাপারকে উপলক্ষ করে হরিজনদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়, তাদের মেয়েদের ওপর বলাৎকার করা হয় এবং আরো নানাভাবে তাদের ওপর অত্যাচার চালানো হয়। এইসব তুচ্ছ ব্যাপারের সঙ্গে জমি বা অর্থের যোগাযোগ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে থাকে না ; থাকলেও সে সংযোগ খুবই ক্ষীণ ও পরোক্ষ। উচ্চবর্ণের মর্যাদাবোধ আহত হলে জাত্যাভিমানে আঘাত লাগলে উঁচু-জাতের মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে নিচু-জাতের মানুষের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে থাকেন। এই অত্যাচারের নৈতিক ও সামাজিক সমর্থন সহজেই পাওয়া যায়। যাঁরা অত্যাচার করেন, তাঁদের মনে বিবেকের দংশন অনুভূত হয় না, কোনোরকম অপরাধ বা পাপবোধে তাঁরা পীড়িত হন না। রামায়ণ-মহাভারতের অনেক কাহিনী ও অবতারদের জীবনী তাদের প্রেরণা জোগায়। বর্ণাশ্রমী মনোবৃত্তিকে জীইয়ে রাখার মূলে আছে আমাদের পুরনো ঐতিহ্য ও বেদ-পুরাণের প্রতি অন্ধ ভক্তি, অবতারদের কার্যকলাপের প্রতি যুক্তিহীন শ্রদ্ধা। জতুগৃহে পরিত্যক্ত নিষাদমাতা ও তার পাঁচ ছেলের জীবনের বিনিময়ে পাণ্ডবভ্রাতাদের আত্মরক্ষা নিয়ে আমরা এতটুকু লজ্জিত বোধ করি না। নিরস্ত্র শম্বুককে হত্যা করে, আড়াল থেকে 'বালী'কে বাণবিদ্ধ করেও রাম সর্বজনপূজ্য। কেননা শম্বুক শবর বা নিষাদ, আর

'বালী' দক্ষিণ ভারতের আদিম অধিবাসীদের কোনো ছোটোখাটো রাজা—তারা কেউই আর্য নয়। নিষাদপুত্রের হত্যার জন্য যুধিষ্ঠির কোনোদিন অনুতপ্ত হয়েছিলেন কি? শম্বুক বা বালী বধের জন্য রামের মনে কোনো দ্বন্দ্ব বা অন্যায়বোধের সঞ্চার হয়েছিল বলে জানা নেই।

পৌরাণিক মহাপুরুষ ও অবতারদের আদর্শ বলে গণ্য করাই স্বাভাবিক। জন্মসূত্রে উচ্চবর্ণের মানুষ যে সামাজিক মর্যাদার অধিকারী, সেই অধিকার রক্ষার জন্য স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করবেই। বর্ণাশ্রম জন্মান্তরবাদ ও ও কর্মফল তত্ত্বের দ্বারা সমর্থিত। ভারতীয়দের মনের গভীরে যুগ যুগ ধরে কর্মফল তত্ত্বে বিশ্বাস বিরাজমান। সনাতনী ঐতিহ্যিক ধ্যানধারণার মধ্যে বর্ণাশ্রমী ধ্যান-ধারণাই সবচেয়ে দৃঢ়মূল। সামাজিক সংগঠনে যাঁদের স্থান একেবারে নীচের তলায় সেই অন্ত্যজ শূদ্রের মধ্যেও বর্ণাশ্রমী তত্ত্বের শিকড় গভীরে প্রোথিত। তাই সেকালের বুদ্ধ, মহাবীর ইত্যাদির এবং মধ্যযুগের চৈতন্য প্রমুখ ধর্মনায়কদের বাণী এবং একালের শ্রেণীসংগ্রামের প্রবক্তাদের প্রচার, ভারতীয় জনমানসে বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। বর্ণাশ্রমের কল্যাণে যারা সামাজিক সুখ-সুবিধা ও বিশেষ সম্মানের অধিকারী তারা বর্ণাশ্রমী ব্যবস্থা সংরক্ষণের জন্য সবরকম চেষ্টা করবে—এর মধ্যে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু অবাক লাগে তখন, যখন আমরা দেখি এই ব্যবস্থায় যারা সর্ববিধ সুখসুবিধা থেকে বঞ্চিত ও নিপীড়িত, তারাও এই প্রথাকে কোনোদিন একেবারে ভেঙে ফেলতে চায়নি। পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটার পর তাদের মধ্যে জাতিবিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার প্রবণতা দেখা গেছে, কিন্তু সেই আন্দোলন সিঁড়ির নিচুর ধাপ থেকে উঁচু ধাপে উত্তরণ প্রচেষ্টার মধ্যেই নিবদ্ধ থেকেছে। চতুর্বর্ণের মধ্যে বহু শাখা-প্রশাখা, বহু অন্তর্বিভাগ বিদ্যমান। গত শতকের শেষ থেকে এ-পর্যন্ত যা কিছু জাতি-কেন্দ্রিক আন্দোলন হয়েছে, সবই প্রধানত নিজেদের মধ্যে প্রাধান্যসংক্রান্ত আন্দোলন। বর্ণাশ্রম বিলুপ্তির জন্য খুব কমই হয়েছে। নিচু-জাতের মধ্যে আম্বেদকরের নেতৃত্বে শেষের দিকে বর্ণাশ্রম বিরোধী আন্দোলনের ফলে অনেকে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাতে অধিসৌধে বড়ো দরের কোনো ফাটল ধরেনি।

শিল্পায়ন এবং বৃহৎ নগরীর সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও গ্রামীণ সমাজে বর্ণাশ্রমী মানসিকতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অটুট আছে। আমার এই বক্তব্যের সমর্থন পেয়েছি Allan Beals লিখিত একটি প্রতিবেদনে (Gopalpur, New York, 1962)। গোপালপুর, এলিফাণ্ট ও নামহালী—মহীশূরের এই তিনটি গ্রামের অবস্থা পর্যবেক্ষণের ফলাফল এই প্রতিবেদনে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম দু-টি গ্রাম শহর থেকে বিচ্ছিন্ন; তৃতীয়টি বাঙ্গালোরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত; সেখানকার বেশিরভাগ কর্মক্ষম ব্যক্তিই বাঙ্গালোরের কলকারখানায় কাজ করে এবং ঐতিহ্যিক মানসিকতার দিক থেকে এই তিন গ্রামের মানুষের মধ্যে কোনো

বিশেষ পার্থক্য নেই। "They all recognize the significance of Jati, they all believe that it is sinful to disobey one's elder brother, and they all hope to marry their sister's daughter, (P 92-96)। লখনউ থেকে মাত্র আট মাইল দূরে অবস্থিত 'মোহানা' গ্রাম সম্পর্কে আর একজন পর্যবেক্ষকও ওই একই ধারণা পোষণ করেন। (Majumder, D. N.: Caste and Communication in an Indian Village, 1958, Asia Publishing House, Bombay)। ব্যবসা-বাণিজ্য কর্মসূত্রে মোহানা লখনউ এর সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু মোহানার সমাজ জীবনে নগর-সভ্যতার বিশেষ কোনো ছাপ সেই সময় পর্যবেক্ষক দেখেননি। মোহানার সমাজ সংগঠন নগর থেকে বহুদূরে অবস্থিত ও সম্পর্করহিত অন্য যে-কোনো গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে তুলনীয়। মোহানার মানুষ শহরের ওপর জীবিকার জন্য নির্ভরশীল হয়েও মনে করে, তাদের সমাজ, নগর-সমাজের মতো দূষিত নয়। "They may seek help from those who have special knowledge of the town and may admire them for their experience but must regard the village as distinct and socially distant from the town" (Majumdar, 1958, p 329)। উন্নত ও আধুনিক সেচ ব্যবস্থা গ্রামীণ সমাজ, গ্রামীণ মানসিকতাকে আশানুরূপভাবে পরিবর্তিত করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। অবশ্য আর্থিক উন্নয়নের জন্য, আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে অনেক ঐতিহ্যিক সংস্কার ভারতীয় জনগণ আজ পরিত্যাগ করেছে—একথা ঠিকই; বর্ণাশ্রম মানসিকতায় বাইরের দিক থেকে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু সে-পরিবর্তন খুবই সামান্য: skin deep বলা চলে। একটু সামান্য ঘসা লাগলেই বাইরের পালিশ খসে পড়ে এবং জাতি মানসিকতার সংস্কারাবিষ্ট অবস্থা দৃষ্টিগোচরে আসে।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে রক্ষাকবচ, চাকুরী ও লোকসভা-রাজ্যসভায় আসন সংরক্ষণের ফলে বর্ণাশ্রমী মানসিকতা পরিবর্তনের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে। রাষ্ট্রের কর্ণধার যাঁরা, তাঁরা কোনো মতে আপোষ করে সংহতি ও ঐক্য রক্ষা এবং নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখার প্রয়াস করেছেন। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজের আমূল পরিবর্তনের পরিকল্পনা রাজনীতির কর্ণধারদের কাছে কোনো সময়েই গুরুত্বলাভ করেনি। পরাধীনতার যুগে সমাজের আধিপত্য যাঁদের হাতে ছিল, স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রের আধিপত্যও মোটামুটি তাদের হাতেই রয়ে গেছে। এখানে তামিলনাড়ুর প্রসঙ্গ তুলে অনেকে এই বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করতে চাইতে পারেন। কিন্তু সত্যিই কি ডি. এম. কে.-এ. ডি. এম কে-র নির্বাচনে সাফল্য সাংস্কৃতিক বিপ্লব বা বর্ণাশ্রমী মনোবৃত্তির রূপান্তরের নিদর্শন? আমি সে-রকম মনে করি না। এদের সাফল্যের মূলে ব্রাহ্মণবিরোধী মনোবৃত্তি নিশ্চয়ই কিছুটা কাজ করেছে, কিন্তু তার থেকে বেশি কাজ করেছে ক্ষমতাদখলের রাজনীতি। এই আঞ্চলিক পার্টির ক্ষমতালাভের মূলে আছে কেন্দ্রে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের একাধিপত্য ও হিন্দী ভাষাকে জোর করে প্রাধান্য দেবার

চেষ্টা। এই অব্রাহ্মণ আঞ্চলিক পার্টি'র সরকারের আমলে অচ্ছুৎ ও হরিজন নিগ্রহ অনেক ঘটেছে। এ'রা শিক্ষিত ও সম্পত্তিশালী, 'কাস্ট-হায়ারার্কি''তে এ'দের স্থান ছিল ব্রাহ্মণদের এক ধাপ নিচুতে। এ'রাই এখন ব্রাহ্মণের স্থলাভিষিক্ত হয়ে বর্ণাশ্রমকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এ'দের ক্ষমতালাভের সঙ্গে সাধারণ মানুষের মধ্যে শ্রেণীচেতনার বিকাশের কোনো সম্পর্ক নেই। বামপন্থী প্রগতিশীল পার্টি'র শক্তি উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মতো এখানেও নগণ্য। গত ১৫।২০ বছরে এই রাজ্যে শিল্পায়ন কৃষিতে পুঁজি বিনিয়োগ ইত্যাদি আধুনিকীকরণ অনেক ঘটেছে, কিন্তু সনাতনী ঐতিহ্যের . প্রভাব বিশেষ হ্রাস পায়নি। উত্তর ভারতের মতো আড়ম্বরে 'রামলীলা' অনুষ্ঠিত হয় না বটে, কিন্তু তার পরিবর্তে হয়তো রাবণের জয়গান করে এ'রা ঐতিহ্য-আসক্তি প্রকাশ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে মার্কসবাদীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির কথা সকলেরই জানা। এই দু'টি রাজ্যে বিভিন্ন নামে কয়েকটি মার্কসবাদী পার্টি অনেক দিন ধরে বামপন্থী আন্দোলন চালাচ্ছেন। কেরলের প্রথম কমিউনিস্ট সরকার ভাঙতে ইন্দিরা গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেস জাতি-বিদ্বেষ ও বর্ণাশ্রমী মানসিকতার সাহায্য নিয়েছিলেন। শ্রেণীচেতনা সে-সময় বিকাশলাভ করে থাকলে ওইভাবে কমিউনিস্ট সরকারের পতন ঘটানো যেত না। ষাটের দশকের শেষ দিক থেকে বুর্জোয়া বৃহত্তম পার্টি কংগ্রেসে ভাঙন ধরে। সর্বজনমান্য নেতার অভাব, ভাষাভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও ঔপজাতিক সাম্প্রদায়িকতার প্রসারবৃদ্ধি, অন্তর্দ্বন্দ্ব, ক্ষমতা ও একচ্ছত্র পুঁজির পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে প্রতিযোগিতা, জনসাধারণের অসন্তোষ (চেতনা বৃদ্ধি নয়)—সব মিলে কংগ্রেসের সাজানো ঘর ভেঙে পড়তে থাকে। রাজ্যে কয়েকটি অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হয়। সেই সময়ে এই দুই রাজ্য যুক্তফ্রন্টের শাসনাধীনে আসে। বামপন্থীদের মধ্যে মতভেদ ও সংঘর্ষের ফলে পশ্চিমবঙ্গে সরকারের বিপর্যয় ঘটে। এই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি'র নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারিয়ে বেশ কিছু সংখ্যক তরুণ প্রতিযোগী-নেতৃত্বে আশু বিপ্লব সংগঠনে প্রবৃত্ত হন। এ'রা শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে গ্রামের ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। জাতি-শত্রু সম্বন্ধে এ'দের কিন্তু সোচ্চার হতে শোনা যায়নি। পুরনো বামপন্থীদের মতোই এ'দের ধারণা ছিল যে জাতিমন্যতা বা বর্ণাশ্রমী মানসিকতা প্রযুক্তিবিপ্লব ও শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে পরিবর্তিত হবে। প্রযুক্তিবিপ্লব ও শ্রেণীসংগ্রামের বিরোধী শক্তি জোতদার-জমিদার-মালিক-মহাজন—এ-বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে একমত হয়েও বলা চলে যে, শ্রেণীচেতনা ও বিপ্লব-মানসিকতা উন্মেষের জন্য দাস ও সামন্তযুগের অধিসৌধ ভাঙার যে চেষ্টা করতে হয়—এই বামপন্থী পার্টি'রা কেউই তা করেননি, করার যৌক্তিকতা আছে বলেও বিবেচনা করেননি। অর্থনৈতিক বৈষম্যের ওপর যতটা গুরুত্ব দিয়েছেন তার এক ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশও জাতিভেদের ওপর দেওয়া হয়নি। বিপ্লবীরা সাম্প্রদায়িক ও জাতিবিদ্বেষ দূর করা, সনাতনী ঐতিহ্যের মোহমুক্তি ঘটানো—ইত্যাদি ব্যাপারকে

সংস্কার-মূলক কাজ মনে করে বরং পরিহারই করেছেন। পূর্বশর্তগুলোকে অগ্রাহ্য করার ফলে জনসাধারণের মেজাজ মাঝে মাঝে বদলেছে কিন্তু প্রগতিপন্থী ভাবধারা বা চেতনার উন্মেষ খুব কম ক্ষেত্রেই ঘটেছে। শ্রেণীচেতনা জাতি-মানসিকতাকে অবলুপ্ত করতে পারেনি। পূর্বজন্মের কর্মফলে বিশ্বাসী ও নিয়তিবাদী ভারতীয় জনগণের মনে বিজ্ঞানানুগ চিন্তাধারার প্রভাব খুবই সামান্য। প্রযুক্তিবিদ্যার যথাযথ প্রয়োগ দ্বারা শিল্পবিপ্লব বা কৃষিবিপ্লব ঘটাবার উপযুক্ত মনোভাব ও উদ্যম নিয়তিবাদী, জন্মান্তরের কর্মফলে বিশ্বাসী মানুষের থাকে না। আধুনিকতার বাহ্যিক প্রকাশ, বাগাড়ম্বর ও প্রগতির বুলি আওড়ানো আগের তুলনায় যতটা বৃদ্ধি পেয়েছে, তার থেকে অনেক বেশি বেড়েছে সনাতনী ঐতিহ্যের জয়গান, দাদাজী-মাতাজী-বাবাজীদের আধিপত্য। অন্তত পঞ্চাশ বছর ধরে আমাদের দেশে মার্কসবাদের চর্চা চলছে, সামন্ততন্ত্রীয় চিন্তাধারা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলা ও লেখা হচ্ছে—কিন্তু বিশেষ কোনো ফললাভ হয়নি। শ্রেণীচেতনা গোষ্ঠী, ধর্ম ও জাতি ভিত্তিক মানসিকতার ওপর খুব বেশী রেখাপাত করতে পেরেছে কি? গত তিন বছরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হরিজন-নির্যাতনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর পড়ে মনে হয় না যে, সামন্তযুগীয় মনোভাবের কোনো বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটেছে। দাঙ্গা ইত্যাদির পেছনে 'ভেস্টেড ইনটারেস্ট', বিদেশী গোয়েন্দা চক্র, সাম্প্রদায়িক সংস্থার উসকানি আছে বা প্রত্যক্ষভাবে তারা এ-সবের জন্য দায়ী—এই কথা বারবার আমরা নেতাদের মুখে শুনি। তাঁরা ভুলে যান যে জনসাধারণের মানসিকতায় সংস্কার বদ্ধমূল আছে এবং কায়েমী স্বার্থ বা স্থিতাবস্থা বজায়কারীরা শুধু সুযোগ নিয়েছেন।

বর্ণাশ্রমী মানসিকতায় যেমন উচ্চজাতির জন্মগত প্রাধান্য স্বীকৃত, তেমনি স্বীকৃত সমাজে পুরুষ ও পিতৃপ্রাধান্য। বুর্জোয়া-সামন্ত পার্টি এবং চাষি-মজুরের পার্টির নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের জাতি ও বয়সের হিসেব নিলে দেখা যাবে যে, এদের শতকরা অন্তত ৭৫ জন উচ্চজাতির পুরুষ এবং বয়সে পঞ্চাশোর্ধ্ব। নয়াবামদের 'এসটাবলিশ-মেণ্ট' ও 'হায়ারার্কি' বিরোধী আন্দোলন সত্তরের দশকের প্রথম দিক থেকেই স্তিমিত হয়ে গেছে। প্রগতিবাদী বামপন্থীদের মধ্যে, মার্কসবাদে বিশ্বাসী পার্টি-সভ্য ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে জাতিদম্ভ না থাকলেও জাতিবিচার বিদ্যমান, ধর্মীয় গোঁড়ামী না থাকলেও ধর্মীয় সংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠানে এরা আস্থাশীল। তাবিচ-মাদুলি-ধারী আধুনিক, মহালয়ায় তর্পণ করা ও ঈদের দিনে নমাজপড়া মার্কসবাদীর সংখ্যা নগণ্য নয়। 'রেনেশাস', 'রিফর্মেশন'-এর মতো জোরদার আন্দোলন আমাদের দেশে এ পর্যন্ত হয়নি। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে বা শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হলে সনাতনী ঐতিহ্য আপনা থেকে বিলুপ্ত হবে—এই তত্ত্বে আমার বিশ্বাস নেই। আমার ধারণা বর্ণাশ্রমী মানসিকতার প্রভাব দৃঢ়মূল, এই প্রভাব দূর করতে হলে প্রগতিবাদীদের সুসংগঠিত আন্দোলন দরকার। শ্রেণীচেতনা বৃদ্ধি এবং জাতিবিদ্বেষ

ও জাতিদম্ভ দূরীকরণের আন্দোলন একসঙ্গে চালাতে হবে। তা না হলে, শ্রেণীচেতনা জাগানো যাবে না, এমনকি, সর্বাত্মক শিল্পায়ন ও কৃষিবিপ্লব সম্ভব হবে না।

বর্ণাশ্রমের জাতিবিভাগ প্রথা বহিরাগত ধর্মে দীক্ষিতদের মধ্যেও দেখা যায়। ধর্মান্তরিত হবার পরও বর্ণাশ্রমী মানসিকতা ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে রয়ে গেছে। একমাত্র পার্শী ছাড়া আর সব ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বর্ণাশ্রমের প্রভাব পড়েছে। একজন সমাজতাত্ত্বিক লিখেছেন: "Converts lacked any new social base to go with their new social scripture and had little alternative but to continue in the pervasive caste system. They became Jatified (linguistic structure too can assimilate foreign elements) and re-entered the typical struggle for social mobility (Mandelbaum : Society in India, 1970, pg 545)। মুসলমানরা 'খানদানী আদমিদের' শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই মেনে নিয়েছেন, তবে হিন্দুদের জাতিভেদের মতো এদের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-জাতীয় দৃঢ় বিভাগ নিই! অচ্ছুৎ কিন্তু এদের মধ্যেও আছে। উত্তর প্রদেশে মুসলমানরা উচ্চশ্রেণীর আশরাফ ও নিম্নশ্রেণীর আতরাফ—দুই প্রধান ভাগে (জাতি বলা চলে) বিভক্ত। আশরাফদের মধ্যে আবার আছে সৈয়দ, শেখ, মুঘল, পাঠান। ইহুদীদের মধ্যেও জাতিভেদ প্রথা আছে। খৃীষ্টানদের মধ্যেও উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের প্রভেদ, বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে মেনে চলা হয়। খৃীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েও মুখার্জি ও নমোদাসদের বর্ণপার্থক্য লোপ পায় না। বর্ণাশ্রমের বা জাতিভেদের প্রতিপত্তি ও প্রভাব ধর্মান্তরিত হয়েও লোপ পায়নি। বর্ণাশ্রমী মানসিকতা আমাদের মজ্জাগত সংস্কারে পরিণত হয়েছে। পার্টি নেতারা এ-বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক-মনস্তাত্ত্বিকদের ভাবনা-চিন্তা সম্পর্কে অবহিত হলে এবং তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করলে উপকৃত হবেন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী চিন্তাধারা গ্রহণ করতে হলে, মার্কসবাদী তত্ত্বের পরাবর্ত গঠন করতে হলে, পুরনো জাতিবাদাশ্রয়ী সংস্কারের পরাবর্তগুলোকে নির্মমভাবে ভেঙে ফেলা দরকার। পুরনো শিক্ষা না ভুললে, নতুন পাঠ নেওয়া চলে না। আর এই সংস্কার ভাঙা, শিক্ষা ভোলা ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। 'It is more difficult to unlearn than to learn।'

এসব নিয়ে আমি এবং আমাদের ইনস্টিটিউটের বন্ধুরা অনেক দিন থেকে চিন্তা করছি। ১৯৬৪-৬৫ সালে প্রয়াত নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজসেবী নির্মলকুমার বসুর সভাপতিত্বে সাম্প্রদায়িকতা, জাতি-উপজাতি সমস্যা নিয়ে দু'দিন ব্যাপী একটি আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বর্ণাশ্রমী সাম্প্রদায়িকতার সমাজতাত্ত্বিক-মনস্তাত্ত্বিক দিকের ওপর আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছিল। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণের উপযোগিতা সেই সময় থেকেই বিশেষভাবে অনুভূত হয়। এরপর আরো কয়েকটি আলোচনা-চক্রে সমাজকর্মীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে আমাদের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আরো

বিস্তারিত করার সুযোগ ঘটে। সমভাবাপন্ন কয়েকটি সংস্থার আলোচনা ও বিতর্ক-সভায় অংশগ্রহণের ফলে ক্রমশ উপলব্ধি করতে থাকি যে মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা অনেক ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক দিকটিকে 'সাবজেকটিভ' জ্ঞানে আলোচনার ও বিবেচনার বাইরে রাখার জন্য বোধ হয়, সমস্যাটির মর্মমূলে পেঁছাতে পারেননি। জাতিসংঘর্ষ ও ধর্ম-বিদ্বেষকে যান্ত্রিকভাবে কেবলমাত্র আর্থ-রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে গণ্য করার জন্য মূল সমস্যার সমাধানে কোনোদিন অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যাবে না। সমাধান সহজ এবং আমরা একটা মনস্তাত্ত্বিক-সমাজতাত্ত্বিক ফরমূলা আবিষ্কার করে ফেলেছি —তা যেন কেউ মনে না করেন। মনে হয়, ঠিক পথে, যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করে আর্থ-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় ঘটিয়ে বিচার করলে—এই জটিল এবং আমার মতে আমাদের দেশের সবচেয়ে গুরুতর সমস্যার সমাধানের সূত্র আবিষ্কার করা অসম্ভব নয় বলে মনে করি। মনে রাখা দরকার, আমাদের বর্ণাশ্রম-জাতীয় সমস্যা অন্য কোনো দেশে নেই ঃ এই প্রথার জন্য আমরা একই সঙ্গে গর্বিত ও লজ্জিত মনে করতে পারি। গর্বিত এইজন্য যে, আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রকার ও সংহতি-রচয়িতারা এমন এক সুদৃঢ় সংগঠন তৈরি করেছিলেন, যার ওপর কালের প্রলেপ ও ভিনদেশী ধর্ম-সংস্কৃতির আক্রমণ এবং অর্থনৈতিক নববিন্যাসের প্রভাব ব্যর্থ হয়েছে ; বরং নতুনেরাই ভারতীয় প্রথায় অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের সংগঠিত করেছেন। আর লজ্জিত এই জন্য যে, এই প্রথার শিকল আমাদের এমনভাবে বেঁধে রেখেছে, এই প্রথার সঙ্গে আনুষঙ্গিক বিধিনিয়ম ও 'রিচুয়ালস'-এর দৌলতে এমন এক বিচিত্র মানসিকতার অধিকারী হয়েছি যে বুদ্ধি ও শক্তি সত্ত্বেও আমরা অগ্রসর হতে পারছি না, নতুন ভাবধারাকে দেশোপযোগী করে নিতে পারছি না। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ, তাঁরা স্বীকার করুন আর নাই করুন—পুরনো ঐতিহ্যের মোহমায়ায় আবিষ্ট, সংবেশিত, তাই নিশ্চেষ্ট, পরিবর্তনে অনীহ ; আর এক ক্ষুদ্র অংশ নিজেদের বন্ধনমুক্তির সার্থক বিজ্ঞানসম্মত উপায় খুঁজে না পেয়ে উত্তেজিত, ক্ষিপ্ত—কালাপাহাড়ী বিদ্বেষে ঐতিহ্যের সামগ্রিক অবলুপ্তির জন্য সচেষ্ট ও আত্মধ্বংসী ক্রিয়াকলাপে আসক্ত। স্বাধীনতার পর এতো বছর কেটে গেছে, জনগণের অবস্থার বিশেষ কোনো উন্নতি ঘটেনি—একথা আমরা প্রত্যহ শুনি ও অন্যকে শোনাই। দায়িত্ব বুর্জোয়া সরকারের ওপর চাপিয়ে বামপন্থীরা বিবেকের হাত থেকে মুক্ত হতে পারেন কি ? পঞ্চাশ বছর ধরে আমরা প্রগতিপন্থীরা জনগণের সাধারণ চেতনা ও শ্রেণীচেতনা কতখানি বৃদ্ধি করতে পেরেছি, তার হিসেব-নিকেশ করলে নিজেদের ব্যর্থতা-অক্ষমতার কারণগুলো সম্পর্কে অন্তত কিছুটা অবহিত হতে পারব। কংগ্রেস সরকারের বিকল্প মার্কসবাদী সরকার—এমনকি বুর্জোয়া সরকারও গড়ে তোলবার মতো কোনো পার্টি তৈরি হয়নি কেন—এর কারণ বিশ্লেষণে শুধু আর্থ-রাজনৈতিক নয় ; সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলোও বিশ্লেষণ করা দরকার। বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারা যাবে যে মার্কসবাদী বলে গর্বিত আমাদের অনেকেরই মনের গভীরে বর্ণাশ্রমী

মানসিকতা বাসা বেঁধে রয়েছে। আমরা আমদানি করা ভাবধারাকে নির্বিচারে গ্রহণ বা পুরোপুরি বর্জন করেছি; ঠিক তেমনিভাবে দেশীয় ঐতিহ্যকে কোনো সময় পুরোপুরি অস্বীকার করেছি, অথবা আগে যা লিখেছি—কালাপাহাড়ী বিদ্বেষে ভেঙে তছনছ করতে চেয়েছি। কোনো কাজটাই কিন্তু পুরোপুরি পারিনি বা করিনি। শেষপর্যন্ত বর্ণাশ্রমী মনোবৃত্তিজাত আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাবে পিতরোপম মৃত ও জীবিত নেতাদের পুজোয় (যেমন করে বুর্জোয়া মধ্যবিত্তরা দাদাজী-বাবাজীদের হাতে নিজেদের অর্পণ করে, প্রায় তেমনি করে) মেতেছি অথবা নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছি।

জাতপাত ও ভারতীয় রাজনীতি

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

উনিশ শতকের শুরুতে কলকাতার নব্য ধনীসম্প্রদায়ভুক্ত বেনিয়ান মুৎসুদ্দি জমিদারেরা যখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের টাকার উপঢৌকন দিয়ে উঁচু জাতে উঠে প'ড়তেন, তখনকার দিনের ধনকুবের রামদুলাল দে অহঙ্কার ক'রে বলেছিলেন—"জাত আমার বাক্সে ?"—অর্থাৎ টাকা দিয়ে জাত কেনা যায়।

টাকা থাকলেও 'জাতে ওঠার' প্রয়োজন ছিল সে যুগে—হিন্দু সমাজের জাতভিত্তিক ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ এতই অনমনীয় ছিল। আজও তা অনড়।

মুসলমান সমাজেও জাতিভেদের অলিখিত নিয়ম আছে। সৈয়দরা নিজেদের মনে করেন উচ্চজাতসম্ভূত। শিয়া-সুন্নি বিভেদ তো পরম্পরাগত। আমাদের পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার নিম্নবর্ণের মানুষেরা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হ'য়ে ইস্‌লাম গ্রহণ করেছিলেন বহুযুগ আগে। তাঁদের বংশধরেরা কিন্তু আজও ভারতীয় ঐশ্লামিক সমাজের তথাকথিত কুলীন মুসলমানদের চোখে অপাঙক্তেয়।

যে শিখ ধর্মের অভিযান জাতি-কুলভেদ অতিক্রম করার দাবি নিয়ে শুরু হ'য়েছিল, তার অনুসরণকারীরা কিন্তু আজও জাতবিচার থেকে মুক্ত হ'তে পারেনি। 'হরিজন' সম্প্রদায় থেকে আগত শিখেরা উচ্চবর্ণের শিখেদের দৃষ্টিতে অচ্ছুৎ না হ'লেও 'মঝাবি' শিখ বলে কিছুটা পৃথকীকৃত।

"খৃষ্টান হ'য়েছি বলে কি জাত দিয়েছি ?"—ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণদের মুখের এ কথাটা তো সবাই শুনেছেন।

তাই মনে হয়, আমাদের ভারতীয় সমাজে জাতিভেদের সমস্যাটা অতীতের হিন্দু সমাজের শিকড়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এবং আজ শুধু হিন্দুদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ নেই। তার ব্যাপক জটাজালের উত্তরাধিকারীরা এদেশের সব ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই বিরাজ ক'রছেন।

অবশ্য, টাকায় কি না হয়—?

কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বংশের পদবি পালটে উচ্চজাতের পদবি গ্রহণ ক'রে শহরের বিশ্বজনীনতার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া যায়। উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হ'য়ে নিজেদের জাতের অনুন্নত পাড়া-পড়শী, আত্মীয়স্বজনদের ত্যাগ করে Scheduled caste elite বা নিম্নবর্ণের অভিজাত শ্রেণীরূপে উদ্ভূত হওয়া যায়। পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীর Labour aristocracy-র মত আমাদের দেশেও নিম্নবর্ণের সমাজে এইধরণের সুবিধাভোগী গোষ্ঠী তৈরী হচ্ছে। আগে এরা নিজেদের সমাজ থেকে বার হ'য়ে গিয়ে চাকুরিক্ষেত্রে উন্নতিলাভ ক'রে 'জাতে ওঠার' চেষ্টা করতেন। আজকাল রাজনীতির চাকরিটা আরও বেশী লাভজনক—অর্থপ্রাপ্তি ও ক্ষমতা-

পদমর্যাদা—সব দিক থেকেই। সুতরাং জাতভিত্তিক রাজনীতি, নিম্নবর্ণসম্ভূত এই নতুন elite-এর উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিশেষ পরিক্রমণ ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জাত বিচারটা যেহেতু কেবলমাত্র হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের দ্বন্দ্বের মধ্যেই আজ সীমাবদ্ধ নয়, 'জাত-পাত' কথাটা ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করতে হচ্ছে। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানের সেই অতীতাশ্রয়ী দ্বন্দ্ব ছাড়াও, যে নিত্য নতুন বিবাদ শিখ-হিন্দু, বাঙালী-গোর্খা, আসামের সমতল অঞ্চল ও পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের সম্পর্ককে ভেঙেচুরে দিচ্ছে—এইসব ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষগুলি, তা ধর্মভিত্তিকই হোক বা ভাষাভিত্তিকই হোক—'জাতপাতের' এক্তিয়ারে প'ড়ছে।

আগে একটা সহজ যুক্তি দেখানো হ'ত—যেহেতু নিম্নবর্ণের মানুষেরা অর্থনৈতিক দিক থেকে শোষিত ও সামাজিক দিক থেকে লাঞ্ছিত, তাই তাঁদের প্রতিবাদের স্পৃহাটা জাতিভিত্তিক সংগঠনের রূপ নেয়। কিন্তু অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক লাঞ্ছনাই এইধরণের জাতি বা গোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিবাদের একমাত্র কারণ না হ'তেও পারে। পাঞ্জাবে খালিস্থানপন্থী শিখদের আন্দোলনের যাঁরা নেতা ও সংগঠক তাঁদের কোন অর্থেই দরিদ্র ও অনুন্নত শ্রেণী বা ভারতীয় সমাজে অবহেলিত ও বঞ্চিত সম্প্রদায় ব'লে পরিগণিত করা যায় না। বরং 'সবুজ বিপ্লবের' কল্যাণে এদেশের অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়ের তুলনায় তাঁরা অর্থ ও সামাজিক প্রতিপত্তির দিক থেকে অনেক ক্ষমতাশালী।

সুতরাং জাতি বা ধর্মভিত্তিক সংগঠন ও আন্দোলন, সংখ্যালঘুদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা বক্ষা করার প্রবণতা বা অর্থনৈতিক বঞ্চনার প্রতিবাদস্বরূপ অনেক সময় আত্মপ্রকাশ করলেও এইগুলিই মূল কারণ ব'লে দাবি করাটা একধরণের যান্ত্রিকতা।

আসলে এত বছব পরেও, শিল্পায়ন ও শিক্ষার প্রসার সত্ত্বেও অতীতের গোষ্ঠীবদ্ধ মানসিকতা বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও ভাষাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে বারবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বামপন্থী আন্দোলন ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রচেষ্টার ব্যর্থতার ফলে, সংগঠিত রাজনৈতিক দলগুলির বস্তাপচা তত্ত্বের অসারত্ব যতই মানুষের কাছে স্পষ্ট হ'চ্ছে, ততই সাধারণ জনগণ অন্য কোন আদর্শ বা মতবাদের মাধ্যমে গোষ্ঠীবদ্ধ হবার জন্য অন্ধকাবে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। নিজেদের স্ব স্ব অতীতাশ্রয়ী ধর্ম বা সংস্কৃতি বা সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের দিকে ঝোঁকটা বাড়ছে এ অবস্থায়।

নিজস্ব ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার জন্য যদি ব্যক্তিবিশেষ বা কোনো সম্প্রদায় তৎপর হয়, তাতে বিশেষ আপত্তির কিছু ছিল না। কিন্তু এই প্রচেষ্টা যখন অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক অভিযানের রূপ নেয়, তখনই রক্ষণশীলতার বিপজ্জনক দিকটা প্রকট হ'য়ে পড়ে। এবং এ অতীতাশ্রয়ী রক্ষণশীলতার হাত থেকে কোন দলই বাদ যায় না। রাজনৈতিক ফায়দা ওঠাবার জন্য সব দলের নেতাই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জাতি বা ধর্মগত সংস্কারগুলিকে বিশেষ প্রয়োজনবোধে

কাজে লাগাতে সচেষ্ট। উত্তর ও মধ্যভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ভোট পাবার জন্য কংগ্রেস (ই), ভারতীয় জনতা পার্টি ও বিভিন্ন ভুঁইফোড় হিন্দু সংগঠনগুলি 'হিন্দুত্ব' বজায় রাখার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে। ইতিহাসে বিতর্কিত ধর্মস্থান-গুলিকে হিন্দু মন্দিরে পরিণত করার আন্দোলনে তারা নেতৃত্ব দিচ্ছে। স্বভাবতঃই এইধরণের আন্দোলন ঐসব অঞ্চলের সংখ্যালঘু মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হ'তে বেশী দেরি লাগে না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং রাষ্ট্রশক্তির নিরাপত্তা রক্ষার ব্যর্থতার ফলে মুসলমান সমাজও অন্য কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ বা দলে ক্রমশঃই আস্থা হারিয়ে নিজেদের ধর্মভিত্তিক গোষ্ঠীতে সংগঠিত করার কথা ভাবছে। Islamic fundamentalism-এর মত রক্ষণশীল গোঁড়া তত্ত্বে তারা আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে। এইভাবেই একটা vicious circle বা এক বিদ্বেষপূর্ণ আবর্ত চক্র তৈরী হচ্ছে।

'গোর্খাল্যান্ডে'র দাবির প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিম বাঙলার বাঙালী বামপন্থীরাও বেসামাল হ'য়ে পড়ে প্রায় 'আমরা বাঙালী' জাতীয় উৎকট জাত্যভিমানের বশবর্তী হ'য়ে পড়েন। তাই সি পি এম-এর দেওয়াল লিখনে পড়ি 'রক্ত দিয়ে পঃ বাংলাকে রক্ষা করব,' 'ভাগ হ'তে দেব না' ইত্যাদি স্লোগান। পুলিশী দমননীতি দিয়ে 'গোর্খাল্যান্ড' আন্দোলনের মোকাবিলা ক'রতে গিয়ে সাধারণ নিরীহ নেপালীভাষী মানুষকেও ঠেলে দেওয়া হয় ভ্রান্তপথের অনুগামী জঙ্গী গোর্খা আন্দোলনের কোলে, যার নেতা আবার সেই নতুন উদ্ভূত নেপালী elite, সুবাস ঘিশিং যার প্রতিনিধি, দরিদ্র নেপালীদের মুখপাত্র ব'লে দাবি ক'রে যিনি নিজের এবং স্বশ্রেণীভুক্ত শিক্ষিত নেপালীদের জন্য কাজ গুছিয়ে নিচ্ছেন। রাজনীতির চাকরিতে আর এক উচ্চ সোপানে আরোহণের এ এক বিচিত্র উপায়।

শ্রেণীসংঘাতের নির্ধারিত রাস্তা থেকে পিছু হ'টে জাতিসংঘাত ধর্মসংঘাতের অলি-গলিতে দরিদ্রশ্রেণীর মানুষ পরস্পরকে মারছে। সংগঠিত হবার পরিবর্তে বহুধা-খণ্ডিত হ'য়ে শ্রমিকশ্রেণী কি আজ ভারতবর্ষের সমাজ পরিবর্তনের বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবার উপযুক্ত? কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কর্মসূচী এবং বক্তৃতায় বারবার "প্রোলেটারিয়েটের নেতৃত্ব" মন্ত্রের মত না আউড়ে এই প্রশ্নটা বিচার করা দরকার আজ।

ভারতীয় জাতি অর্থাৎ nation এবং জাতিসত্তাগুলি বা nationalities-এর সম্পর্কটাও নতুন ক'রে ভাবার দিন এসেছে। সারা ভারতবর্ষ—যে রূপে আজকে স্থিরীকৃত হ'য়েছে—কি কোনদিন এক জাতি ছিল? কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনে নির্ধারিত কিছু আইন-কানুন বিচার-ব্যবস্থা মেনে চলা ছাড়া, ভারতবর্ষের সব মানুষ কি নিজেদের এক একক জাতীয় প্রবাহের অনুগামী ব'লে মনে করেন? জাতীয় সংহতির নামে যে-সব প্রতীক অনেক সময় ব্যবহৃত হয়, তা কি কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের (এবং তাও হিন্দীভাষী উত্তর ও মধ্যভারতীয় হিন্দু)

কাছেই সমাদৃত নয়? এদেশের ব্যাপক আদিবাসী সম্প্রদায় বা মুসলমানদের কাছে এই প্রতীকগুলি কি তাদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনার ঐতিহ্যের অঙ্গ?

"দেশটা টুকরো টুকরো হ'য়ে ভেঙে যাবে"—এ কথাটা প্রায়ই অনেকের মুখ আজকাল শোনা যায়। উত্তরে পঞ্জাব, পূর্বাঞ্চলে নাগা-মিজো-মণিপুরের পুরোন বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে দার্জিলিং-এ অনুরূপ এক বিদ্রোহের পূর্বাভাষ দেখা যাচ্ছে। এ ছাড়া ঝাড়খণ্ড, উত্তরখণ্ড, ছত্তিশগড়—ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র নিজস্ব প্রদেশ গঠনের দাবি তো আছেই। এইসব ধরণের আন্দোলনের লক্ষ্যবস্তু—ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন (খালিস্তান বা নাগাল্যান্ড) থেকে শুরু ক'রে ভারতবর্ষের ভিতরে থেকে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন—যদি অদূর ভবিষ্যতে সিদ্ধও হয়, এদেশের ব্যাপক জনগণের যে মৌলিক সমস্যা অর্থাৎ দারিদ্র্য তার কোন সমাধানের হদিশ মিলছে না। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ আগেই গঠিত হ'য়েছে; তার ফলে অন্ধ্রের গ্রামের তেলেগু কৃষক বা মহারাষ্ট্রের মারাঠা শ্রমিকের উপর শোষণের জাঁতাকল থেমে যায়নি। বরং নয়া তেলেগু জোতদার ও মহারাষ্ট্রীয় ধনিক শ্রেণী elite রূপে শক্তিশালী হ'য়েছে। পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে বাঙলা সংস্কৃতির চর্চার স্বাধীনতালাভ ক'রেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্রশ্রেণীর ভাত মেরে এক নতুন ধরণের বাংলাদেশী ধনিকশ্রেণী মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—জোতদার-ব্যবসাদার-কন্ট্রাকটরদের সমন্বয়ে। আবার নতুন elite-এর জন্ম হ'ল।

বিভিন্ন ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের নিজস্ব গতিতে স্ব স্ব সংস্কৃতির বিবর্ধন নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কাদের তত্ত্বাবধানে সে সংস্কৃতি বিবর্ধিত হবে? তেলেগু দেশমের গেরুয়াধারী ভাঁড় এন্ টি আর? না, উত্তর প্রদেশের হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক নেতৃত্ব? না, Islamic Fundamentalist নারীবিরোধী মোল্লার দল?

আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দৃঢ়মূলের অভাবে এবং বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলির সুবিধাবাদের ধাক্কায়, ভারতবর্ষকে বোধহয় সত্যই একধরণের ভাঙনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। ওপর থেকে, দিল্লীর 'সাউথ' ও 'নর্থ' ব্লক থেকে ফতোয়া জারী ক'রে হিন্দী চাপিয়ে কেন্দ্রীয় পুলিশ পাঠিয়ে তথাকথিত জাতীয় সংহতি জোর ক'রে বজায় রাখবার চেষ্টা যত প্রবল হবে, এই ভাঙনের গতিও তত দ্রুত হবে। বামপন্থী দলগুলি কিছুকাল আগে পর্যন্তও চেষ্টা ক'রত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গরীব মানুষকে সংগ্রামের একটি ময়দানে সমবেত করার। কিন্তু জাতিসত্তাগুলির নিজস্ব বিশেষ বিশেষ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলির মোকাবিলার চেষ্টার সঙ্গে ব্যাপক অর্থনৈতিক সংগ্রামের সমন্বয় সাধন করে শ্রেণীসংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য যে অনুশীলন ও গভীর মনীষার প্রয়োজন এদেশে, তা আমাদের বামপন্থী নেতৃত্বে অনুপস্থিত। মতাদর্শগত দেউলেপনার চূড়ান্ত নিদর্শন তাই মেলে ক্ষমতাসীন বামপন্থী দলগুলির কাজকর্মে। উপজাতি সম্প্রদায়ের (যাদের মধ্যে কমিউনিস্টদের

এক সময় শক্ত ভিত্তি ছিল) নতুন প্রজন্মের চিন্তা-চেতনা থেকে বিচ্ছিন্নতার চরম পরিণতি দেখছি ত্রিপুরাতে। অনুরূপ পরিস্থিতি দার্জিলিং-এ। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের (বিশেষ ক'রে উপজাতিদের) ভিন্নমতপ্রকাশ মাত্রেই তাকে সি আই এ-র অনুপ্রেরণা বা খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের প্ররোচনা বলে আক্রমণ করাটা সি পি আই (এম) নেতৃত্বের একটা 'ফ্যাশন' হয়ে দাঁড়িয়েছে। সৎসাহসের সঙ্গে বাস্তবের সম্মুখীন হ'য়ে নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত এঁদের—কেন এই বিভিন্ন জাতিসত্তাগুলি বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কিছু ভুঁইফোড় সুবিধাবাদী রাজনীতিজ্ঞদের হাতের ক্রীড়নক হ'চ্ছে?

এই সুবিধাবাদীদের নেতৃত্বে জাত-ভিত্তিক, ধর্মাশ্রয়ী, সংকীর্ণতাবাদী আন্দোলনগুলিই ভারতবর্ষের রাজনীতির ময়দানে কিছু কালের জন্য আসর জমিয়ে থাকবে ব'লে মনে হ'চ্ছে। এদের জঙ্গী তত্ত্বের মোহিনী শক্তি নিজেদের সম্প্রদায়ের যুবদলকে আকর্ষণ ক'রবে। সব সমস্যার সহজ সমাধানের magic formula এদের হাতছানি দিয়ে কাছে টানবে। তারপর ব্যর্থতার তীব্র গ্লানি, ভ্রাতৃঘাতী সর্বনাশের তিক্ত রেশ প'ড়ে থাকবে। এর পরে আবার যে নতুন প্রজন্ম আসবে, যদি সময়োপযোগী বামপন্থী মতাদর্শ ও যথাযোগ্য কর্মসূচী ততদিনে উদ্ভূত হয়, তাহ'লে হয়তো তাদের একত্রিত ক'রে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পবিবর্তনের লড়াইকে শ্রেণীসংগ্রামের রাস্তায় ফিরিয়ে আনা যাবে।

জাতিপ্রথা বিরোধিতা

অশোক রুদ্র

আধুনিককালে জাতিপ্রথাকে কেন্দ্র করে যেসব সামাজিক আন্দোলন হয়েছে জাতিপ্রথার উচ্ছেদ সেইগুলির লক্ষ্যের মধ্যেই ছিল না। বস্তুত, এইসব আন্দোলনের ফলে জাতিপ্রথা শিথিল না হয়ে বরং প্রবলতরই হয়ে উঠেছে। মানুষের চেতনা থেকে জাতির ধারণা লোপ তো পায়নিই বরং গভীরতর হয়ে চেপে বসেছে। এই ঘটনাটা সর্বত্র ঘটেছে বলছি না। দেশের যেখানে যেখানে কোন কোন জাতির লোকেরা নিজেদের সংগঠিত করে নিজেদের জাতিগত স্বার্থের জন্য আন্দোলন করেছে সেখানেই এই ঘটনা ঘটেছে। বাঙালীদের মধ্যে এই ঘটনাটা ঘটেনি। বাংলাদেশে সেইজাতীয় আন্দোলনও তেমন হয়নি যেমন হয়েছে ভারতবর্ষের দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে। বাংলাদেশের অবস্থাটা যে ভারতবর্ষের অন্য অঞ্চলের অবস্থা থেকে বেশ খানিকটা ভিন্ন, তার থেকে আমাদের অনেক শিক্ষা গ্রহণ করার আছে। কি ধরনের আন্দোলন বিপরীত ফল প্রসব করে, কি ধরনের সামাজিক প্রচেষ্টা খানিক পরিমাণে হলেও সাফল্য অর্জন করে, সেই বিষয়ে বাঙালীর সাম্প্রতিক ইতিহাস আলোচনা করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া যাক যে ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চলের তুলনাতেই হাল আমলে পশ্চিমবঙ্গে জাতিপ্রথার প্রকোপটা অনেক কম। এই কথা বলে সমস্যাকে লঘু করার চেষ্টা করা হচ্ছে না। সাধারণভাবে বলা যায় যে যে-কোন সামাজিক সমস্যার আলোচনাকালে তার নঞর্থক দিকের উপর জোর দেওয়া যেমন উচিত তেমনি সেই সমস্যার যদি কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে তো অবশ্যই তাকেও স্বীকার করে নেওয়া উচিত এবং তার কারণ অনুসন্ধান করাও উচিত। তা না হলে হতাশাবাদী হয়ে পড়তে হয়। প্রগতিতে যে বিশ্বাসী, প্রগতির জন্য যে লড়াই করতে চায়, তার হতাশাবাদী হলে চলে না।

আশেপাশের অন্যান্য রাজ্যে যে পরিমাণে হরিজন নিধনের সংবাদ পাওয়া যায় সে জাতীয় সংবাদ পশ্চিমবঙ্গে খুবই কম পাওয়া যায়। এর একটা কারণ অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের জনগণের মধ্যে সংগ্রামী শ্রেণীচেতনার বিকাশ। কিন্তু শক্তিশালী বামপন্থী রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকলেই এবং তাদের দ্বারা সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম থাকলেই যে জাতিপ্রথা দুর্বল হয়ে পড়ে তা মোটেই নয়। উদাহরণ, কেরালা রাজ্যেও বামপন্থী রাজনীতির প্রভাব সুদূরপ্রসারী। কিন্তু সেখানকার জনগণের মধ্যে জাতি-চেতনা অত্যন্ত প্রখর। বামপন্থী এমন কি মার্কসবাদী পার্টিগুলি এই জাতিভেদের সীমানাগুলিকে মেনে নিয়ে তার ভিতরে রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের ছক কষে। ওখানকার কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থকরা অধিকাংশই এড়ওয়া নামক 'অস্পৃশ্য' জাতিভুক্ত। আর তারই পাশাপাশি সংখ্যালঘু ব্রাহ্মণরাও ঐ পার্টির সমর্থক। অপরদিকে কংগ্রেস ও অন্যান্য ডানপন্থী পার্টির সমর্থকরা নায়ার ও খৃষ্টান

সম্প্রদায়ভুক্ত। ভোটের সময় সব পার্টি থেকেই একটি কৌশল অনুসৃত হয়ে থাকে, যা হল এড়ওয়া অঞ্চলে এড়ওয়া প্রার্থী দাঁড় করান, নায়ার অঞ্চলে নায়ার প্রার্থী। ব্রাহ্মণদের বাস যেখানে বেশি সেখানে প্রার্থী করা হয় নাম্বুদ্রিপাদ বা আইয়েরকে, খ্রীষ্টান অঞ্চলের প্রার্থীদের নাম হয় জর্জ, টমাস কুরিয়ান প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গে ভোটের সময় এইজাতীয় কৌশল কিছু পরিমাণ অনুসৃত হয় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে। মুসলমান অঞ্চলে মুসলমান প্রার্থী দেওয়ার রেওয়াজ এখানেও আছে। কিন্তু কোন্ অঞ্চলে কোন্ হিন্দুজাতির আধিক্য তার উপর ভিত্তি করে প্রার্থী নির্বাচনের কথা এখানে খুব বড় একটা শোনা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গের জনগণের মধ্যে জাতিচেতনার প্রখরতা যে অনেক কম তার সাক্ষাৎ প্রমাণ দৈনন্দিন জীবনে সর্বক্ষণই পাওয়া যায়। বাঙালী সমাজ-জীবনের একটি-মাত্র অংশেই জাতিপ্রথা এখনও জাঁকিয়ে বসে আছে। সেটা হল বিবাহের বাজার। সম্বন্ধের বিয়েতে জাত-গোত্র সবই থাকে যেমন থাকে ঠিকুজি-কুষ্ঠি ইত্যাদি। কিন্তু অন্য যে-কোন ক্ষেত্রেই কয়েক দশক আগেও পদে পদেই যেমন কে কোন্ জাতের লোক না ভেবেই পারা যেত না সে অবস্থা এখন পরিবর্তিত হয়েছে। শহরাঞ্চলে বিবাহাদি উৎসবে পংক্তি ভোজনের কথা আজকাল শোনা যায় না। স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা পিক্‌নিক্ করতে যায়, কে কোন্ জাতির তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। গ্রামাঞ্চলের অবস্থা কোথায় কেমন জোর করে বলা ধৃষ্টতা হবে। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় গ্রামাঞ্চলেও ছোঁয়াছুঁয়ি জলচলের অস্তিত্ব চোখে পড়েনি। আমার নিজস্ব গবেষণার বিষয় গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পর্কিত সমীক্ষার উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার অনেক গ্রামেই আমাকে যেতে হয়েছে। উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ সব রকম লোকের সঙ্গেই কথা বলেছি। তারা দাওয়ায় মাদুর পেতে দিয়েছে, বসতে মোড়া দিয়েছে, চা-মুড়ি খেতে দিয়েছে, এটা ডোম পাড়া, বাউড়ি পাড়া, আমরা বামুন আমরা মুসলমান—পরিচয়সূত্রে এসব কথা জানিয়েছে। কিন্তু আপনি কোন্ জাত আপনি কি আমাদের দেওয়া জল খাবেন এ জাতীয় প্রশ্ন কেউ কখনও করেনি। কিন্তু এসবই ছিল, শুধু গ্রামাঞ্চলে নয় শহরাঞ্চলেও এই কয়েক দশক আগেও। বছর চল্লিশেক আগেও নূতন কোন জায়গায় পাড়ার লোক আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছে, "খোকা তোমরা কি জাত ?" সংক্ষিপ্ত উত্তরে তারা সন্তুষ্ট হয়নি। 'কায়স্থ' উত্তর যথেষ্ট না। কি কায়স্থ, কোথাকার কায়স্থ ইত্যাদি নানা জেরা করা হত। পংক্তি-ভোজন তো রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য আশ্রমে পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এখনকার মত বারোয়ারি পূজার রেওয়াজ ছিল না। পারিবারিক পূজায় বা মন্দিরে তথাকথিত নিচু জাতির লোকেদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

এই যে বিপুল পরিবর্তন কয়েক দশকের মধ্যে মধ্যে ঘটে গিয়েছে তার পশ্চাতে কি কি কারণ দেখানো যেতে পারে ? বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন এইসব প্রসব করছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। এটা দুঃখের কথা হলেও সত্য যে পশ্চিমবঙ্গে তথা

ভারতবর্ষে বামপন্থী পার্টিগুলি কখনই সমাজ-সংস্কারমূলক কোন কর্মসূচী গ্রহণ করেনি। কুসংস্কার-কুপ্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধে অভিযান এই পার্টিগুলির উদ্যোগে করা হয়নি। কেরালার বামপন্থী পার্টিগুলিও খুবই শক্তিশালী কিন্তু তা সত্ত্বেও কেরালার জনমানসে জাতিপ্রথার প্রবল প্রভাবের কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

আমার মতে, পশ্চিমবঙ্গে জাতিপ্রথার শিথিলতাপ্রাপ্তির পশ্চাতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে যা তা হল জনশিক্ষা। ঊনবিংশ শতাব্দীর ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙালী মনীষীরা সমাজ-সংস্কারের জন্য যে অক্লান্ত প্রচারকার্য করেছিলেন আমরা তারই ফল ভোগ করেছি। অন্যান্য অনেক কুসংস্কার ও কুপ্রথার মতই জাতিপ্রথাও এমনই একটি ব্যাধি যার নিরাময় সম্ভব করতে হলে যা প্রয়োজন তা মানুষের মনের আমূল পরিবর্তন। জনশিক্ষার মারফত মানুষের মনের পরিবর্তনটা খুবই ধীরগতিতে, কখনও কখনও ফল্গু ধারার মত অদৃশ্য ধারায় কাজ করে যায়। রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে উৎসাহী ব্যক্তি ও পার্টিরা প্রায় সময়ই এই ফল্গুগতি দীর্ঘকালীন সুদূরপ্রসারী মনের পরিবর্তনের কাজটাকে গুরুত্ব দেন না। তাঁদের মনে ধারণা হয় যে রাজনৈতিক সংগ্রাম করে ঝট্‌পট্‌ বুঝি মানুষের মনোজগতেরও সব সমস্যারই সমাধান করে ফেলা যায়। এই জাতীয় ব্যক্তিরা অনেক সময় সূত্রাকারে বলে থাকেন, জাতিপ্রথা হোক, নারীমুক্তি হোক, পণপ্রথা হোক সব সামাজিক সমস্যার সমাধান রাতারাতি হয়ে যাবে একবার সর্বহারা শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব দাবি করে এমন কোন দল দক্ষতা দখল করার পরই। এই ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে এই ধরনের ব্যক্তিরা ঊনবিংশ শতাব্দীর ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সমাজ-সংস্কারক মনীষীদের অবদানকে একেবারেই অস্বীকার করে থাকেন। আমি কিন্তু মনে করি বাঙালীদের মধ্যে বর্তমানকালে জাতিপ্রথার প্রকোপ যে অপেক্ষাকৃত কম তা প্রধানতই রামমোহন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র পর্যন্ত সমাজ-সংস্কারক মনীষীদের অবদান। ব্রাহ্ম আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যই ছিল জাতিভেদ বিরোধিতা। (যদিও একথা সত্য যে ব্রাহ্মদের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য জাতিভুক্ত এবং সেই ব্যাপারে তাদের উন্নাসিকতাও ছিল ও আছে।) ইয়ং বেঙ্গল দলের উচ্ছৃংখল তরুণেরা মদ্যপান, গোমাংস ভক্ষণ প্রভৃতি বিদ্রোহী আচরণের সঙ্গে জাতিপ্রথার বিরোধিতাও করতেন। এঁদের ক্রিয়াকাণ্ড বালখিল্য হলেও তা সমাজকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। শরৎচন্দ্র তাঁর 'বামুনের মেয়ে', 'পল্লীসমাজ' প্রভৃতি উপন্যাসে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কদর্য-জঘন্য-অমানবিক ব্যবহারের যে জ্বলন্ত চিত্র এঁকেছিলেন তা যুগ যুগ ধরে বাঙালী পাঠকের মনকে ধীর-অলক্ষ্য ক্রিয়ায় জারিত-শোধিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনই সামাজিক সমস্যা নিয়ে লিখে গিয়েছেন, সনাতন পন্থা ও আধুনিক পন্থা এই দুয়ের মধ্যে দোদুল্যমান থেকেও তারই মধ্যে দিয়ে তাঁর চিন্তা ধাপে ধাপে আধুনিকতার দিকে এগিয়ে গিয়েছে। আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙালীর দৈনন্দিন

জীবনে জাতের কথা যে প্রায় ওঠেই না তার প্রধান কারণ আমি মনে করি রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রমুখের চিন্তার প্রভাব।

উপরে যে মন পরিবর্তনের ক্রিয়ার কথা বলা হলো তার মধ্যে সংগঠিত আন্দোলনের ভূমিকা প্রায় কিছুই নেই। তার মানে কি এই যে, সেই ভূমিকার কোন প্রয়োজনই নেই? তা মোটেই বলছি না। ভূমিকা অবশ্যই আছে এবং সেই ভূমিকা পালন করা হয়নি বলেই এখনও বাঙালীদের মধ্যেও প্রগতি থেকে গিয়েছে খুবই অসম্পূর্ণ। দৈনন্দিন জীবন থেকে ছোঁয়াছুয়ি, পংক্তিভোজন, জলচল প্রভৃতি উঠে গিয়ে থাকলেও চেতনার থেকে জাতিপ্রথার প্রভাব মোটেই লুপ্ত হয়নি। এখনও কথা প্রসঙ্গে এই ধরনের কথা বলা হয়ে থাকে, 'ওরা তো অমুক জাতি ওরা ওরকমই হয়ে থাকে।' বৈদ্যরা কি রকম, গন্ধবণিকরা কি রকম, হাড়ি-ডোম-বাউড়িদের কাছে কি আশা করা যেতে পারে, এ বিষয়ে অনেক স্বতঃসিদ্ধ জাতীয় ধারণা খুবই ব্যাপক সাধারণ বাঙালীর মধ্যে। অসবর্ণ বিবাহের সময় এই চেতনাটা তার সবচেয়ে কদর্য মুখ প্রদর্শন করে। ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বিয়ে—তা না হয় মানা গেল বা, তাই বলে বৈদ্যের মেয়ে বিয়ে করবে 'শিডিয়ুল' ছেলেকে?

আন্দোলন অবশ্যই প্রয়োজন। এবং আন্দোলনের লক্ষ্য হওয়া উচিত তথাকথিত নিচু জাতির লোকেদের প্রতি দয়ামায়া প্রদর্শন নয়, জাতিপ্রথাটার আমূল উচ্ছেদ। এই আন্দোলনের কর্মসূচী কি রকম হতে পারে তার ধারণা দিতে একটি উদাহরণ দিই। প্রাথমিক পদক্ষেপ হওয়া উচিত পদবি বর্জন। পদবিই তো আমাদের দেশের মানুষকে জাতির খোপে খোপে বিভক্ত করে রেখেছে। পদবি দিয়েই তো সনাক্ত করা হয় কে কোন জাতি। পদবি যতদিন থাকবে ততদিনই এই ব্যক্তি উঁচু জাতি ঐ ব্যক্তি নিচু জাতি এই চেতনা থাকবে। পদবি বর্জনের কাজটা এমন কিছু কঠিন নয়। ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে আমরা পদবি বলতে যা বুঝি তা নেই। (যদিও সেখানেও নামের মধ্যে জাতির পরিচয় ভালভাবেই ঢুকিয়ে দেওয়া থাকে।) বাঙালী মহিলারা তো হরদম দেবী হয়ে যাচ্ছেন, পদবি বর্জন করার জন্য তো কোন অসুবিধা তারা বোধ করেছেন না। সুতরাং পদবি অনায়াসেই বর্জন করা যেতে পারে এবং তার জন্য গণ-আন্দোলন করা সহজেই সম্ভব।

জাতপাতের সমস্যা, সাম্প্রদায়িকতা ও শ্রেণীসংগ্রাম

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

"তথাকথিত নীচু জাত বলে কিছুই নেই প্রকৃত হিন্দু ধর্মে। তাই হরিজনসহ তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের জনগণকে, সমগ্র বর্ণহিন্দুসমাজ থেকে পৃথক করা চলবে না"—এই দাবি করে যারবেদা কারাগারে আমরণ অনশন করেছিলেন গান্ধীজি, অর্ধশতাব্দী আগে। উচ্চশিক্ষিত জাতীয়তাবাদীদের বিবেক সেদিন কিছুটা বিদ্ধ হয়েছিল। জাতপাতের ভেদাভেদ আমরা আর মানব না, একথা সেদিন ঘোষণা করেছিলেন তাঁদের অনেকেই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ শরীরে ছুটে গিয়েছিলেন গান্ধীজির পাশে। সাড়া দিয়েছিলেন ডঃ আম্বেদকরও। তখনকার মত মেনে নিয়েছিলেন গান্ধীজির প্রস্তাবকেই। ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন তাঁর অসামান্য কবিতা "প্রথম পূজা"!

সারা ভারতের অগণিত গ্রামের অধিকাংশ মেহনতী নরনারী—ক্ষেতমজুর, ভাগচাষী, দিনমজুর, দরিদ্র, প্রায় নিঃস্ব কৃষক—বেশীর ভাগই হয় হরিজন, নয় তো আদিবাসী। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বন্ধনমুক্ত স্বাধীন ভারতে হিন্দু-মুসলমান-শিখ, ব্রাহ্মণ-হরিজন সব ভেদাভেদ ঘুচে যাবে—গান্ধীজির এই আহ্বানকে এক কলিযুগের ডাক মনে করে, সেই মেহনতী মানুষেরা কাতারে কাতারে যোগ দিয়েছিল ১৯৪২-এর আগষ্ট বিদ্রোহে, পরে যুদ্ধোত্তর গণজাগরণেও। আর আসমুদ্র হিমাচল সেই "ভারত ছাড়" গর্জনেই শঙ্কিত সাম্রাজ্যবাদ, সর্বনাশ আসন্ন বুঝে, অর্ধেক ত্যাগ করে ভারতীয় ধনবাদী শ্রেণীর সঙ্গে আপসের মত ক্ষমতা হস্তান্তর করল, এল বিপ্লবহীন স্বাধীনতা!

ভারতের সংবিধান রচনায় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নিলেন দলিত জাতপাতের নরনারীর প্রধান মুখপাত্র ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর। ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধেই লেখা হ'ল অস্পৃশ্যতা শুধু পাপ নয় আইনের চোখে অপরাধ, লেখা হল ভারত হবে ধর্মনিরপেক্ষ এক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, যেখানে শিক্ষা, চাকরী, সামাজিক মর্যাদা কোনও ক্ষেত্রেই বৈষম্য দেখানো হবে না ধর্ম বা জাতপাতের ভিত্তিতে। ১৫ আগষ্ট ১৯৪৭ তাই আরব সমুদ্রতীর থেকে বঙ্গোপসাগর আর কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত উদ্দাম মেতে উঠেছিল ভারতের দলিত জনগণ—হিন্দু-মুসলিম-শিখ, উচ্চবর্ণ-হরিজন সকলের এক মহামিলনের উৎসবে।

কিন্তু তারপর? চল্লিশ বছর ধরে নিঃশেষ হয়ে গেছে উৎসবের আনন্দ, নিভে গেছে আশার আলোকমালা, পানপাত্র ভরে গেছে তিক্ত বিষাক্ত গরলে। অবিশ্রান্ত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের, জাতপাতের হিংস্র হানাহানিতে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত হয়েছে ভারতভূমি। প্রহসনে পরিণত হয়েছে সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার ঘোষণা! এমনকি ভারত সরকারের করা একটি সমীক্ষা থেকেও দেখা যাচ্ছে যে ১৯৭৭ থেকে নিদারুণ

ভাবে বেড়ে গেছে সাম্প্রদায়িক সংঘাত। ১৯৭৮-এ সারা ভারতে ২৩০টি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে ১১০ জন, ১৯৭৯তে ৩০৪-টি সংঘর্ষে ২৬১ জন, ১৯৮০তে ৪২৭টি সংঘর্ষে ৩৭৫ জন নরনারী প্রাণ হারান। (বিজনেস স্টান্ডার্ড, ১০ আগস্ট ১৯৮১, কলকাতা)

১৯৮৪তে শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রেই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে মারা যান ৩০০ জনের বেশী মানুষ। ১৯৮৭তে মীরাট ও মোরাদাবাদের বীভৎস সাম্প্রদায়িক সংঘাত আজও দগদগে ক্ষতর মত সমগ্র উত্তর ভারতকে বিষাক্ত করে রেখেছে। ১৯৮৪র মে মাসে বোম্বাই ও ভিয়াণ্ডির সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে বেসরকারি মতে প্রাণ হারিয়েছে সহস্রাধিক নরনারী। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের গর্বের কথা যে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ বা বা মহারাষ্ট্রর তুলনায় এই রাজ্য বহুলাংশে সাম্প্রদায়িক ব্যাধিমুক্ত। তা সত্ত্বেও কাটরা মসজিদ নিয়ে সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলাতে যে সাম্প্রদায়িক দুর্যোগ ঘটে গেল, তা এরাজ্যের সকল প্রগতিশীল মানুষের সাম্প্রদায়িক আত্মসন্তুষ্টিকে চূর্ণ করে দিয়েছে।

জাতপাতের সমস্যা নিয়ে সংঘর্ষ একদিক থেকে গত ৪০ বছরে আরও ভয়াবহ মূর্তি ধারণ করেছে। একটি দায়িত্বশীল সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে যে ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালের প্রথম দশ বছরে (১৯৬৬-৭৬) ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে হরিজনদের উপর বর্বর অত্যাচারের ৪০ হাজার ঘটনা সংঘটিত হয় (এ আর দেশাই : কাস্ট অ্যান্ড কমুনাল ভায়োলেন্স ইন ইন্ডিপেন্ডেনন্ট ইন্ডিয়া, বোম্বাই ১৯৮৫ পৃঃ ৫)।

ভারতের ক্ষেতমজুর আন্দোলনের একজন নেতা ১৯৭৮-এ একটি পুস্তিকা লিখে তাতে বহু তথ্য দিয়ে দেখান যে জনতা সরকারের এক বছরের শাসনে ভারতের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে উচ্চবর্ণের ভূস্বামীদের সশস্ত্র দৌরাত্ম্যে এক হাজারেরও বেশী হরিজন প্রাণ হারিয়েছেন, হাজার হাজার হরিজনের কুঁড়েঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং শত শত হরিজন রমণী ধর্ষিতা হয়েছেন (দেশাই : পূর্বোদ্ধৃত)।

১৯৮১র ৩ সেপ্টেম্বর, ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রীসভার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী, লোকসভাতে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে শুধুমাত্র ১৯৮০তে হরিজনদের উপর নৃশংস অত্যাচারের ১৩৭৪৫টি ঘটেনা সরকারের নথিভুক্ত হয়েছে এবং ১৯৮১র প্রথম ৩ মাসে সেই ধরণের ঘটনা হয়েছে ৫১২৪টি।

বিহারের আরওয়ালে এবং একেবারে সম্প্রতি জেহানাবাদ মহকুমার ননীগড় ও নাগোয়াণ গ্রামে হরিজনদের উপর ভুস্বামীরা তুলনাহীন বর্বরতা অনুষ্ঠিত করেছেন। তথাকথিত উচ্চবর্ণের ভুস্বামী ও তাদের সশস্ত্র ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী রাত্রের অন্ধকারে এই দুটি গ্রামে ঢুকে গুলি করে ১৯জন হরিজনকে হত্যা করেছে। তাদের মধ্যে একটি ৬ মাসের শিশুও ছিল।

উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ—ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে হরিজন, আদিবাসী ও অন্যান্য তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষেরা আজ কার্যতঃ পরিণত হয়েছে

নতুন ধরণের খতবন্দী শ্রমিকে, অর্ধ-ক্রীতদাসে। তবে ৮০'র দশকের হরিজন, আদিবাসী ও অন্যান্য দলিতরা আর আগের মত কপালে করাঘাত করে বা চোখের জল ফেলে মেনে নিতে রাজী নয় এই সীমাহীন দুর্গতিকে। তারাও জোট বাঁধছে, রুখে দাঁড়াছে, যেখানে পারছে পাল্টা মার দিচ্ছে। দলিত মানুষদের এই ভারত জোড়া, বহুক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্ন শ্রেণীবিদ্রোহ, অনেক সময়ই উচ্চতর জাতপাতের ধনবান মানুষদের বিরুদ্ধে জাতি-বিদ্রোহের চেহারা নিচ্ছে, জটিল হয়ে যাচ্ছে শ্রেণীসংগ্রাম, কঠিন হয়ে পড়ছে শ্রেণীপ্রতিরোধের কাজটি।

[২]

ভারতের বামপন্থীরা বিশেষতঃ কমিউনিস্টরাই, গ্রামে এবং শহরে দুর্গত মেহনতী মানুষদের এই শতাব্দীর ত্রিশের দশক থেকেই ঐক্যবদ্ধ করেছেন জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে, শোষিত শ্রেণীভিত্তিতে, পরিচালিত করেছেন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের পথে। ভারতবর্ষের হাজার বছরের ধর্মের আচার-বিচারের ভেদপন্থী, অত্যাচারী ঐতিহ্য বারে বারে তাঁদের এই উদ্যমকে ব্যাহত করেছে। তাঁদের ভাবিত করেছে। আদি যুগের বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম কমিউনিস্ট নেতা গোপেন চক্রবর্তী, ১৯২৮এ লিলুয়ার রেল ধর্মঘটের সময় পুলিশের গুলির মোকাবিলায় নির্ভীক ও ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক মিছিলের গঙ্গার তীরে পেঁছে "গঙ্গা মাই কি জয়" বলে জয় ধ্বনি দেবার ও রাত্রে মুসলমান, বর্ণহিন্দু, তপশীলভুক্ত জাতি ও হরিজন শ্রমিকদের আলাদা আলাদা রান্না ও আহারের ব্যবস্থা দাবি করার বেদনাময় কাহিনী বিবৃত করেছেন। বিস্মিত কমিউনিস্ট সংগঠকরা শ্রমিকদের ভর্ৎসনা করলে, জঙ্গী শ্রমিকরা জবাব দিয়েছেন: "লালঝাণ্ডাকে নিয়ে জান দেনেকো ওয়াস্তে হাম লোগ জরুর তৈয়ারী হ্যায়, লেকিন ধরম কেইসে ছোড়গা?" (গৌতম চট্টোপাধ্যায়; কমিউনিজম অ্যান্ড বেঙ্গলস ফ্রীডম মুভমেন্ট, ১৯৭০, পরিশিষ্ট 'ক')

পরবর্তীকালেও বারবারই শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে এই প্রবল দোটানা দেখা গেছে। ১৯৪৬এর প্রথম ৬ মাস সারা ভারত বিশেষতঃ কলকাতা ও শহরতলী ধর্মবর্ণ জাতপাত নির্বিশেষে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ গণ-বিস্ফোরণে বারবারই সচকিত হয়ে উঠেছে, যার শীর্ষশিখর ছিল ১৯৪৬এর ২৯ জুলাইএর সাধারণ ধর্মঘট। অথচ তার মাত্র এক পক্ষকাল পরে, ১৬ আগস্টে শ্রমজীবী জনগণ সহ সমগ্র দেশ বিভক্ত হয়ে গেল কলঙ্কময় ভ্রাতৃঘাতী গণ-হত্যার অভিযানে।

আবার এই বাস্তবও দেখা দিল যে কমিউনিস্ট তত্ত্বগত প্রচার, অর্থনৈতিক শ্রেণী-সংগ্রামের পাশাপাশি যেখানে ছিল সবচেয়ে প্রবল, সেই ট্রাম শ্রমিকরা কিন্তু ভেসে গেলেন না সাম্প্রদায়িক বন্যাস্রোতে। ঐক্যের দ্বীপের মত জেগে রইলেন সাম্প্রদায়িকতার সমুদ্রের মাঝে।

আর কলকাতা সহ বাংলার শহরগুলিতে ১৯৪৬-৪৭এ যখন চলছে বীভৎস সাম্প্রদায়িক হানাহানি, ঠিক তখনই উত্তর ও পূর্ব বাংলার ১০।১২ টি জেলা জুড়ে

প্রায় এক কোটি হিন্দু-মুসলমান-আদিবাসী-ক্ষেতমজুর-ভাগচাষী ও দরিদ্র কৃষকের, সাম্প্রদায়িক বা জাতপাতের ভেদাভেদ ব্যাধিমুক্ত প্রবল ঐক্যবদ্ধ তেভাগার শ্রেণী-সংগ্রাম এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। ইংরেজ ধনকুবেরদের মুখপত্র স্টেটসম্যানকেও সেদিন লিখতে হয়েছিল যে লালঝাণ্ডা হাতে এক নতুন দৃপ্ত মানবতা জেগে উঠেছে বাংলার গ্রামাঞ্চলে, তেভাগার লড়াই-এর মধ্য দিয়ে। হরিজন, হাড়িমুচি-ডোম, আদিবাসী, রাজবংশী, মুসলমান গরীব ক্ষেতমজুর বা ভাগচাষী আর কাউকে "হুজুর" "বলছে না, নত হয়ে সেলাম করছে না, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশে তুলে পরস্পরকে ডাকছে "কমরেড" বলে! কি আশ্চর্য!

স্বাধীনতার পর ৪০ বছরে সারা ভারতে সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক বেশী বেড়ে গেছে। দুটি রাজ্যে কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন সরকারও রয়েছে। আরও ৩।৪টি রাজ্যে তারা যথেষ্ট শক্তিশালী। ১৯৮৭র ৯ ডিসেম্বর দিল্লীতে সম্মিলিত বামপন্থীদের ডাকে দশ লক্ষ মেহনতী মানুষের মহামিছিল, বিদ্যুৎঝলকে দেখিয়ে দিয়েছে ঐক্যবদ্ধ বামপন্থার কি সম্ভাবনা আছে এমনকি প্রতিক্রিয়ার ঘাঁটি বিশাল হিন্দিভাষী অঞ্চলেও!

তথাপি, এরই পাশাপাশি যেন মহামারীর মত বেড়েই চলেছে সারা ভারতে সাম্প্রদায়িক ও জাতপাতের বিরোধ ও হিংস্র তাণ্ডব? কি তাদের শক্তির উৎস? কোথায় বিপ্লবী বামপন্থার দুর্বলতা? তা না বুঝলে সমস্যার প্রতিকার একান্ত অসম্ভব।

স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতের রাষ্ট্র পরিচালকরা দেশকে নিয়ে যাননি দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ার পথে। তাঁরা দেশকে পরিচালিত করেছেন ধনবাদী বিকাশের পথে, যার ফলে দেশের অল্পসংখ্যক মানুষ বিপুল সম্পদ বাড়িয়ে চলেছে, আর বৃহত্তম জনসংখ্যা নেমে যাচ্ছে দারিদ্রসীমার নীচে। সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করে ভূমি-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে, দরিদ্র মেহনতী চাষীর মধ্যে জমি বিতরণের বদলে, একদিকে ভারতের ধনবাদী সরকার আপস করেছেন পুরাতন পরাক্রান্ত সামন্ত ভূস্বামীদের সঙ্গে। অন্যদিকে ধনবাদী বিকাশের ফলে উদ্ভব হয়েছে এক পরাক্রান্ত ধনী চাষী সম্প্রদায়ের, যারা শহরের ব্যবসায়ী, মজুতদার ও কালোবাজারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফেঁপে ফুলে লাল হয়ে গেছে। এরাই সম্মিলিতভাবে শোষণ করছে ভারতের বিপুল গ্রামাঞ্চলের মেহনতী মানুষদের।

গ্রামাঞ্চলের মোট জনসংখ্যা শতকরা ৪৪ ভাগ বর্তমানে দরিদ্র ক্ষেতমজুর বা ভূমিহীন দরিদ্র চাষী। বাকী কৃষকদেরও শতকরা ৮০ ভাগ ক্রমাগত দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর ও সর্বস্বান্ত হচ্ছে। ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও নিঃস্ব চাষীদের মধ্যে বিপুল ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে হরিজনরা বা আদিবাসীরা। এরা পৌঁছেছে দুর্গতির চরম সীমায়। আর অর্থনৈতিক ক্ষমতাই হোক, প্রশাসনিক ক্ষমতাই হোক—তার মাথায় বসে আছে ধনীচাষীদের, কালোবাজারীদের ও মহাজনদের সন্তান-সন্ততি। আধুনিক

শিক্ষাদীক্ষাও গ্রামাঞ্চলে তাদেরই একচেটিয়া। আর ক্ষেতমজুর ও দরিদ্র চাষীদের, হরিজন ও আদিবাসীদের সন্তানরা ডুবে যাচ্ছে নিরক্ষরতার তলহীন অন্ধকারে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সারা পৃথিবী জুড়ে গত চারদশক ধরে দলিতদের বিদ্রোহ, চীন, ভিয়েৎনাম, কিউবা বা আঙ্গোলার বিজয়ী বিপ্লবের অগ্রগতি, একটা অর্ধস্পষ্ট ঢেউ তুলেছে ভারতের দলিতদেরও চেতনার গভীরে। তারা আর মেনে নিতে রাজী হচ্ছে না এই অসাম্য, অন্যায়, শোষণ ও অত্যাচারকে। নানানভাবে খণ্ডবিচ্ছিন্ন প্রতিবাদে, প্রতিরোধে, বিক্ষোভে, বিদ্রোহে বারবারই ফেটে পড়ছে দলিত হরিজনরা, আদিবাসীরা, অন্যান্য শোষিত অবহেলিত অংশরা।

দুর্ভাগ্যের কথা এই যে মূল কমিউনিস্ট আন্দোলনের কোনও অংশই এই ভারতব্যাপী দলিতবিক্ষোভকে, খণ্ডবিচ্ছিন্নতার ও সীমাহীন শোষণের ক্রোধে পথভ্রষ্ট হবার হাত থেকে রক্ষা ও উদ্ধার করে তাদের নিয়ে এক দেশব্যাপী, বিরাট, ঐক্যবদ্ধ সমাজের কাঠামো চুরমার করে আমূল রূপান্তরের সংগ্রাম শুরু করছে না। নীতিগত কর্মসূচীতে দুটি প্রধান কমিউনিস্ট পার্টি বৈপ্লবিক রূপান্তরের লক্ষ্যসাধন সম্বন্ধে যত সঠিক কথাই বলুক না কেন, বাস্তবে তাদের শতকরা ৯০ ভাগ সময়, কর্মক্ষমতা ও সাংগঠনিক উদ্যম ব্যায়িত হয় নির্বাচনী সংগ্রামে, তাতে জয়পরাজয়ের কৌশল স্থির করায়।

আর তা করলেই, মনে প্রশ্ন এসে যায় ক্ষেতমজুর ও নিঃস্ব চাষীদের নিয়ে গ্রামাঞ্চলে আর্থিক-সামাজিক কাঠামোর খোল-নলচে বদলাবার লড়াই করলে, মধ্যচাষী কি চলে যাবে না ধনী চাষীর পক্ষে, অন্ততঃ সাময়িকভাবে, আর তাহলে কি পরাজয় ঘটবে না নির্বাচনে? আহোরাত্র অবিশ্রান্ত যে তাত্ত্বিক গণঅভিযান চালানো দরকার সর্বপ্রকার ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এবং বিজ্ঞানসম্মত ধ্যান ধারণা ও যুক্তিবাদী সমাজদর্শনের সপক্ষে, তাও কি নির্বাচনে অসুবিধার সৃষ্টি করবে না? নির্বাচনে জয়কে সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য দিলে প্রায় অনিবার্যভাবেই আপস করতে হয় ধর্মীয় কোনও-না-কোনও প্রবণতার সঙ্গে, অনেক ধরণের প্রতিক্রিয়াশীল প্রচলিত বিশ্বাসের সঙ্গে। অথচ তা সমাজ-বিপ্লবের প্রক্রিয়াকে দুর্বলই করে, সবল করে না।

ভারতবর্ষে, গত ৪০ বছরের ইতিহাস নিশ্চয় দেখিয়েছে যে সর্বসাধারণের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন মেহনতী ও দলিত জনগণের হাতে এক মোক্ষম অস্ত্র। তার জোরে তারা ধূলিসাৎ করেছে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরী ব্যবস্থার স্বৈরাচারকে, তার জোরে তারা বিপর্যস্ত করেছে জনতাদলের সাম্প্রদায়িকতা ও চরম প্রতিক্রিয়াকে তোষণ করার নীতিকে। যেখানেই সুযোগ পেয়েছে, সেখানেই তারা বিজয়ী করেছে বাম-গণতান্ত্রিক বিকল্পকে, ধর্মনিরপেক্ষতার শক্তিকে। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালা তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

কিন্তু দলিত জনগণ সেখানেই থামতে চায়নি। সীমিত জনকল্যাণের চেয়ে

কিছু বেশী, মৌলিক প্রত্যাশা নিয়ে তারা হাজির হয়েছে সব ধরণের কমিউনিস্টদের দরবারে। সে প্রত্যাশা সম্পূর্ণভাবে তাদের দারিদ্র মোচনের, দুর্গতি নাশনের। সে প্রত্যাশা সমাজের আমূল রূপান্তরের সংগ্রামে তাদের ডাক দেবার, নেতৃত্ব দেবার। তারই মধ্য দিয়ে দলিতদের সংগ্রাম রূপান্তরিত হতে চাইছে সমাজ-বিপ্লবের হাতিয়ার শ্রেণীসংগ্রামে। তাহ'লেই তারা আর হারিয়ে যাবে না অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা, জাতি-বিদ্রোহ বা সন্ত্রাসের রাজনীতির চোরাগলিতে। সেই নেতৃত্ব ও বৈপ্লবিক কর্মসূচীই প্রকৃত কমিউনিস্ট ঐক্যের পথ প্রশস্ত করবে ও ভারতের অনাগত বিপ্লবকে আসন্ন করে তুলবে।

জাতি শ্রেণী ও আজকের ভারত

প্রদীপ বসু

জাতিদাঙ্গা, হরিজনদের প্রতি অত্যাচার, আজকের দিনে ভারতবর্ষে প্রায় নিয়মিত খবর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধরনের জাতিদাঙ্গা এবং অত্যাচার শুধুমাত্র যে বিহারের মত কৃষি এবং যন্ত্রশিল্পের পশ্চাৎপদ রাজ্যগুলিতে হচ্ছে এমন নয়, তথাকথিত 'আধুনিক' রাজ্যগুলি যেমন মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পাঞ্জাবেও হচ্ছে। এতে অন্ততঃ একটি জিনিষ আজকে পরিষ্কার হয়ে গেছে। বিদেশী সমাজতাত্ত্বিকরা এবং তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিকরাও এতদিন ভারতবর্ষের গ্রামের একটা বিশেষ ধারণা নিয়েই তার বিশ্লেষণ করছিলেন, যার মূল ভিত্তি ছিল জাতি। গ্রামীণ শ্রেণীবিভাগের প্রতি তাঁরা পারতপক্ষে কোন নজরই দেননি। এঁরা গ্রামীণ রাজনীতিকে সব সময় বিচার করেছেন জাতিভিত্তিক ভোট ব্যাঙ্ক, প্রভাবী (dominant) জাতি এবং এই প্রভাবী জাতিগুলির মধ্যে দলাদলি, ইত্যাদির মাধ্যমেই। অতিশূদ্র জাতি[১] এবং ক্ষেতমজুর শ্রেণী এঁদের বিশ্লেষণে খুব একটা প্রাধান্য পায়নি। এদের সাধারণতঃ নিষ্ক্রিয় এবং প্রভাবী জাতির উপর নির্ভরশীল এইভাবেই দেখা হয়েছে। অথচ আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রাম এক জটিল শ্রেণী এবং জাতি-দ্বন্দ্বে বিভক্ত যার প্রতিফলন শুধুমাত্র রাজ্যস্তরেই নয়, জাতীয় রাজনীতিতেও দেখা যাচ্ছে।

এই জাতি এবং শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক কি? বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি-সম্পর্কের বর্তমান বিকাশ, নাগরীকরণ (urbanization) এবং বিভিন্ন জাতির সামাজিক গতিশীলতার (social mobility) সঙ্গেই বা এর সম্পর্ক কি? সাধারণতঃ অনেকে জাতিদ্বন্দ্ব বা দাঙ্গার ব্যাখ্যা জাতির উৎপত্তিতত্ত্ব থেকে করে থাকেন। যেমন একটি মত হল রেস-এর পৃথকীকরণ ও সংমিশ্রণের ফলে জাতি জন্ম হয়েছে। সুতরাং জাতিগুলির মধ্যে একধরণের সাংস্কৃতিক তফাৎ থাকবেই—যার ফলে এই দ্বন্দ্ব। আবার আর একটি মত হল জাতির উৎপত্তি শ্রেণীবিভাগ থেকেই ফলে এই দ্বন্দ্ব শ্রেণীদ্বন্দ্বই। বলাবাহুল্য এইধরণের ব্যাখ্যা অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা, আর জাতির উৎপত্তিতত্ত্বও আজ অবধি ধোঁয়াটে এবং অপরিষ্কার।

ভারতবর্ষে জাতি-প্রথার উৎপত্তি কী করে হল সেটা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে নানারকম তত্ত্ব খাড়া করেছেন, কিন্তু কোন তত্ত্বই সম্পূর্ণ স্বীকৃতি পায়নি। হিন্দু ধর্মীয় ব্যাখ্যাকাররা জাতি প্রথার উৎপত্তিতত্ত্ব হিশেবে ঋগ্বেদের বিখ্যাত 'পুরুষ সুক্তে'র ব্যাখ্যাকেই মেনে নিয়েছিলেন যাতে বলা হয়েছে যে পুরুষের মুখগহ্বর থেকে ব্রাহ্মণ, দুই বাহু থেকে রাজন্য (ক্ষত্রিয়) দুই জানু থেকে বৈশ্য এবং পদতল থেকে শূদ্রের উৎপত্তি হয়।[২] মনুও এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী সামাজিক বৈষম্যের সমর্থন করেন এবং বিভিন্ন বর্ণের কর্তব্য-

কর্তব্য নির্ধারণ করেন। এই বর্ণের ব্যাখ্যা বিভিন্ন পণ্ডিতরা বিভিন্নভাবে করেছেন। কেউ এই বর্ণকে ব্যাখ্যা করেছেন শ্রেণী হিশেবে এবং কেউ রেস (গোত্রবর্ণ) হিশেবে। অর্থাৎ জাতিবিভক্তির হিন্দু ঐতিহ্যমতে দুটো ব্যাখ্যা পাচ্ছি: একটি মতে হল এই বিভক্তির উৎপত্তি ঐশ্বরিক, এটা মৌলিক এবং অপরিবর্তনীয়। ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই বিভক্তি অনেকটা শ্রেণীবিভাগের সমগোত্রীয়।

ভারতবর্ষে রেস-তত্ত্বকে জনপ্রিয় করার পিছনে ছিলেন রিজ্‌লি। রিজ্‌লির সময় এই তত্ত্ব বিদেশে গবেষকমহলে খুব প্রচলিত তত্ত্ব ছিল এবং রিজ্‌লি এই তত্ত্বই জাতিপ্রথার ব্যাখ্যা হিশেবে প্রয়োগ করেন। সংক্ষেপে রিজ্‌লির ব্যাখ্যা ছিল: আর্যরা প্রথমে ছিল একটি সমজাতীয় সম্প্রদায়, কিন্তু আস্তে আস্তে যখনই তারা নতুন নতুন দ্রাবিড় অঞ্চল জয় করতে আরম্ভ করে সঙ্গে সঙ্গে ঐ অঞ্চলের নারীদেরও বন্দী করে নিয়ে যেতে থাকে। আর্যরা এইভাবে যত দূরে যেতে থাকে ততই নিজেদের মূল গোষ্ঠী থেকে যোগাযোগ হারাতে থাকে এবং ক্রমশ বন্দী নারীদের বিয়ে করতে আরম্ভ করে। এর ফলে রক্তের সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়। কিন্তু একটি পর্যায়-এ এসে যখন তারা দেখে তাদের নিজেদের মধ্যেই যথেষ্ট সংখ্যক নারী জন্ম নিয়েছে তখন তারা রক্তের সংমিশ্রণ বন্ধ করে দেয় এবং এইভাবেই একটা জাতিতে পরিণত হয়। এদের জনসংখ্যা যখন বাড়তে থাকে তখন তারা আবার নতুন নতুন অঞ্চলে যেতে থাকে। এরা সকলেই পরাজিত জাতির নারীদের বিয়ে করত কিন্তু তাদের নিজেদের মেয়ে দিত না। রিজ্‌লির মতে এই প্রথা একবার আরম্ভ হতে সমাজের সমস্ত স্তরেই ছড়িয়ে পড়ল; যারাই একটু অন্য ভাষায় কথা বলত, অন্য অঞ্চলে বাস করত, অন্য দেবদেবীর পূজা করত, অন্যধরনের খাদ্য খেতো বা একই কাজ একটু অন্যভাবে করত তারা সকলেই তাদের রক্ত অন্যদের থেকে আলাদা আলাদা এবং অন্যদের সঙ্গে বিবাহ অসম্ভব এটাই ভাবতে আরম্ভ করল।[৩]

রিজ্‌লির এই তত্ত্বের মূল্য আজকে যাই হোক না কেন আমাদের দেশের উঁচু জাতির মানুষেরা এবং বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা এই তত্ত্ব সাদরে গ্রহণ করে এবং প্রমাণ করতে চায় অন্যান্য জাতির চেয়ে তারা শ্রেষ্ঠ, তাদের মধ্যে আর্যরক্ত রয়েছে এবং তারা প্রায় সাদা বিদেশীদের সমান। শুধুমাত্র রিজ্‌লিই নয় ম্যাক্সওয়েবারও এই রেস-তত্ত্বের সমর্থন করতেন।[৪]

রিজ্‌লির এই তত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইবেটসন এবং নেসফীল্ডের তত্ত্বের খণ্ডন করা। ইবেটসন ১৮৮১ সালে পঞ্জাবের সেন্সাস পরিচালনা করেন এবং সেন্সাস রিপোর্টে পঞ্জাবের জাতির উপর একটি পরিচ্ছেদ লেখেন।[৫] ইবেটসনের মত ছিল যে জাতির উৎপত্তি হয়েছে বৃত্তি বা পেশা থেকে। প্রত্যেক সমাজে বিভিন্ন পেশার মর্যাদা ভিন্ন। হিন্দুসমাজে প্রথম ব্রাহ্মণরা নিজের বৃত্তিগত মর্যাদা রক্ষা করার জন্য একে কুলগত পেশা হিসেবে ধর্মীয় অনুমোদন দেয় এবং এই একই নীতি অন্যান্য পেশার উপরও প্রয়োগ করে। জাতি যে বৃত্তিরই একধরনের পরিবর্তিত রূপ এটা

হেনরি মেইনও[৬] মনে করতেন এবং ইবেটসনের পরে নেসফীল্ডও স্বাধীনভাবে এই তত্ত্বের প্রচলন করেন। নেসফীল্ডও মনে করতেন এই পেশাগত শ্রেণীগুলিই পরে জাতি হিশেবে পরিচিত হয়।[৭] নেসফীল্ড ও ইবেটসন দুজনেই মনে করতেন যে আদিম ট্রাইব থেকে পেশাগত গীল্ড এবং তার থেকে জাতি এইভাবেই জাতিপ্রথার উৎপত্তি হয়েছে। অর্থাৎ রিজলি যেমন মনে করতেন এর উৎপত্তি আর্যদের অনুপ্রবেশের ফলেই হয়েছে, এই দুজনের মতে জাতির উৎপত্তি হয়েছে ভারতবর্ষের লোকসমাজ থেকেই। আবার সেনাট এই দুই তত্ত্বের সংমিশ্রণ করে দেখাতে চান আর্য এবং ট্রাইবাল সমাজ এই দুই জাতির উৎপত্তির কারণ।[৮] সাম্প্রতিক কালে গুল্ডও জাতিপ্রথার ব্যাখ্যা করেছেন বৃত্তিগত তত্ত্বের ভিত্তিতে।[৯]

জাতির উৎপত্তি নিয়ে এই তর্কবিতর্ক প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে চলে। এই তর্কের ভিতর না গিয়ে সংক্ষেপে বলা যায় যে জাতিপ্রথা ব্যাখ্যার সমস্ত প্রয়াসই নিষ্ফল হয়।[১০] গ্রহণযোগ্য কোনো তত্ত্বই কেউ উপস্থিত করতে পারেন না। ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে যদিও কোন তত্ত্বই আজকে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন আর্যদের অনুপ্রবেশ এবং আক্রমণ, পরাজিত জাতির প্রতি বিদ্বেষ, আর্যদের দ্রাবিড়ের উপর শ্রেষ্ঠতা, বা পেশাগত গোষ্ঠী এর কোনটাই যে সঠিক ব্যাখ্যা নয় এটা সকলেই আজ স্বীকার করেন তবুও এই বিভিন্ন তত্ত্বের প্রতিফলন আজও বিভিন্ন লেখায় দেখা যায়।

যদিও জাতির উৎপত্তি কি করে হল তার সঠিক কারণ অজ্ঞাত কিন্তু এটা পরিষ্কার যে এই প্রথা বহুকাল যাবৎ চলে আসছে, এবং জাতি বিভিন্ন উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং আছে। যদিও জাতি-সম্পর্ক বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থায় ছিল ভিন্ন। আজকের সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে জাতির যা সম্পর্ক, বলাবাহুল্য সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সে সম্পর্ক ছিল আলাদা।

আমরা এও দেখতে পাই যে জাতির উৎপত্তির ব্যাপারে পণ্ডিতদের কোনরকম সম্মতি না থাকলেও জাতি কী, এই ব্যাপারে বেশীর ভাগ পণ্ডিতই একমত। সংক্ষেপে জাতির বিশিষ্টতা হল: (১) জাতি বংশগত; (২) জাতি বিশেষ বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত, (৩) স্বজাতির সঙ্গে বিবাহ বা অন্তর্বিবাহ (endogamy) ও (৪) প্রত্যেক জাতির সমাজে একটি নির্দিষ্ট স্থান এবং মর্যাদা এবং (৫) প্রত্যেক জাতি বিশেষ কিছু ধর্মীয় আচার-আচরণ এবং বিশেষ করে স্পৃশ্যতা-অস্পৃশ্যতার নিয়ম দ্বারা পরিচালিত। এখানে জাতি বলতে বুঝতে হবে ছোট ছোট স্থানীয় গোষ্ঠী কারণ আমরা জানি একই জাতির সামাজিক মর্যাদা বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন এবং বিভিন্ন জাতির পরস্পরের মধ্যে অবস্থানেরও আঞ্চলিক বিশিষ্টতা আছে। অনেক সমাজ-বিজ্ঞানী মনে করেন জাতির মৌলিক একক হল উপজাতি (Subcaste)[১১]—যেমন বাগদীদের মধ্যে তেঁতুলিয়া বাগ্দী, দুলিয়া বাগ্দী, মাটিয়া বাগ্দী, ইত্যাদি—কারণ বিবাহ ও জ্ঞাতি-সম্পর্ক (Kinship Relations) সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ থাকে উপজাতির মধ্যেই।

অর্থাৎ একভাবে দেখতে গেলে জ্ঞাতি-সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয় উপজাতি মাধ্যমে, অন্য দিকে বৃত্তি ও শ্রমবিভাগ নিয়ন্ত্রিত হয় জাতির মাধ্যমে।

এখন আমরা যদি এই সিদ্ধান্তে আসি যে জাতি একধরনের সামাজিক শ্রমবিভাগ তাহলে ভুল হবে। শ্রেণীকে মার্কস সব সময়ে উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তিতে বিচার করেছেন এবং উৎপাদন-সম্পর্কসমূহ এক অর্থে সমাজের রূপ (social form) নির্দিষ্ট করে। মার্কস সমাজের আধেয় (content) এবং রূপকে আলাদাভাবে বিচার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ মার্কস লিখেছেনঃ একজন নিগ্রো একজন নিগ্রোই। সে দাস হয় শুধু বিশেষ সম্পর্কের আধারে। একটা সুতাকাটার কল সুতা কাটার যন্ত্রই। এটা পুঁজিতে পরিণত হয় বিশেষ সম্পর্কের ভিতর দিয়ে। এই সম্পর্ক থেকে ছিন্ন করলে এটা আর পুঁজি থাকে না, যেমন সোনা আপনা হতেই অর্থ হয় না[১২]...।

অর্থাৎ যে কোন সমাজে মানুষ এবং উৎপাদন শক্তি হল তার পার্থিব আধার (material content), যা বিশেষ সম্পর্কের ভিত্তিতে সামাজিক রূপ গ্রহণ করে। বিশেষ উৎপাদন-সম্পর্কের ভিতর প্রবেশ করলে মানুষ এবং উৎপাদনশক্তি ঐ বিশেষ সম্পর্কের ছাপ পায়—একজন নিগ্রো দাসে পরিণত হয়, যন্ত্র পুঁজিতে পরিণত হয়। উৎপাদন সম্পর্ক বলতে বিশেষ করে তিনটি জিনিষ বোঝায়ঃ (১) উৎপাদন সামগ্রী এবং সম্পদের অধিকারের সামাজিক রূপ; (২) সমাজের শ্রমশক্তির বিভিন্ন শ্রম প্রক্রিয়ায় নিয়োজনের প্রকার এবং এই বিভিন্ন শ্রমপ্রক্রিয়ার সংগঠনের প্রকার এবং তা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত শ্রমের দ্বারা প্রয়োজিত দ্রব্যের পুনর্বণ্টনের সামাজিক রূপ। অর্থাৎ উৎপাদন সামগ্রী এবং শ্রমশক্তি কার অধিকারে বা দখলে তার ভিত্তিতে উৎপাদন সামগ্রীর মালিক এবং উৎপাদকের মধ্যে সম্পর্ক, মানুষ ও উৎপাদন শক্তির মধ্যে সম্পর্ক এবং উৎপাদিত দ্রব্যের উদ্বৃত্তের পুনর্বণ্টনের প্রকার। যদিও শ্রেণীবিভাগ এবং শ্রেণী-সম্পর্কের মূল ভিত্তি অর্থনৈতিক কিন্তু প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় তা কিয়দংশে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অনেক সময় ধর্মীয় সম্পর্কের দ্বারাও পরিচালিত হয়। সামন্তবাদী এবং প্রাক্-সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত শ্রমের শোষণ মূলত যে ব্যবস্থার দ্বারা হত তা ছিল বর্ণজাতি ব্যবস্থা—যাতে উপজাতি ছিল জ্ঞাতি-সম্পর্কের একক এবং জাতি ছিল শ্রমবিভাগের একক। কোসাম্বিও জাতিকে এই উদ্বৃত্ত শ্রমবণ্টনের ফলশ্রুতি হিশেবেই বিচার করেছেন। এককথায় আমরা বলতে পারি সামন্তবাদী ও প্রাক্-সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার জাতিব্যবস্থা এবং শ্রেণীবিভাগকে বাস্তবে আলাদা করা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে জাতি এবং শ্রেণীর পৃথকীকরণ আরম্ভ হয়। ঔপনিবেশিক শাসন শুধুমাত্র নতুন শ্রেণীরই জন্ম দেয় না, জাতিপ্রথা থেকে শ্রেণীবিন্যাসের পৃথকী-করণের প্রক্রিয়াও আরম্ভ করে—যদিও ঔপনিবেশিকতার কারণেই এই প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় না। তবুও একথা বলা যায় আজকের জাতি এবং সামন্তবাদী জাতি এক নয়। আজকে জাতির সঙ্গে শ্রেণীর সম্পর্ক অনেক জটিল এবং এই সম্পর্ক আরও

জটিল হয়েছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে অসমান অর্থনৈতিক বিকাশ এবং অসমান পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অনুপ্রবেশের ফলে।

আরেকভাবে দেখতে গেলে জাতিপ্রথা যেহেতু কুলগত পেশার উপর নির্ভর, ফলে প্রতিটি পেশায় নিযুক্ত জাতিরই তাতে অধিকার আছে। এই পেশাগত দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় জাতির মডেল মূলত অপ্রতিযোগিতামূলক অন্যদিকে শ্রেণী সবসময় দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। জাতিব্যবস্থায় যেহেতু মানুষের বৃত্তি পরিহারের স্বাধীনতা ছিল না, ফলে বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত জাতির সহযোগিতার উপর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দাঁড়িয়েছিল। যদিও এই সহযোগিতা যে সবসময় স্বতঃপ্রবৃত্ত সহযোগিতা ছিল এরকম ভাববার কোন কারণ নেই। উৎপাদন ব্যবস্থাকে জাতিগত বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা যদিও কোনদিনই সম্পূর্ণভাবে সফল হয়নি, এক জাতি অপর জাতিতে পরিণত হয়েছে, বৃত্তির পরিবর্তন করেছে বা শুদ্ধতর আচার গ্রহণ করে নতুন জাতিনাম নিয়েছে কিন্তু বৃত্তিতে কুল বা জাতিগত অধিকারের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ কোন আপত্তি হয়নি। অর্থাৎ বিভিন্ন জাতি পরস্পরের মধ্যে সামাজিক অবস্থানের অদলবদল করলেও প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতে মূল জাতিব্যবস্থায় বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। যে ব্যবস্থায় ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ আবার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়তে থাকে। আমরা জানি যে যজমান উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময় হত জাতির মাধ্যমেই এবং এই ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত শ্রমের ভাগাভাগিও হত জাতির মাধ্যমে। ঔপনিবেশিক যুগে এই কুল বা জাতিগত পেশার পরিবর্তন আরম্ভ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতির একটা মূল ভিত্তি ভেঙে পড়তে থাকে। নির্মলকুমার বসু ১৯০৯ থেকে ১৯৩৯ অবধি পশ্চিমবঙ্গে স্ববৃত্তিতে নিযুক্ত বিভিন্ন জাতির একটি পরিসংখ্যান দিয়েছেন। তাতে দেখা যায় স্ববৃত্তিতে নিযুক্ত মানুষের শতকরা হার সাধারণভাবে প্রতি দশ বছরে কমতে থাকছে। এই পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে নির্মল বসু লিখেছেন :

মোটের উপর বলা চলে যে, ইংরেজী শাসন এবং ধনতন্ত্র বিস্তারের ফল বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন আকারে দেখা দিয়াছে। যাহারা পূর্বেও চাকরি করিত, আজও তাহারা চাকরি করিতেছে। যে সকল শিল্প ধনতন্ত্রের আঘাতে পর্যুদস্ত হইয়াছে সেই সকল জাতির মধ্যে পরিবর্তনের মাত্রা বেশি। বিদেশে চামড়া চালান দেওয়ার ফলে মুচির বৃত্তি অনেকাংশে নষ্ট হইয়াছে, তাহার স্ববৃত্তি খানিক অংশে ত্যাগ করিয়া চাষ বা অন্য শিল্পে মজুরি করিতেছে। বিদেশী ও স্বদেশী মিলের সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ হওয়ার যোগীকে চাষের দিকে ঝুঁকিতে হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাঁতের কাপড়ের বাজার আছে বলিয়া তাহারা স্ববৃত্তি সম্পূর্ণ পরিহার করে নাই।[১৩]

নির্মল বসু বোলপুরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আরও লিখেছেন :

মুচি আগে চামড়ার কাজ করিত, আজ চামড়া অন্য দেশে পাকাইয়ের জন্য চালান যাইতেছে। তাঁতীদের কারবারও কলের সুতার উপরে নির্ভর করে বলিয়া,

কখনও চলে কখনও চলে না। কলের মালিকদের প্রয়োজনের চাপে তাঁতীদের জীবন পরাধীন হইয়া গিয়াছে। কামারের ব্যবসাও ভাল চলে না, বহু জিনিস কলে তৈয়ারি হইয়া সস্তায় শহরবাজারে বিক্রয় হয়। ফলে বিভিন্ন শিল্পীকুল দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। কেহ ভূমিহীন চাষী বা মজুরে পরিণত হইয়াছে, কেহ দেশত্যাগী হইয়া শেষে কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার আর খোঁজ পাওয়া যায় না।

মুচি চাষী হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ঔষধের দোকান করিতেছে; কায়স্থ, সদ্গোপ, উগ্রক্ষত্রিয় কোথাও ছুতোরের কারখানা, কোথাও জুতার দোকান খুলিয়াছে। বর্ণ-ব্যবস্থা অনুসারে যাহার যাহা বৃত্তি ছিল, সে আর তাহা ধরিয়া থাকিতে ভরসা পায় না। ফলে জাতিভেদ অর্থনীতির ক্ষেত্র পরিহার করিয়া শুধু সামাজিক ক্রিয়াকরণে আবদ্ধ রহিয়াছে।[১৪]

গত তিরিশ বছরে এই জাতিভিত্তিক বৃত্তি থেকে বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়া সমস্ত ভারতবর্ষেই আরও দ্রুতহারে হচ্ছে। আজকে অর্থনীতি আর জাতিব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না বরং অর্থনীতিই জাতিব্যবস্থার পরিবর্তন নির্ধারিত করছে। অর্থাৎ জাতির চেয়ে শ্রেণীই আজকের সমাজে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব। জাতি বৃত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে জাতির একটা মুখ্য বিশিষ্টতা শেষ হয়ে গেছে, জাতিপ্রথার যা রয়ে গেছে তা হল স্বজাতি বিবাহ এবং স্পৃশ্যতা-অস্পৃশ্যতা। অন্তর্বিবাহ আজও বহুলাংশে প্রচলিত এবং ছুৎমার্গ নীতি যদিও লোপ পায়নি তবুও আগের চেয়ে অনেক কম।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেখতে হবে যে এই জাতিপ্রথার ভবিষ্যত কি এবং সমাজবিজ্ঞানী ও মার্কসবাদীরা এর ভবিষ্যত কীভাবে বিচার করেছেন। আজকের যে জাতিদাঙ্গা তারই বা কারণ কি? এর কারণগুলি কি জাতি ব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছে না তার বাইরে?

সাধারণভাবে বলতে গেলে ভারতীয় মার্কসবাদীরা জাতিব্যবস্থা সম্পর্কে মার্কসের ব্যাখ্যাকেই অনুসরণ করেছেন। ১৮৫৩ সালে মার্কস লিখেছিলেন: আধুনিক যন্ত্রশিল্প ভারতীয় জাতির ভিত্তি এবং ভারতের উন্নতির ও শক্তি বিকাশের চূড়ান্ত বাধাস্বরূপ বংশগত শ্রমবিভাগকে ধ্বংস করবে।[১৫]

রজনীপাম দত্ত মার্কসের এই উক্তির উল্লেখ করে লেখেন যে জাতিপ্রথাকে নিন্দা করে বা তার বিরুদ্ধে প্রচার করে নির্মূল করা যাবে না, যন্ত্রশিল্পের উন্নতি এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতিই এই পুরাণ বাঁধনগুলি ছিঁড়ে ফেলবে। এর প্রমাণস্বরূপ উনি ১৯২১ সালের বিহার ও উড়িষ্যার সেন্সাস রিপোর্ট উল্লেখ করে লেখেন যে জামশেদপুরে আধুনিক পরিবেশে কাজ হওয়ার ফলে সব জাতির মানুষই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাজ করছে কোনরকম জাতিসংস্কার না রেখেই।[১৬] এ. আর. দেশাইও জাতিপ্রথা সম্বন্ধে ঐ একই মত প্রকাশ করেন এবং বলেন যে যন্ত্রসভ্যতার উন্নতি, আধুনিক শিল্প, এই সবই শেষ অবধি জাতিপ্রথাকে নির্মূল করবে।[১৭]

অন্যদিকে শ্রীনিবাস ও আরো কিছু সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন যে ভারতবর্ষে খুব অল্পসংখ্যক মানুষই বাস্তবে জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে। অধিকাংশ হিন্দুই জাতিপ্রথার বিনাশ চায় না ; জাতি ছাড়া সমাজের গঠন কীভাবে হবে সে সম্বন্ধেও তাদের কোন ধারণা নেই। ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে জাতি এমনভাবে ঢুকে গেছে যে সকলেই ওপরে প্রকাশ না করলেও ভেতরে ভেতরে একে মেনে নিয়েছে। আজকে রাজ্যে এবং কেন্দ্রে মন্ত্রী-নির্বাচনের সময়, বা সাধারণ নির্বাচনের সময়, প্রার্থীদের জাতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রীনিবাসের মতে প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে জাতিসম্পর্ক ছিল আলম্বিত (vertical) গ্রামভিত্তিক যেখানে উঁচু জাতি এবং নীচু জাতির মধ্যে পরস্পরনির্ভরতা ছিল। ব্রিটিশ যুগের আরম্ভ থেকেই এই নির্ভরতার ধরন বদলে যায়, সমমর্যাদাবিশিষ্ট জাতির মধ্যে সমৈক্যতা (solidarity) বাড়তে থাকে গ্রাম এবং আঞ্চলিক বিস্তার ছাড়িয়ে। এই সমৈক্যতাকে বলা হয়েছে সমস্তর সমৈক্যতা (horizontal solidarity)। এই পরিবর্তিত জাতিসম্পর্কের মূল কারণ হল সংবাদ আদানপ্রদান এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং এরই ফলে জাতিভিত্তিক হস্টেল, হাসপাতাল, কো-অপারেটিভ শহরের সামাজিক জীবনেও খুব সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।[১৮]

শ্রীনিবাস লিখেছেন : খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে সাধারণভাবে গত একশ বছরে সমমর্যাদাবিশিষ্ট জাতির সমৈক্যতা বেড়েছে এবং সেই অনুপাতে একই অঞ্চলে বসবাসকারী অসম জাতিগুলির মধ্যে পরস্পরনির্ভরতা কমেছে।[১৯]

শ্রীনিবাসেব মতে প্রাপ্তবয়স্কের নির্বাচনে যোগ দেবার অধিকারও জাতিকে শক্তিশালী করে তুলেছে কারণ অন্য কোন বিশেষ কারণ না থাকলে লোকে সাধারণতঃ নিজের প্রার্থীকেই ভোট দেয়। শেষ অবধি শ্রীনিবাসও বলেছেন যে সুদূর ভবিষ্যতে অবশ্যই শিল্পীকরণ, শিক্ষার প্রসার, জাতিপ্রথার নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে নির্মূল করবে কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এই পরিবর্তন জাতি সংঘর্ষের রূপ নেবে।

আমরা তাহলে দেখতে পাচ্ছি যদিও সাধারণভাবে মার্কসবাদী এবং অমার্কসবাদী সকলেই একমত যে যন্ত্রশিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জাতিপ্রথার বাঁধন দুর্বলতর হতে থাকবে এবং একটি অবস্থায় সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যাবে, তবুও একথা সত্যি যে আজকে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে জাতির ভূমিকা অবহেলার নয়। বিভিন্ন সমমর্যাদাবিশিষ্ট জাতি একজোট হয়ে নানাভাবে সমাজে ও রাজনীতিতে চাপ সৃষ্টি করছে এবং সত্তর দশকের প্রথম থেকেই জাতিতে জাতিতে দাঙ্গার ঘটনা প্রায় একটা নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দাঙ্গার সংখ্যা কোন রাজ্যে কম কোন রাজ্যে বেশী ; কিন্তু অগ্রসর, অনগ্রসররাজ্য এমনকি মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ুর মত রাজ্য যেখানে ব্রাহ্মণ্যবিরোধী আন্দোলনের ইতিহাস রয়েছে এর থেকে বাদ যায়নি। কেন এমন হল ?

আমরা আগেই বলেছি যে ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রবেশের ফলে

ভারতবর্ষে স্ববৃত্তি থেকে জাতিরা আস্তে আস্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ বিকাশ ভারতবর্ষে হতে পারেনি, আবার ঐতিহাসিক এবং সামাজিক কারণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এর বিকাশ হয় অসমান। কৃষিতে আধা-সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা বহু জায়গায়ই বর্তমান এবং কৃষিতে পুঁজিবাদী বিকাশ কতটা হয়েছে এই নিয়ে বহু বিতর্ক আছে। ফলে শ্রেণীর যেমন সম্পূর্ণ স্বাধীন বিকাশ হয়নি তেমনি জাতি কেবল আংশিকভাবে লোপ পেয়েছে। আবার এই শ্রেণীর বিকাশ এবং জাতির বিনাশের আঞ্চলিক পার্থক্য আছে অঞ্চলগুলির ইতিহাস, আন্দোলন, শিল্পায়নের ভিত্তিতে। ফলে আজকে আমরা এক জটিল অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছি যার মূল্যায়ন বিভিন্নজনে করেছেন বিভিন্নভাবে।

বর্তমানে এই জাতিদাঙ্গার যে প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী, বুদ্ধিজীবী মহলে দেখা যাচ্ছে তাকে মোটামুটি এইভাবে ভাগ করা যায়ঃ

(১) জাতিযুদ্ধই হল শ্রেণীযুদ্ধ। আলাদা করে শ্রেণীযুদ্ধের প্রয়োজন নেই। ভারতবর্ষে জাতিই হল শ্রেণী। যারা উঁচু জাতির লোক তারাই ধনী এবং নীচু জাতির লোকেরা গরীব। ভারতবর্ষে অধিকাংশ মানুষ যারা দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে তারা হয় দলিত জাতির, নয় আদিবাসী। ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্ট আন্দোলন চিরদিনই ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য উঁচু জাতির নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে ফলে এরা দলিত জাতির জন্য কিছু করেনি এবং ভবিষ্যতেও কিছু করবে না। ভবিষ্যত ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর শাসন হবে না, হবে দলিত জাতিদের শাসন এবং এর ফলেই জাতিভেদের বিলোপ হবে। এদের বর্তমান দাবি হল দলিত জাতিদের জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়, আলাদা কোর্ট, আলাদা পুলিশ, আলাদা পাব্লিক সার্ভিস কমিশন এবং আলাদা দলিতস্থান।[২০]

(২) প্রথমে জাতিযুদ্ধ করতে হবে, তারপরেই শ্রেণীযুদ্ধ করা যাবে। অনেকে আবার বলেছেন শ্রেণীযুদ্ধই প্রাথমিক কিন্তু প্রথমে জাতিসমস্যার সমাধান করতে হবে। এদের কারো বক্তব্য হল যেহেতু ভারতবর্ষে জাতিভেদ, ছুৎমার্গ নীতি ইত্যাদি আজও প্রচলিত, সুতরাং একে সরাতে হলে প্রথমে জাতিযুদ্ধ করতে হবে এবং তারপরেই শ্রেণীযুদ্ধ করা সম্ভব। যাঁরা একটু মধ্যপন্থী তাঁরা বলেছেন শ্রেণী সংগ্রামে জাতিকে অবহেলা করলে চলবে না। ভারতবর্ষে কম্যুনিস্টরা চিরদিন শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলেছে, কিন্তু জাতির দিকে নজর দেয়নি। অথচ জাতিকে অবহেলা করা যায় না কারণ জাতি এখনও সমাজের বাস্তব ভিত্তি (material base), কেউ আবার বলেছেন জাতি হল উৎপাদন সম্পর্ক। এদের মধ্যেই আবার কেউ বলেছেন আম্বেদকর এবং ফুলের তত্ত্বের সঙ্গে মার্কসবাদকে যোগ করতে হবে এবং তার ভিত্তিতেই জাতি-শ্রেণী সংগ্রাম করতে হবে।[২১]

(৩) আজকে যে জাতিদাঙ্গা হচ্ছে তা শ্রেণীযুদ্ধেরই একটা রূপ। আসলে

জাতিদাঙ্গার নামে যা হচ্ছে তা হল শ্রেণীদ্বন্দ্ব, কারণ এই সংঘর্ষ জাতিভিত্তিক নয়, শ্রেণীভিত্তিক।[২২]

প্রথম দুটি মত সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায় যে আজকে জাতি এবং শ্রেণীর পৃথকীকরণ হয়েছে যা আমরা আগেই দেখেছি। ফলে শ্রেণীকে জাতি হিসাবে বিচার করা এবং সেই হিসেবে আন্দোলন পরিচালিত করা আজকের দিনে যুক্তিযুক্ত নয়। আমাদের আরও মনে রাখতে হবে যে তপসীলভুক্ত জাতি যাদের দলিত জাতি হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে তারা সমজাতিক সম্প্রদায় (homogeneous community) নয়, বরং বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। তপসীল জাতি একটি সরকারি ক্যাটিগরি মাত্র। প্রথমে জাতিযুদ্ধ, তারপর শ্রেণীযুদ্ধ—এই তত্ত্বেরও অন্তর্নিহিত অনুমান হল যে তপসীল জাতিগুলিকে একত্র করে প্রথমে জাতিভেদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে এবং তা নির্মূল হলেই শ্রেণীসংগ্রাম আরম্ভ করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য এই তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব নয় এবং এই তত্ত্বের প্রবক্তাদেরও এ সম্বন্ধে কিছু বলার নেই। আজকের দিনে শ্রেণীসংগ্রামকে স্থগিত রেখে কি উপায়ে যে জাতি-যুদ্ধ পরিচালিত হবে এবং তা কতটা বাঞ্ছনীয়, এ প্রশ্নও থেকে যায়। যারা জাতিকে বাস্তবভিত্তিক বলছেন তাদের এই মতও স্বীকার করে নেওয়া যায় না, কারণ উৎপাদন শক্তি হল সমাজের বাস্তব ভিত্তি[২৩] এবং উৎপাদন শক্তি বলতে আমরা বুঝি: ১। উৎপাদন সামগ্রী যাকে আবার উৎপাদনের যন্ত্র, কাঁচামাল ইত্যাদিতে ভাগ করা যায় এবং ২। শ্রম শক্তি। এই অর্থে জাতিকে বাস্তব ভিত্তি বলা সম্ভব নয়। অন্যদিকে জাতি কেন উৎপাদন সম্পর্ক নয় তা আমরা আগেই দেখেছি।

এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে ভারতের জাতীয় আন্দোলনও এই সংকীর্ণ জাতিস্বার্থ বা ধর্মীয় স্বার্থের উর্ধ্বে যেতে পারেনি বরং বহু নেতাই ধর্ম এবং এবং জাতিকে তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থে ব্যবহার করেছেন; এর ফলে শ্রেণীচেতনার বিকাশ যেমন সম্পূর্ণভাবে হতে পারেনি, সেইরকম জাতিচেতনা লোপ পাবার বদলে বিভিন্ন আন্দোলনে ফিরে ফিরে এসেছে। আমরা পরে দেখব যে বিভিন্ন জাতিরা তাদের সামাজিক মর্যাদার উন্নতির জন্য যে আন্দোলন করে তাও খুব সীমাবদ্ধ আন্দোলন, যার উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কিছু আর্থিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করা। বিভিন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলন এক অর্থে শুধুমাত্র শ্রেণী বা জাতির প্রাধান্যকেই প্রতিফলিত করে না, শ্রেণীচেতনা ও জাতিচেতনার প্রাধান্যকেও করে। সেই অর্থে এই বিভিন্ন জাতি আন্দোলন জাতিচেতনাকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংগঠিত করেছে।

আমরা আগেই বলেছি যে এই জাতিদাঙ্গা বিশেষ কোন অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়, কম বেশী প্রায় সব অঞ্চলেই দেখা যাচ্ছে। বলাবাহুল্য এর একটামাত্র ব্যাখ্যা নেই, কারণ অনেকাংশে এটা আঞ্চলিক অবস্থা, ইতিহাস, সমাজ-পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। তবুও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে দেখা যায়। প্রথমত

আমরা দেখি যে জাতিদাঙ্গার ঘটনা বড় আকারে আরম্ভ হয় সত্তর দশকের প্রারম্ভে। এই সত্তর দশকের শুরুতেই সরকারী বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, শিক্ষানীতি, 'সবুজ বিপ্লব', ইত্যাদির ফল কি হয়েছে তার চেহারা পরিষ্কার হয়ে যায়। আবার এই সত্তর দশকেই ৪৭-উত্তর নতুন প্রজন্ম প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠে। আমরা দেখতে পাই প্রথম অতিশূদ্রদের প্রতিরোধ ও লড়াই আরম্ভ হয় 'সবুজ বিপ্লব' অঞ্চলে, গোদাবরী-তুঙ্গভদ্রা ডেল্টায়, থাঞ্জাভুর, পঞ্জাবে। এইসব অঞ্চলে কৃষির উন্নতির ফলে ক্ষেতমজুরদের চাহিদাও বেড়ে যায়। ১৯৬৯ সালে থাঞ্জাভুরে ৪২ জন অতিশূদ্রকে পুড়িয়ে মারা হয়, ১৯৭২-৭৩-এ উত্তরপ্রদেশে বেশ কিছু অতিশূদ্রের বাড়ী ধ্বংস করা হয়; কারণ ছিল—ক্র্যাশ এমপ্লয়মেণ্ট প্রোগ্রামে ঐ অঞ্চলে ক্ষেতমজুরদের প্রতিমাসে ১০০ টাকা রোজগারের ব্যবস্থার ফলে ক্ষেতমজুররা বেশী মজুরীর দাবী করে, যার ফলে জাঠ এবং ঠাকুর ধনীচাষীদের হাতে তাদের মার খেতে হয়। ১৯৭৩ থেকে অতিশূদ্রদের প্রতি অত্যাচারের ঘটনা বেড়েই যেতে থাকে। ১৯৭৩ সালে যার সংখ্যা ছিল ৬,১৮৬, ১৯৭৪ সালে তা হয়ে দাঁড়ায় ৮,৮৬০ এবং ১৯৭৭ সালে ৮,৮৭২। এপ্রিল ১৯৭৭ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ অবধি ১৭,৭৭৫টি অত্যাচারের কেস রিপোর্ট হয়। যার মধ্যে ৭,৪৪৮টি কেস হয় উত্তরপ্রদেশে, ৪,৯৫১টি মধ্যপ্রদেশে এবং ১,৬৪৬টি বিহারের। এই অত্যাচার বা অতিশূদ্র-বর্ণহিন্দুদের মধ্যে সংঘর্ষ সাধারণভাবে জাতিভেদ নীতিকে আশ্রয় করে হয়নি, বরং বিভিন্ন অর্থনৈতিক কারণে হয়েছে—যদিও এই সংঘর্ষ অনেক সময় জাতিসংঘর্ষের রূপ নিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে চাষী-জাতিদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। চাষী-জাতি হল তারা যারা সাধারণত চাষবাসের কাজ বহুদিন যাবত করে আসছে—যেমন পশ্চিমবঙ্গে সদ্গোপ বা মাহিষ্য। ভারতবর্ষে নানা অঞ্চলে কৃষি আধুনিকীকরণ এবং 'সবুজ বিপ্লবের' ফলে এই চাষী-জাতিরা শুধুমাত্র নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতিই করেনি, রাজনৈতিক শক্তি হিসেবেও দেখা দিয়েছে। জাঠ, আহির, যাদব, কুর্মি, কোয়েরি, গুর্জর প্রভৃতি চাষী-জাতিদের স্থান ব্রাহ্মণ, বেনে, ভূমিহার, কায়স্থ প্রভৃতির নিচে। যেহেতু সংবিধান অনুযায়ী সবচেয়ে পশ্চাৎবর্গ জাতি হল তপশীলভুক্ত জাতিরা, সেইজন্য তাদের 'অন্যান্য পশ্চাৎবর্গ জাতি' হিসাবে গণ্য করা হয়। বিভিন্ন ভূমি-সংস্কার আইনের ফলে (তার প্রয়োগ যতই খাপছাড়াভাবে হয়ে থাকুক) উঁচুজাতির জমিদার-তালুকদার শ্রেণীর হাত থেকে জমি এই 'অন্যান্য পশ্চাৎবর্গ জাতির' হাতে চলে আসে। উচু জাতির লোকেরা শহরাঞ্চলে বিভিন্ন চাকরি, ব্যবসা ইত্যাদিতে যোগ দিতে আরম্ভ করে। ১৯৬০ সালের পরে নতুন কৃষি-কলাকৌশল, উচ্চফলনশীল বীজ, সেচের বিকাশের ফলে এই চাষীজাতিরাই সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়। ফলে আমরা দেখি যে মহারাষ্ট্রে মারাঠা, গুজরাটে পটিদার, উত্তরপ্রদেশ-বিহারে যাদব, আহির, পঞ্জাব-হরিয়ানায় জাঠ, অন্ধ্রপ্রদেশে কাম্মা, রেড্ডী প্রভৃতি জাতিরা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতিই করেনি, রাজনীতিতেও ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে। একইসঙ্গে

আমরা দেখি যে জমির উৎপাদনক্ষমতা বাড়লেও ক্ষেতমজুরদের মজুরী সেই অনুপাতে বাড়েনি। অনেক জায়গায় এমনকি কমে গেছে। ফলে বেশী মজুরীর দাবিকে এই সকল ধনীচাষীরা একধরণের জাতিসংঘর্ষের রূপ দেয় এবং জাতিভেদ নীতিকে কাজে লাগায়।

১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯-র মধ্যে ঘটেছে এরকম ৪০টি জাতিদাঙ্গার এক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ২৫টি দাঙ্গায় জমি বা মজুরী ছিল প্রাথমিক সমস্যা। জমির চাহিদা ছিল মূলত উদ্বৃত্ত জমির চাহিদা, বা ভাগীদারের জমির চাহিদা, বেশ কিছু জায়গায় ন্যূনতম মজুরী বা বেশী মজুরীর দাবিতে দাঙ্গা আরম্ভ হয়। ৬টি দাঙ্গা হয় স্পৃশ্যতা-অস্পৃশ্যতার প্রশ্নে, এবং বাকীগুলিতে জাতি-শ্রেণী দুই ধরণের সমস্যাই মিলিয়ে ছিল।[২৫] যাজ্ঞাওয়ালায় যেমন গোচর জমির পুনর্বণ্টনের প্রশ্নে দাঙ্গা আরম্ভ হয়। বেলচি, বিশ্রামপুর, বাজিতপুর প্রভৃতি স্থানেও দাঙ্গার কারণ ছিল জমি। বেলচিতে কুর্মি, বাজিতপুরে ভূমিহার, যাজ্ঞাওয়ালায় জাঠ এরাই অতিশূদ্রদের উপর আক্রমণ করে। মারাঠাওয়াড়ায় মারাঠাদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল সেইসব মাহার যারা সরকারি জমি পেয়েছে বা চাকরি করে নিজের অবস্থার উন্নতি করেছে। কর্নাটকে আমুঙ্গ এবং কোডমে ভূমিসংস্কার এবং ভাগীদারের জমির দাবির প্রশ্নই প্রধান ছিল। এইরকম উদাহরণ আর না বাড়িয়ে সংক্ষেপে বলা যায় যে জাতির চেয়ে শ্রেণীগত প্রশ্নেই দাঙ্গা হয়েছে বেশী।

ভূমিসংস্কার এবং কৃষি আধুনিকীকরণের ফলে জাতিসম্পর্কের পরিবর্তনের কথা আমরা একটু আগেই আলোচনা করেছি। এখন দেখা যাক অতিশূদ্র জাতিদের মধ্যে ১৯৪৭-এর পরে কি ধরনের পরিবর্তন এসেছে। এদের মধ্যে যেখানে ১৯৬১তে ক্ষেতমজুর ছিল শতকরা ৩৪ জন, ১৯৭১-এ তা বেড়ে হয়েছে শতকরা ৫২ জন। ১৯৭১-এর সেন্সাস অনুযায়ী এদের কর্মরত জনসংখ্যার শতকরা ২৮ জন নিজের জমি বা পরের জমি চাষ করে; ১৯৬১ সালে এই সংখ্যা ছিল শতকরা ৩৮ জন। সাধারণ জনসংখ্যার শতকরা ৪৩জন হল চাষী। আমরা আগেই বলেছি ভূমিসংস্কারের ফলে উঁচু জাতির জমিদারদের কিছু জমি গেছে, কিন্তু লাভবান হয়েছে মাঝারি শ্রেণীর চাষী-জাতিরা। ১৯৬০ সালে উত্তরপ্রদেশে পরিচালিত এক সমীক্ষায় আমরা দেখি ১৯৫১ সালের ভূমিসংস্কারের পরের দশবছরে অতিশূদ্র জাতির শতকরা ৬জন মাত্র জমি কিনতে পেরেছে, যেখানে উঁচু জাতির মধ্যে জমি কিনেছে শতকরা ৫৫জন এবং মাঝারি জাতির মধ্যে শতকরা ৬১জন।[২৬] কৃষি আধুনিকীকরণে গরীবেরা কোন লাভ করতে পারেনি। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৫-এর মধ্যে ক্ষেতমজুরদের গড় বেতন বেড়েছে ১২৭%, ঐ একই সময়ে ভোগ্যদ্রব্যমূল্যের সূচক বেড়েছে ১৫৭%, ফলে একজন ক্ষেতমজুরের ক্রয়ক্ষমতা কমেছে ১২% হারে।[২৭]

শিক্ষার হার অতিশূদ্রদের মধ্যে বেড়েছে। ১৯৩১ সালে যাদের শিক্ষার হার

ছিল ২%, ১৯৬১ সালে তা হয়েছে ১০·৩% এবং ১৯৭১ সালে ১৪·৭%। সাধারণ জনসংখ্যার শিক্ষার হার ১৯৬১ এবং ১৯৭১-এ যথাক্রমে ছিল ২৪% এবং ২৯·৫%। অর্থাৎ ১০ বছরে যেখানে অতিশূদ্রদের শিক্ষার হার বেড়েছে ৪·৪% হারে সেখানে সাধারণ জনসংখ্যার শিক্ষার হার বেড়েছে ৫·৫% হারে। আমরা আগেই বলেছি অতিশূদ্র জাতিরা সমজাতিক সমষ্টি নয়, বিভিন্ন অর্থনৈতিক এবং সামাজিক স্তরে বিভক্ত। অতিশূদ্রদের শিক্ষার হার যেমন বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন, সেইরকম একই রাজ্যে বিভিন্ন অতিশূদ্র জাতির মধ্যে শিক্ষার হার ভিন্ন। রাজ্য হিসাবে ভাগ করলে আমরা দেখি ১৯৭১-এ কেরালায় অতিশূদ্রদের শিক্ষার হার ছিল ৪০·২%, গুজরাটে ২৭·৭%, মহারাষ্ট্রে ২৫·৩% তামিলনাড়ুতে ২১·৮% অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে ১৭·৮%, অন্ধ্রপ্রদেশে ১০·৭%, উত্তরপ্রদেশে ১০·২% এবং বিহারে ৬·৫%। আবার রাজ্যের মধ্যে অতিশূদ্র জাতিগুলিকে ভাগ করলে আমরা দেখি গুজরাটে মায়াবংশীদের মধ্যে শিক্ষিতের হার হল ৩৩·৩%, মহারাষ্ট্রে মাহারদের মধ্যে ২৬·৫% কেরালায় পুলায়াদের মধ্যে ৪৬·২,% তামিলনাড়ুতে আদি দ্রাবিড়ের মধ্যে ২৪·৭%, পশ্চিমবঙ্গে নমশূদ্রদের মধ্যে ২৬·৯%, ইত্যাদি।[২৮] এই সকল অতিশূদ্র জাতি বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এবং আবেদন দরখাস্ত করে নিজেদের সামাজিক মর্যাদার উন্নতিসাধনের চেষ্টা বহুদিন থেকেই করছে। যেমন আদি দ্রাবিড়রা ব্রাহ্মণ বিরোধী আন্দোলন বহুদিন যাবৎ করে আসছে, মাহাররা আম্বেদকরের নেতৃত্বে আন্দোলন করে এবং পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে, পশ্চিমবঙ্গে নমশূদ্রদের মধ্যেও এই শতকের প্রথম থেকে নিজেদের সামাজিক মর্যাদার উন্নতিসাধনের চেষ্টা দেখা যায়। এই জাতিভিত্তিক আন্দোলন কিছুটা শিক্ষার প্রসার এবং অর্থনৈতিক উন্নতির ফলশ্রুতি হিসেবেই আরম্ভ হয়। প্রথম যখন জনগণনা আরম্ভ হয় তখন থেকেই বিভিন্ন জাতিরা তাদের সামাজিক অবস্থান যা ছিল তার উঁচু হিসেবে নিজেদের তালিকাভুক্ত করতে চায়। ওম্যালী লিখেছেন, ১৯১১-র জনগণনার সময় বাংলায় সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল যে এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন জাতির সামাজিক অবস্থান নির্ধারণ করা।[২৯] বহুজাতিই নিজেদের জাতিনাম বদলে দেবার আবেদন করে এবং অনেকেই এতে সার্থক হয়। এই প্রক্রিয়া সমস্ত ভারতবর্ষেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে দেখা যায়। এখানে উদাহরণ স্বরূপ আমরা নমশূদ্রদের কথা বলব। ১৯১১ সালের জনগণনার সময় যারা চণ্ডাল ছিল তারা নমশূদ্র নামের দাবি করে এবং তাদের সেই দাবি গৃহীত হয়। ১৯২১ এবং ১৯৩১ তারা আবার নমশূদ্র-ব্রাহ্মণ নাম দাবি করে। সেই রকম চাষী কৈবর্তরা ১৯১১-য় মাহিষ্য নাম দাবি করে এবং ১৯৩১-এ মাহিষ্য ক্ষত্রিয় নাম।[৩০] ব্রাহ্মণ্য জীবনযাত্রার অনুকরণে নিজেদের সামাজিক মর্যাদার উন্নতি-সাধনের চেষ্টা অনেক জাতির মধ্যেই দেখা গেছে। নির্মলকুমার বসু যেমন লিখেছেন :

…শিক্ষালাভের পরে বর্ণহিন্দুদের নিকট অপমানের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নমশূদ্রগণ

হিন্দুসমাজ হইতে পৃথকজাতি এবং গভর্ণমেণ্টের বিশেষভাবে অনুগ্রহের পাত্র বলিয়া দাবি জানান।

শ্রীরাইচরণ বিশ্বাস নামে জনৈক ব্যক্তি নমশূদ্র সুহৃদ (জানুয়ারি, খৃঃ ১৯০৮) পত্রিকায় লেখেন ঃ

আমরা ব্রাহ্মণের জাতি, হিংসাহেতু হউক বা ক্রোধবশত হউক, আমাদিগকে অনেকে না ভালবাসিতে পারেন, কিন্তু যুগান্তর ধরিয়া আমাদের ব্রাহ্মণোচিত আচার-ব্যবহার দেখিয়া সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন-যে, নমশূদ্র জাতি প্রাচীন মুনিঋষির অর্থাৎ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের সন্তান। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমাদের জীবিকানির্বাহের উপায় আর্য কৃষিকার্য, সেই প্রাচীন ও বর্তমান সময়ের মহা গৌরবের ব্যবসায়।[৩১]

আগে এই জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রচলন ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের দাবির সঙ্গে সঙ্গে বিধবাবিবাহ নিরোধেরও একটা আন্দোলন দেখা দিল। ঐ একই সঙ্গে শিক্ষার দাবিও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। বাংলাদেশে যোগী জাতি এবং কৈবর্ত জাতিও এইভাবে নিজেদের সামাজিক মর্যাদার উন্নতির চেষ্টা করে। শুধুমাত্র বাংলাদেশই নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যেও বহু জাতি এই একই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেদের সামাজিক মর্যাদার উন্নতির চেষ্টা চালাচ্ছিল যাকে শ্রীনিবাস সাংস্কৃতায়ন (sanskritization) প্রক্রিয়া বলেছেন। আমরা আগেই বলেছি এই সাংস্কৃতায়নের প্রক্রিয়া কোনভাবেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। এদের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাদীক্ষালাভ করে চাকরি পাওয়া, আর্থিক উন্নতি এবং জাতিগত অর্থে সামাজিক মর্যাদা বাড়ানো। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যোগী জাতি দ্বারা প্রকাশিত 'যোগীসখা'য় লেখা হয়েছিল ঃ

আমরা এই ঘোর দুর্দিনে পিতৃস্বরূপ রাজার কার্যে সকলে আত্মদান করিতে পারিব না, কিন্তু যাঁহারা প্রাণ দিতে যাইতেছেন, তাঁহাদের সাহায্য করা কর্তব্য। গভর্ণমেণ্ট জানেন আমরা অতি নিরীহ রাজভক্ত। রাজভক্তি প্রকাশের এমন সুবিধা আর হইবে না।[৩২]

১৯১৫ সালে ঐ পত্রিকায় আবার লেখা হয় ঃ

দরিদ্র যোগী জাতি চিরকাল রাজভক্ত, রাজার মঙ্গল কামনাই আমাদের মূলমন্ত্র ···আমরা ইংরাজের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।[৩৩]

নমশূদ্র জাতির পক্ষ থেকে ১৯১৬ সালের 'পতাকা' পত্রিকায় লেখা হয় ঃ ব্রিটিশ রাজের কৃপায় যাহা একটু জ্ঞানকণা লাভ করিয়াছি, তাহার দ্বারাই এখন জানিতে সমর্থ হইয়াছি—আমরা কি ও আমাদের শক্তি কতটুকু।···হিন্দুসমাজের অন্ধ হিন্দুরাজের কৃপায় আমরা এতদিন ঘুমাইয়া ছিলাম। তখন জাতিভেদজ্ঞানশূন্য সমদর্শী বিপুল শক্তিশালী ব্রিটিশের কৃপায় জাগিলাম। ক্ষুদ্রচিত্ত ব্রাহ্মণকৃত আইনের শাসনে বাধ্য হইয়া আমাদের বাণী মন্দিরের চতুঃসীমানায়ও যাইতে দিতেন না।

তোমার চিন্তা করিবার কি আছে ? স্বয়ং ব্রিটিশরাজ অশিক্ষিতের বন্ধু, দরিদ্রের চিরসহায়, অনুন্নত জাতি সমূহের আশাভরসা তোমার সহায় হইবেন।[৩৪]

ভারতবর্ষে অন্যান্য রাজ্যে যে সকল জাতি নিজেদের সামাজিক মর্যাদা উন্নতির প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল তাদের ইংরেজের প্রতি আচরণ নমশূদ্র বা যোগী জাতি থেকে ভিন্ন ছিল না। বিভিন্ন জাতির মধ্যে সামাজিক গতিশীলতার প্রকাশ হয়েছিল ঃ (১) ব্রাহ্মণের আচার অনুকরণ যেমন নিরামিষ আহার, বিধবাবিবাহ নিরোধ, ইত্যাদির মাধ্যমে, (২) শিক্ষাদীক্ষালাভ এবং আর্থিক উন্নতির চেষ্টায় এবং (৩) এই সুযোগ-সুবিধা পাবার জন্য ইংরেজের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রকাশে। জাতি আন্দোলনের এই সংকীর্ণতার জন্যই যে সকল জাতি এই প্রচেষ্টাব ফলে নিজেদের সামাজিক মর্যাদা বাড়াতে সক্ষম হয় তারা সকলেই কিন্তু তাদের নিম্নতর জাতিদের প্রতি সেই একই ব্যবহার করতে থাকে, যে ব্যবহার তারা তাদের উচ্চতর জাতি থেকে পেতে অভ্যস্ত ছিল। তারা স্পৃশ্যতা, অস্পৃশ্যতা, সামাজিক দূরত্ব, বিবাহ, প্রভৃতির ব্যাপারে নিম্নতর জাতির প্রতি একই ভেদভাবনীতি প্রদর্শন করে। অস্পৃশ্যদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা এই জাতিপ্রথার এক নির্মম সত্য, যার ফলে অতিশূদ্র জাতিরা কোনদিনই এক হতে পারেনি এবং আজকের জাতিদাঙ্গায় তার ফল হয়েছে ভয়ঙ্কর। আজকের দিনে শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে অতিশূদ্রদের মধ্যে যারা চাকরি করছে অর্থাৎ যাদের 'হরিজন এলিট' বলা হয়, তারাও দেখা গেছে আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের অনুন্নত জাতির মানুষদের থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়েছে যেন তারা একধরনের 'বিস্মরণের' রোগে ভুগছে।[৩৫] মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট যেখানে অতিশূদ্রদের মধ্যে শিক্ষার হার খুব বেশী, বিশেষত মাহার এবং মায়াবংশী জাতির জন্য, সেখানে নানারকম 'দলিত' সংগঠন দেখা দিয়েছে—কিন্তু এই সংগঠনগুলির অধিকাংশ সদস্যই চাকরীজীবী এবং দাবি দাওয়াও এই চাকরি-বাকরি সংক্রান্ত সমস্যার উপর নির্ভর।[৩৬] অথচ এই এলিট শ্রেণীই আসন সংরক্ষণ এবং সরকার থেকে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে সবচেয়ে বেশী আগ্রহী। দাবিদাওয়া করার সময় যদিও তারা দেখাবার চেষ্টা করে যে তারা সমস্ত অতিশূদ্রজাতির প্রতিনিধিত্ব করছে, বলাবাহুল্য বাস্তবে কিন্তু তা নয়।

অতিশূদ্রজাতির গতিশীলতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে চাষীজাতির গতিশীলতার প্রশ্নও। আজকে যে জাতিদাঙ্গা হচ্ছে তা মূলত এই চাষীজাতি এবং অতিশূদ্র জাতির মধ্যে। আজকের গ্রামে ক্ষমতাবান চাষীজাতি যারা তারা প্রজাস্বত্বভোগী চাষী থেকে গত পঞ্চাশ বছরে ধনীচাষী হয়েছে উঁচুজাতির জমিদারের বিরুদ্ধে লড়াই করে।[৩৭] বিহারে আহির, কুর্মি, গুজরাটে পাটিদার, এদের সকলের ইতিহাস ঐ একই। আমরা আগেই বলেছি এই চাষীজাতিগুলির মধ্যে গতিশীলতার সঙ্গে সঙ্গে সমস্তর সমৈক্যতা (horizontal solidarity) বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের জাতি নিয়ে একধরনের জাতিরক গড়ে ওঠে। বিহারে ত্রিবেণী' সঙ্ঘ যেমন আহির,

কুর্মি এবং কোয়েরিদের নিয়ে তৈরী হয়। এই ত্রিবেণী সংঘ জমিদারদের বিরুদ্ধে এবং প্রজাস্বত্বভোগীদের স্বার্থে আন্দোলন করে। এই সংঘকে আমরা একধরনের শ্রেণী সংগঠনের প্রাথমিক অবস্থা বলতে পারি, কিন্তু আগেই বলেছি ঔপনিবেশিক অর্থনীতি এবং পুঁজিবাদের অসমান বিকাশের ফলে এইধরনের শ্রেণী সংগঠনের বিকাশ আটকে যায়, জাতি এবং জাতিস্বার্থ প্রধান হয়ে ওঠে। এই জাতি তাদের প্রাক্তন সংগ্রামের ভিত্তিতে আজকে অতিশূদ্রদের যে-কোন ধরনের দাবিদাওয়ার প্রতিরোধ করছে। এবং অনেক ক্ষেত্রেই জাতিদাঙ্গার রূপ নিচ্ছে।

আজকের গ্রামাঞ্চলে যে জাতিদাঙ্গা তার কারণ হিসাবে আমরা তাহলে দেখতে পাই চাষী-জাতির ধনী চাষীর সঙ্গে অতিশূদ্রজাতির প্রান্তিক চাষী বা ক্ষেত-মজুরের লড়াই। যার কারণ মূলত অর্থনৈতিক, যদিও বিভিন্ন স্বার্থ বিভিন্ন জাতি সেণ্টিমেণ্টকে এতে ব্যবহার করেছে। শহরাঞ্চলে যে জাতিদাঙ্গা হচ্ছে তা অতিশূদ্র জাতির সামাজিক গতিশীলতার সঙ্গে সম্পর্কিত। আমরা আগেই দেখেছি বিভিন্ন রাজ্যে অন্তত একটি বা দুটি অতিশূদ্রজাতি শিক্ষায় অনেকটা এগিয়ে গেছে। তাদের মধ্যে শহরাঞ্চলে বসবাসকারীর সংখ্যাও বেড়েছে—অথচ ঐ একই সঙ্গে চাকরির বাজার ক্রমেই সঙ্কুচিত হচ্ছে, বেকারীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে, বিভিন্ন পেশাগত কোর্সে ভর্তির জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা এবং জাতীয় উৎপাদনের হার গত ১৫ বছরে নামমাত্র। এই অবস্থায় যে কোন ধরনের চাকরি বা পেশাগত কোর্সের সংরক্ষণ উঁচুজাতি অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে একধরনের অসন্তোষের সৃষ্টি করছে। আমাদের মনে রাখতে হবে এতদিন অবধি আমাদের দেশে ভাল চাকরি উঁচুজাতির লোকেদেরই একচেটিয়া ছিল এবং আজকেও বহুলাংশে তাই। এই উঁচুজাতিগুলির মধ্যে শিক্ষাদীক্ষার প্রচলন হয় সবচেয়ে আগে এবং এরাই তার ফলে সরকারি এবং বেসরকারি চাকরি পেতে থাকে। আমাদের দেশে চাকরিতে নিয়োগের ব্যাপারে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা জাতি সম্পর্কের ভূমিকা বরাবরই ছিল, ফলে এই জাতিরা সমস্ত চাকরি প্রায় নিজেদের একচেটিয়া করে ফেলে। আজকে সংরক্ষণ নীতির ফলে—তার ফল যত সামান্যই হোক না কেন—এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের আক্রান্ত মনে করছে এবং এই শ্রেণীর মধ্যে এমন এক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে যে তারা অতিশূদ্রদের মধ্যে যারা গতিশীল তাদের নিজেদের শত্রু মনে করছে। মহারাষ্ট্রে মারাঠাওয়াড়ায় আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল সেইসব মাহার যারা চাকরিজীবী, শিক্ষিত এবং সেইসব অঞ্চলেই এই দাঙ্গা বেশী হয় যে-সব অঞ্চলে মাহারদের শিক্ষার হার বেশী, তাদের অবস্থা স্বচ্ছল। গুজরাটে সাম্প্রতিক দাঙ্গাতেও দেখতে পাই যে আক্রমণের লক্ষ্য ছিল মায়াবংশী জাতি, যাদের শিক্ষার হার বেশী, শহুরে এবং চাকরিজীবী।[৩৮] গুজরাটেও সেইসব অঞ্চলেই দাঙ্গা হয় যে-সব অঞ্চলে এই জাতির লোকেদের শিক্ষার হার বেশী. অর্থাৎ এই সংঘর্ষ যদিও জাতিসংঘর্ষের রূপ নিচ্ছে কিন্তু এর মূল কারণ সেই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক।

অন্যদিকে এই যে গতিশীল অতিশূদ্রজাতিরা তাদের ভেদভাবনীতি বর্জন করেনি, তা আমরা আগেই দেখেছি। ফলে এদের প্রতি যখন আক্রমণ হয়েছে তখন নিম্নতর জাতিরা এদের সঙ্গে যোগ দিতে অস্বীকার করেছে। মারাঠাওয়াড়ায় যখন মাহারদের প্রতি আক্রমণ হয় তখন মাঙ্গজাতিরা মাহারদের সঙ্গে যোগ দিতে অস্বীকার করে—এমনকি তারা নিজেদের বাড়ীর দেওয়ালে বড় বড় অক্ষরে লিখে দেয়: 'এ বাড়ীতে মাঙ্গ বাস করে,"; গুজরাটের জাতিদাঙ্গায় 'দলিত প্যান্থার' গোষ্ঠী যখন তাদের প্রতিবাদ মিছিলে ভঙ্গীদের (যারা সাধারণত আহমেদাবাদ শহরে মেথরের কাজ করে) যোগ দিতে বলে এবং তাদের কাজে যেতে বারণ করে—ভঙ্গীরা সেই আবেদন অগ্রাহ্য করে এবং সকলে কাজে যায়। তারা বলে যে 'দলিত প্যান্থাররা' তাদের জন্য কিছুই করেনি এবং মায়াবংশী জাতি—যাদের নিয়েই 'দলিত প্যান্থার' গঠিত—চিরদিনই ভঙ্গীদের অস্পৃশ্য জাতি হিসেবে দূরে সরিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ জাতিপ্রথা একভাবে সমশ্রেণীর বিভক্তিকরণের কাজ করছে। ঠিক একইভাবে শ্রমিক শ্রেণীকে জাতির প্রশ্নে বিভক্ত করার চেষ্টাও চলেছে এবং অনেক জায়গায় সার্থক হয়েছে। এইখানেই শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতির ব্যর্থতা।

এর ফলে আমরা যদি ভাবি জাতিই হল আসল, শ্রেণী এবং অর্থনীতি কিছু নয়—তাহলে কিন্তু ভুল হবে। অর্থনৈতিক সংকট, বেকারী, কৃষিতে উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন এবং অতিশূদ্র জাতির সামাজিক গতিশীলতার কারণে সমাজে এমন এক সংকট উপস্থিত হয়েছে যার প্রতিফলন জাতিদাঙ্গা ও সাম্প্রতিক দাঙ্গার রূপে দেখা যাচ্ছে। এর ফলেই অনেকে তাত্ত্বিকভাবে একধরনের চরম স্থান নিয়েছেন যে জাতি, ধর্ম, এইগুলি হল আদিম সম্বন্ধ (primordial affiliation) এবং এই সমস্যার বিচার করতে হবে রেস, ট্রাইব, বা জাতিকে ভিত্তি করেই। আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তন, শ্রেণী বিশ্লেষণ এবং উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তনই আজকে এই সমস্যার উপর আলোকপাত করতে পারবে। অবশ্যই এই বিচার করতে গিয়ে আমরা ভারতবর্ষের বিশেষ ঐতিহাসিক এবং সামাজিক অবস্থা নিশ্চয়ই ভুলে যাব না।

নির্দেশিকা:

১। সরকারি মতে যারা তপশীলভুক্ত জাতি, তাদের হরিজন, দলিত, অস্পৃশ্য জাতি ইত্যাদিও বলা হয়ে থাকে। অন্য কোন বিশেষ কারণ না থাকলেও, আমরা এই প্রবন্ধে অতিশূদ্রজাতি কথাটা ব্যবহার করেছি, মূলত শ্রেণী থেকে জাতির পার্থক্য টানবার জন্য। দলিত বলতে অনেক সময় শ্রেণী বোঝায় এবং হরিজন কথাটি গান্ধী এক বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন। অস্পৃশ্য জাতি কথাটা আমাদের পছন্দ নয়।

২। কোসাম্বির মতে এই সূক্ত পরের সংযোজন। তবুও হিন্দুমতে এইটাই জাতির

ব্যাখ্যা হিসেবে প্রচলিত। দ্রষ্টব্য : D. D. Kosambi, An Introduction to the Study of Indian History, Bombay, Popular Book Depot, 1956, পৃ: ১০২

৩। Herbert H. Risley, The People of India, Calcutta, Thackers, Spink & Co, 1908, পৃ: ২৬৪-২৬৫.

৪। Max Webers, The Religion of India : The Sociology of Hinduism and Buddhism, Goenco, III, Free Press, 1958, পৃ: ১২৪-১২৬

৫। Denzic C. J. Ibbetson, Punjab States, Lahore, Superintendent of Govt. Printing, 1916

৬। Henry S. Maine, Village Communities in the East and West, London, John Murray, 1871

৭। John C. Nesfield, Brief view of the caste system of the North Western provinces and Oudh, together with an examination of the names and figures shown in the Census Report, 1885, Allahabad, NWP and Oudh Press, 1885

৮। Emile Senart, Caste in India : The facts and the System, London, Methuen, 1930 (ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত ১৮৯৬ সালে)

৯। Harold A. Goneel, Caste and Class : A comparative view, Module II, Addison Wesley Modular Publications, 1971

১০। যাঁরা এই বিভিন্ন তত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী তাঁরা এই দুটি বই দেখতে পারেন : J. H. Hutton, Caste in India : Its Nature, Function, and Origins, Bombay, Oxford, 1969. (প্রথম প্রকাশিত ১৯৪৬) এবং N. K. Dutt, Origin and Growth of Caste in India, Calcutta, Firma KLM, 1968 (২য় সংস্করণ, প্রথম প্রকাশ ১৯৩০)

১১। Iravati Karve, Hindu Society : An Interpretation, Poona, Decan College ; 1961, G. S. Ghurye, Caste and Class in India, Bombay, Popular Book Depot, 1950 ; Morton Klass, Caste : The Emergence of South Asian Social System, Philadelphia, ISHI, 1980

১২। K. Marx, "Wage Labours and Capital", Selected Works, Moscow, Progress Publishers, 1968, পৃ: ৮১

১৩। নির্মলকুমার বসু, হিন্দুসমাজের গড়ন, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬, পৃ: ১৩৩

১৪। ঐ, পৃ: ১২২-২৩

১৫। K. Marx, Future Results of British Rule in India, 'the First Indian War of Independence 1857-1859, Moscow, Progress Publishers, 1959, পৃ: ৩৪

১৬। R. Palme Dutta, India Today, Bombay, PPH, 1949, পৃ: ২৭৫

১৭। A. R. Desai, Social Background of Indian Nationalism, Bombay, Popular Prakashan, 1966 (৪র্থ সংস্করণ, প্রথম প্রকাশিত ১৯৪৮) পৃ: ২৪১-২৬২

১৮। M. N. Srinivas, Caste in Modern India and other Essays, Bombay, Asia Publishing House, 1962, পৃ: ৭০-৭৭

১৯। ঐ, পৃ: ৭৫

২০। এই বিষয়ে দ্রষ্টব্য: Karnataka Dalit Action Committee, Dalit Charter of Demands, Bangalore, November 1980 : V. Rajshekhar Shetty, How Marx Failed in Hindu India, Bangalore Dalit Sahitya Academy, 1980 ; ঐ একই লেখকের : How to Destroy Caste System : Strategy for Revolution, Bangalore : 1981 ; এছাড়া এ বিষয়ে প্রকাশিত মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের দলিত প্যান্থার গোষ্ঠীর বিভিন্ন প্যামফ্লেট।

২১। দ্রষ্টব্য: Gail Omvedt, "Class struggle or Caste war ?" Frontier, Sept. 30, 1978 ; Nalini Pandit, "Caste and Class in Maharastra." Economic and Political Weekly, February, 1979 ; 'Caste and Class,' Frontier, June 9, 1979.

২২। Arun Sinha, 'Class war not 'Atrocities' against Harijans,' EPW, Dec. 10, 1977, 'Advancing Class Interests in the name of caste,' EPW, April 22, 1978

২৩। K. Marx, Capital, vol I, Moscow, Progress Publishers, 1961, পৃ: ৩৭২

২৪। Pravin Sheth, 'In the countryside', Seminar, November, 1979

২৫। ঐ

২৬। Baljit Singh and Shridhar Mishra, A study of Land Reforms in Uttarpradesh, Honolulu, East-West Centre, 1965, পৃ: ২৫৯

২৭। দ্রষ্টব্য: 'Agricultural Labour ; Getting Poorer,' EPW, Oct 14, 1978.

২৮। দ্রষ্টব্য : Census of India, 1971 : Scheduled castes and Scheduled Tribes, Delhi, Govt of India Press, 1975

২৯। L. S. S. Omally, Bengal, Bihar, Orissa and Sikkim Census Report, Calcutta, Supdt. of Govt. Printing, 1911

৩০। M. N. Srinivas, Social Change in Modern India, Bombay, Orient Longman, 1966, পৃঃ ৯৭

৩১। নির্মলকুমার বসু, হিন্দুসমাজের গড়ন, পৃঃ ১৪১

৩২। ঐ, পৃঃ ১৩৭

৩৩। ঐ, পৃঃ ১৩৭

৩৪। ঐ, পৃঃ ১৪২

৩৫। Sachchidananda, The Harijan Elite : A study of their status, networks, mobility and role in rocial transformation, Faridabad, Thomson Press, 1977

৩৬। E. J. Mahishi and Dhiru B. Deshai 'Dalit Panther Movement in Gujarat,' in V.P. Shab(ed) Removal of untouchability, Ahmedabad, Gujarat Univ., 1980

৩৭। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : Anjan Ghosh, 'Caste collisions,' Seminar, June, 1980

৩৮। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি : Pradipkumar Bose, 'Social Mobility and Caste Violence : A Study of the Gujarat Riots,' EPW, April 18, 1981.

সাম্প্রতিক ভারতে জাত ও শ্রেণী

অঞ্জন ঘোষ

জাতপ্রথা ভারতের উন্নতির প্রতিবন্ধক কিনা এ বিষয়ে মতভেদ আছে। যাঁরা মনে করেন আমাদের সব কিছু আধুনিক সময়ের উপযোগী করে তোলা দরকার তাঁদের মত এই যে, জাতের বৈশিষ্ট্য (যথা—জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট জীবিকা ও সামাজিক মর্যাদার স্থায়ী বন্ধন) সামাজিক গতিহীনতা এবং সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীগত পরিচয় পরিবর্তনের পথে অন্তরায়স্বরূপ। এবার প্রকৃত অবস্থাটা এখন কিরকম সেটা বুঝে দেখা দরকার : জাত কি লোপ পেয়ে যাচ্ছে এবং জাতের জায়গায় মানুষের যোগ্যতা অনুযায়ী সমাজবিন্যাসের ফলে শ্রেণীর উদ্ভব হচ্ছে? তা হলে, বিচার্য বিষয় হল শ্রেণীগঠনের উপযোগী বাস্তব অবস্থা তৈরী হচ্ছে বলে জাতপ্রথা-ভিত্তিক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তে শ্রেণীভিত্তিক সমাজব্যবস্থার উন্মেষ হচ্ছে কিনা।

আর এক দল তাত্ত্বিক ভিন্ন যুক্তিতে জাতপ্রথার সঙ্গে উন্নতির সম্পর্ক আলোচনা করেছেন। এঁদের মতে জাতপ্রথা যে শুধু আগেকার পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল তাই নয়, জাতপ্রথা দ্বারা সমাজের আধুনিকীকরণের পথও নানাভাবে সুগম হতে পারে। বিভিন্ন জাতের নিজস্ব সংগঠন গড়ে উঠেছে। এইসব সংগঠনের কার্যকলাপের ফলে মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার প্রসার হয়েছে। এটাকে জাতপ্রথার একটা গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ক্রিয়া বলে ধরা যেতে পারে। জাতপ্রথার এই রাজনৈতিক দিকগুলির উপর যাঁরা জোর দিয়েছেন তাঁরা বলেন, জাতের সংগঠন-গুলি সমাজ ও সংস্কৃতির মৌলিক পরিবর্তনের পথে পূর্বতন ও আধুনিক সামাজিক সম্পর্কের মিলন ক্ষেত্র। জাতের এই ভূমিকা খুব উপযোগী। এঁরা বলছেন, জাতিভেদের শিকড় ভারতীয় সমাজের গভীরে প্রোথিত, ফলে নানা ধরনের জাত-সংগঠনের সহায়তা ছাড়া বৃহত্তর ভারতীয় জনগোষ্ঠীকে সময়োপযোগী করে তোলা সম্ভব নয়।

রজনী কোঠারী এই যুক্তিটাকে আরও প্রসারিত করে জাত কিভাবে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ল সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কোঠারী যথার্থই বলেছেন যে জাত ও রাজনীতি কখনও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল না, সম্প্রতিকালে জাত ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্কের প্রসঙ্গ ও চরিত্র বদলেছে। আগে যে-সব জাত (বিশেষতঃ মধ্যবর্তী পর্যায়ের অর্থাৎ উঁচু জাতের নীচে, কিন্তু নীচু জাতের উপরিস্থিত পর্যায়ের জাতসমূহ) রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল না এখন তারাও রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। এর ফলে রাজনীতিতে জাতের ভূমিকা বেড়েছে এবং জাতকে জড়িয়ে রাজনীতি করবার কৌশলও পালটেছে। জাত থেকে শ্রেণীতে উত্তরণ এই মতবাদ কোঠারী মানেন না। এই মতবাদ পরিহার করে তিনি বলছেন আধুনিক ভারতে জাত ও শ্রেণীর মিথষ্ক্রিয়া ঘটেছে উপর্যুপরি তিনটি পর্যায়ে। প্রথম

পর্যায়ে অগ্রগণ্য জাতরাই রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। উদাহরণস্বরূপ তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ, বিহারের কায়স্থ এবং বাঙলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের উল্লেখ করা যায়। এরা সর্বপ্রথম ইংরেজী শিক্ষালাভ করে বৃটিশ সরকারের অনুগ্রহভাজন হয় এবং অধস্তন হিসাবে ক্ষমতার অংশলাভ করে। এদের অগ্রগতি দেখে অপরাপর উচ্চতর ও মধ্যবর্তী পর্যায়ের জাতের মনে বঞ্চনাবোধ ও বিদ্বেষ সঞ্চার হয়। তাদের মনে হল যে তারা ভারি পেছনে পড়ে গেছে। এই বিশ্বাসে তারা যেটুকু সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় তাই দিয়ে আত্মোন্নতি করবার চেষ্টা করতে লাগল। এইসব 'উঠতি জাত' প্রধানতঃ স্বত্ববান কৃষক (যথা, মহারাষ্ট্রের মারাঠা, কুনবি, তামিলনাড়ুর ভেলাল্লা, নাদার, বিহারের ভূমিহার এবং বাঙলার মাহিষ্য)। দ্বিতীয় পর্যায়ে সুযোগ-সুবিধা এবং ক্ষমতার ভাগ নিয়ে 'উঠতি' জাতগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বের মধ্যে নিম্নতর জাতগুলি অনেক ক্ষেত্রে উচ্চতর জাতের নেতাদের সঙ্গে জুটে তাদের সমর্থন করতে লাগল। এতে করে জাত রাজনীতির সঙ্গে বেশী করে জড়িয়ে পড়তে লাগল। তৃতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভেদের নীতি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় সমাজে পরিবর্তন ঘটবে না। দ্যুমোর মত মানলে যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় ভারতে সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে তা অগ্রাহ্য করতে হয়। ঐতিহাসিক পরিস্থিতি বদলে গেলে ভারতীয় সমাজের প্রচলিত বিন্যাসে চিড় ধরেছে, পুনর্গঠন হয়েছে এবং পরিশেষে নূতনভাবে সমাজ বিন্যস্ত হয়েছে।

আজকাল কয়েকজন সমাজবিজ্ঞানী বলছেন, ভারতীয় সমাজে জাত লোপ পাচ্ছে, তার জায়গায় শ্রেণীর উন্মেষ হচ্ছে। এঁদের মত এই যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দরুন আধুনিকতার সূচনা হলেই জাত ভেঙে যাবে এবং লোকে শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত হবে। ঘনশ্যাম শাহ বলেছেন, বর্তমান ভারতে জাতের সঙ্গে উৎপাদনব্যবস্থার কোনরূপ সম্পর্ক নাই। ওয়ানদনা সোনালকর ও মোয়িন সাকের দেখাচ্ছেন যে অনগ্রসর অঞ্চলগুলির তুলনায় উন্নত অঞ্চলগুলিতে সামাজিক শ্রমবিভাগের দরুন জাতের ভূমিকা অনেকটা ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে। এইসব গবেষণার দ্বারা মার্কসবাদের সমাজবিবর্তন তত্ত্বের সারবত্তা আর একবার প্রমাণিত হল। কোন কোন মার্কসবাদী মনে করেন যে আগেকার পরিস্থিতিতে যেভাবে শ্রমবিভাগ করা হত তাতে জাতব্যবস্থা কার্যকর ছিল, কিন্তু আধুনিক কালে সমাজের বস্তুগত ভিত্তি যেভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তাতে জাত সম্পূর্ণরূপে অপ্রাসঙ্গিক; এ অবস্থায় জাত লোপ পাবেই, অনেক দিক দিয়ে ইতিমধ্যেই লোপ পেয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বস্তুগত পরিস্থিতির পরিবর্তন সত্ত্বেও জাত লোপ পায়নি। রাষ্ট্রের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা আদায় করার প্রশ্নে বা রাজনীতির ক্ষেত্রে মানুষকে সংঘবদ্ধ করার ব্যাপারে জাতের উপযোগিতা এখনও যথেষ্ট রয়েছে। তা হলে আজকের দিনে জাতের অর্থ ও তাৎপর্য কি?

সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতের তাৎপর্য যত কমছে, এর রাজনৈতিক গুরুত্ব ততই বাড়ছে। এই পরিবর্তনের সূচনা হয় বৃটিশ আমলে। বৃটিশ শাসন প্রবর্তনের ফলে ভারতে পাকাপোক্ত কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা এবং বাজারভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে শ্রেণীভিত্তিক সমাজব্যবস্থার সূচনা হল। জাতব্যবস্থায় সমাজ ছিল স্থানীয় পর্যায়ে ছোট ছোট পৃথক সংগঠনে বিভক্ত। বৃটিশ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রভাবে স্থানীয় পর্যায়ে আবদ্ধ জাতভিত্তিক সামাজিক সংগঠনগুলি ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগঠনের অন্তর্গত হয়ে গেল। এর পরিণাম লক্ষণীয়।

ভূমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা পত্তন এবং বৃটিশ বিচারব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে জাত-পঞ্চায়েতের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হয়ে যায়। বৃটিশ বিচারব্যবস্থায় সুবিধা পেল জমিদার-জোতদার শ্রেণী। সাধারণ লোকের কাছে বৃটিশ আইন বোধগম্য হত না। আইনের আশ্রয় নেওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ বৃটিশ বিচারব্যবস্থা হয়ে উঠল ভূস্বামীর হাতে দরিদ্র প্রজাকে পীড়ন করবার অস্ত্রস্বরূপ। বৃটিশ বিচার ব্যবস্থা সাধারণ লোকের অনধিগম্য বলে তারা আগের মতো বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য জাত-পঞ্চায়েতের উপর নির্ভর করতে লাগল। এই অবস্থায় বৃটিশ বিচারব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে জাত-পঞ্চায়েতের বিচারও চলতে থাকল।

জমিব উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হওয়ার ফলে কৃষি সম্পর্কের পরিবর্তন হল না। আগেকার মতো সামন্তশ্রেণীর লোকরাই জমির মালিকানা পেল। জাতব্যবস্থার নিয়ম অনুযায়ী কিছু কিছু জাত জমির দখলী-স্বত্ব লাভ করতে পারত না। বৃটিশ আইনেও বেনে ও অস্পৃশ্যদের মতো অকৃষিজীবি জাতকে জমির মালিকানালাভের অধিকার দেওয়া হয়নি।

বৃটিশ শাসনে অন্যান্যভাবেও জাতিভেদ বজায় থেকে গেল। সরকারী চাকরী-বাকরির ব্যাপারে জাত প্রাসঙ্গিক রয়ে গেল। প্রথমদিকে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি শিক্ষিত জাতের লোকেরাই চাকরী পেয়ে প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় শুরু হল মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুর অব্রাহ্মণ আন্দোলন। তবে এই আন্দোলন ছিল প্রধানতঃ মধ্যবর্তী পর্যায়ে অধিষ্ঠিত কৃষিজীবী জাতের আন্দোলন। এদের লক্ষ্য ছিল ক্ষমতার কিছুটা অংশলাভ। অস্পৃশ্য জাতসমূহের অধিকারের কথা এই আন্দোলনে ওঠেনি।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতারা ছিলেন উচ্চতর জাতের লোক। অস্পৃশ্যদের কাছে এইসব জাতের লোকই পীড়ক ও শোষক বলে পরিচিত। এদিকে ঔপনিবেশিক সরকার নিম্নতর জাতগুলিকে কিছু কিছু চাকরী ও সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছিল। এর ফলে অস্পৃশ্যদের চোখে কংগ্রেস হল শত্রু এবং বৃটিশ সরকার হল

সুহৃদ। দেশের বিভিন্ন অংশে অস্পৃশ্যরা কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। আম্বেদকারের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রের মাহার জাতের আন্দোলন, তামিলনাড়ুর আদিদ্রাবিড় আন্দোলন ও বাংলার নমঃশূদ্র আন্দোলন বৃটিশ শাসনের সহায়করূপে কংগ্রেসের প্রতিকূলতা করেছে। ভারতীয় সমাজের মধ্যে এই বিভেদ ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ কাজে লাগিয়েছিল এবং বিভক্ত করে রেখে শাসন করার নীতি নিপুণতা সহকারে প্রয়োগ করেছিল। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ এরই ফল। তবে নিম্নতর জাতের লোকে কৃষক আন্দোলন উপলক্ষে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। অনেক কৃষক আন্দোলনে নিম্নতর জাতের লোকেরা যোগ দিয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের কুর্মীরা বাবা রামচন্দ্রের নেতৃত্বে ইকা আন্দোলন করেছিল। গুজরাটের খেরা সত্যাগ্রহ (১৯২৮) পাতিদার যুবকমণ্ডলের আন্দোলন। বাঙলায় মেদিনীপুরের মাহিষ্যরা অসহযোগ আন্দোলনের সময় বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। এর পরে তেভাগা আন্দোলনের সময় রাজবংশী কৃষকরা উত্তরবঙ্গে মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এইসব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এক-একটা জাত সংঘবদ্ধ হয়ে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিরোধ করেছে। কৃষক আন্দোলন উপলক্ষে একাধিক জাত মিলিত হয়ে বৃহত্তর গোষ্ঠী তৈরী করেছে। ১৯৩৪ সালে বিহারে তিনটি মধ্যবর্তী পর্যায়ভুক্ত জাত কুর্মী, আহীর ও কৈরী মিলে 'ত্রিবেণী সংঘ' স্থাপন করেছিল। মহারাষ্ট্রে অব্রাহ্মণ আন্দোলনের সূত্রে মারাঠা, কুনবি, মালির মতো বেশ কয়েকটি 'কৃষক' জাত 'বহুজনসমাজ' নামে সংঘবদ্ধ হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে ভারতীয় সমাজে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থার দৃষ্টান্তে জাতের মধ্যে দেশীয় সংগঠনগুলির কর্মকৌশল বদলে গেল। আগে জাতের সংগঠন ছিল স্থানীয় পর্যায়ে আবদ্ধ। বৃটিশ আমলে বিভিন্ন জাত আঞ্চলিক পর্যায়ে সংঘবদ্ধ হতে লাগল।

স্বাধীন ভারতে আইন করে অস্পৃশ্যতা রদ করা হয়েছে, কিন্তু জাতভিত্তিক গোষ্ঠী-পরিচয় লোপ পায়নি। রাজনীতিক্ষেত্রে এটা খুব স্পষ্ট বোঝা যায়। চারদিকে জাতের দাঙ্গা, গ্রামাঞ্চলে হরিজন ও অন্যান্য নিম্নতর জাতের উপর হিংস্র আক্রমণ, সংরক্ষণের বিরুদ্ধে সহিংস আন্দোলন চলছে। নির্বাচনের সময় জাতভিত্তিক সমাবেশ ও প্রচার করা হয়। এতেই বোঝা যায় সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে জাত উপলক্ষে উত্তেজনা কত প্রবল।

সম্প্রতিকালে হরিজনদের বিরুদ্ধে সহিংস আক্রমণের সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে। ১৯৭৬ সালে এই ধরনের ঘটনা ছিল ৫,৯৬৮, ১৯৭৮ সালে এটা বেড়ে হয় ১৫,০৭০। ১৯৭৯ সালের সংখ্যাটি অবশ্য কিছু কম, ১৩,৮৬১। উত্তরভারতে অবস্থিত কয়েকটি রাজ্যে হরিজনবিরোধী সহিংস আক্রমণের ব্যাপকতা নিম্নে উদ্ধৃত তথ্য থেকে বোঝা যাবে।

উত্তরভারতে কতকগুলি রাজ্যে হরিজনদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক আক্রমণের হিসাব :

	১৯৭৭	১৯৭৮	১৯৭৯	১৯৮০
উত্তরপ্রদেশ	৪৯৭৪	৫৬৬০	৪১২২	৪২৭৯
বিহার	৬৮১	১৯১১	২৪৫৭	১৮৯০
মধ্যপ্রদেশ	৩৩১৬	৩২৪০	৩৮৬৬	৩৮৭৭
রাজস্থান	২৬১	৮৮৬	৭৬০	১১৮০

সূত্র : কে. এস. সুব্রহ্মণ্যম, 'Violence against the Scheduled Castes in India, Teaching Politics : I2 : 4 : 1986 : পৃ. ৩৮

এই ঘটনাগুলো থেকে উঁচু জাতের আঘাত করবার ক্ষমতা যে কত তা বোঝা যাচ্ছে। আরও একটা জিনিষের ইঙ্গিত এতে আছে। উঁচু জাতের ক্ষমতা এখন গায়ের জোরে জাহির করতে হচ্ছে ; আগেকার দিনের মতো নীচু জাতরা আর নির্বিচার আনুগত্যপরায়ণ নয়, জোর জুলুম করে তাদের বশে রাখবার চেষ্টা করা হচ্ছে। নীচু জাতের মানুষ এখন সমাজে হেয় হয়ে থাকতে চাইছে না; তারা মানুষের আত্মমর্যাদা নিয়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা হরিজনসহ বিভিন্ন নীচু জাতের মনে যে উদ্দীপনা সঞ্চার করেছে তার জোরেই তারা উঁচু জাতের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য রুখে দাঁড়াচ্ছে। বিহারে, বিশেষতঃ, মধ্য বিহারের বিভিন্ন জেলায়, নীচু জাতের লোকে উঁচু জাতের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিচ্ছে। সম্প্রতি আওরঙ্গাবাদ জেলার চেচানিতে যে হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে এই প্রতিশোধস্পৃহার লক্ষণ দেখা যায়। রাজপুত জোতদারদের উপেক্ষা করে চেচানির যাদবরা বেশ খানিকটা জমি জবরদখল করেছিল। এই ঘটনা থেকে রাজপুত-যাদব বিবাদ শুরু হয়। এ বছর এপ্রিল মাসের ৯ তারিখে একদল রাজপুত চেচানি গ্রামের যাদবদের আক্রমণ করে একজন বালক ও একজন নারীসহ সাতজন যাদবকে হত্যা করে এবং যাদবদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়। এর পর যাদবরা রাজপুতদের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণের উদ্যোগ করতে থাকে। এই ঘটনার কতকগুলি তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত লক্ষণীয়। রাজপুতদের বিরুদ্ধতা করে যাদবরা যে জমি দখল করে রেখেছিল এটা তাদের প্রতিস্পর্ধী ক্ষমতার পরিচায়ক। আবার রাজপুতদের বিরুদ্ধে যাদবদের পাল্টা আক্রমণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে উঁচু জাতের আধিপত্য আর অবিসংবাদিত নেই।

জাতের দাঙ্গা নিয়ে অনেক আলোচনা চলছে। এই বিষয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নাই। রাষ্ট্রের কার্যকলাপের দরুন জাতের সংঘাত কিভাবে বাড়ছে সে বিষয়ে কয়েকটা কথা বলব। আগে বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দল বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর ভোট পুরোপুরি পেত। এটা ছিল তাদের 'ভোট ব্যাংক'।

আজকের রাজনৈতিক অস্থিরতার দিনে আগেকার মতো ভোট ব্যাংকের উপর কারও ভরসা নেই। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলগুলি, বিশেষতঃ রাজ্য পর্যায়ের রাজনীতিতে, জাতভিত্তিক সংরক্ষণের টোপ ফেলে তপশীলভুক্ত জাত ছাড়া অন্যান্য অনগ্রসর জাতের ভোট আদায় করবার চেষ্টা করছে। এইভাবে বিহারে (১৯৭৮-৭৯) গুজরাটে (১৯৮০ এবং ১৯৮৫), মধ্যপ্রদেশে (১৯৮৫) এবং সর্বশেষ অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটকে সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রসার হয়েছে এবং তার ফলে উঁচু জাতরা প্রবল সহিংস সংরক্ষণবিরোধী আন্দোলন করে প্রত্যাঘাত করেছে। গুজরাটে সংরক্ষণবিরোধীরা সংরক্ষণ ব্যবস্থা একেবারে তুলে দেবার দাবিতে আন্দোলন করছিল। কর্ণাটকে উঁচু জাতদের দাবি ছিল তাদের জন্যও সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এই দৃষ্টান্তগুলি থেকে বোঝা যাবে কিভাবে রাষ্ট্রের নীতি জাতের সংঘাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে। সংরক্ষণব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল হরিজনদের উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে। এর ফলে হরিজনদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বঞ্চনার যে বিশেষ প্রতিকার হয়েছে তা বলা যাবে না। কিন্তু মধ্যবর্তী পর্যায়ের উঠতি জাত বা হরিজন ছাড়া অন্যান্য নীচু জাতের ক্ষেত্রে সংরক্ষণব্যবস্থা বিষম ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছে।[৮]

সম্প্রতিকালে জাত-শ্রেণী মিথস্ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন জাতের সমাহারে শ্রেণীসদৃশ জাতসংঘের উদ্ভব হচ্ছে। এই কারণে 'প্রাগ্রসর' এবং 'অনগ্রসর' অথবা 'সবর্ণ' এবং 'দলিত' প্রভৃতি অভিধায় জাতের পরিচয় জ্ঞাপন করা হচ্ছে। এগুলি জাত ব্যবস্থার নিজস্ব বর্গ নয়, এগুলি রাষ্ট্র তৈরী করে দিয়েছে অথবা নিপীড়িত জাতগুলি নিজেদের অবস্থা বোঝাবার জন্য এইধরণের অভিধা গ্রহণ করছে। বিভিন্ন জাত পৃথক পরিচয় পরিহার করে যত একত্রিত এবং সংঘবদ্ধ হবে জাত সম্পর্কে ধারণা ততই বদলাতে থাকবে। সকল নিপীড়িত গোষ্ঠীর অনুভূমিক সংঘবদ্ধতা গড়ার প্রয়াসে ভারতীয় সমাজের নিজস্ব বিশিষ্টতাদ্যোতক শ্রেণীগঠনের ইঙ্গিত আছে। এই অভিনব শ্রেণীর মধ্যে জাতের পরিচয় থেকে যেতে পারে, কিন্তু তাতে শ্রেণী-সংঘর্ষ ব্যাহত হবে না।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থপঞ্জী

Harold Gould, 'The Adaptive functions of caste in contemporary Indian society', *Asian Survey* : 3 : September 1963.

L. I. Rudloph and S. H. Rudloph : *The Modernity of tradition*, Chicago, 1967.

Rajani Kothari (ed) : *Caste in Indian politics*, Delhi, 1970.

G. Saha : 'Caste in contemporary India' : Caste, caste-conflicts and reservation, New Delhi, 1985

Wandana Sonalkar and Moin Saker: 'Caste, politics and development in Maharashtra', *Mainstream* : 25 : 30 April, 1987.

G. Omvedt : *Cultural revolt in a colonial society*, Bombay, 1976.

E. Irchik : *Politic and Social Conflict in south India*, Bombay, 1969.

Karl Marx : 'The Future results of the British in India', *On Colonialism*, Moscow.

[মূল ইংরেজী থেকে ভাষান্তর : ফাল্গুনী চক্রবর্তী ও অভিজিৎ গুহ।]

পশ্চিমবঙ্গে জাতব্যবস্থার প্রকৃতি ও বামফ্রণ্ট সরকারের নীতি

স্নেহময় চাকলাদার

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বর্ণে বর্ণে বিরোধ ও জাত নিয়ে রাজনীতি যখন ক্রমেই বেড়ে চলেছে তখন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি জাতের প্রভাব হতে বহুলাংশে মুক্ত রয়েছে। এখানে বর্ণভেদ থাকলেও বর্ণে বর্ণে বিরোধ নেই বললেই চলে। অনেকের মতে পশ্চিমবঙ্গে ইংরেজদের প্রভাবে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্যকরণ, আধুনিকীকরণ এবং গণতন্ত্রীকরণ ঘটায় বর্ণভেদের প্রাদুর্ভাব এখানে তুলনামূলকভাবে কম, কিন্তু এ যুক্তিতে পশ্চিমবঙ্গের জাতব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কেননা পাশ্চাত্যের প্রভাব কম বেশী সকল রাজ্যেই পড়েছে। বিশেষ করে বোম্বাই ও মাদ্রাজ কলকাতার সাথে সাথেই পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের সংস্পর্শে এসেছে এবং ইংরেজী শিক্ষা, বিচার ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রবর্তন করেছে। আধুনিকীকরণ বিশেষ করে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে। আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সকল রাজ্যে প্রায় সমভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অথচ তামিলনাড়ু (মাদ্রাজ), মহারাষ্ট্র (বোম্বাই) প্রভৃতি রাজ্যে জাতব্যবস্থার প্রকোপ হ্রাস না পেয়ে বরং নির্বাচনী রাজনীতির দৌলতে নূতন রূপে সঞ্চারিত হয়ে উঠেছে। তাহলে প্রশ্ন হল পশ্চিমবঙ্গে জাতের প্রকোপ কম কেন ? কি সামাজিক, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য পশ্চিমবঙ্গকে বর্ণ-সংঘর্ষ থেকে মুক্ত রেখেছে ?

এর কারণ অনুসন্ধান করতে হলে অতীতের দিকে মুখ ফেরানো দরকার এবং বঙ্গের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের পর্যালোচনা আবশ্যক। কেননা ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি ইতিহাসের গতিপথ ধরেই সরলরেখায় এগিয়ে চলেছে। আধুনিকীকরণের ফলে ভারতীয় জনজীবনে ব্যাপক রূপান্তর ঘটলেও তা কখনও প্রাচীন ঐতিহ্য বা ইতিহাসের ধারা হতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। এ প্রসঙ্গে মিল্টন সিঙ্গারের উক্তি খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "আধুনিকীকরণের প্রভাবে সন্দেহাতীত ভাবে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বহুদিক (aspects) পরিবর্তিত হলেও এর মূল কাঠামো বা ধারা বিনষ্ট হয়ে যায়নি। ভারতের সামাজিক কাঠামো এত নমনীয় ও সমৃদ্ধিশালী যে ভারতীয়রা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও আধুনিক আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ গ্রহণ করতে এবং বিকল্প জীবন প্রণালী অবলম্বনে সমর্থ হয়েছে"।[১] জাতপ্রথার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আধুনিকীকরণের ফলে বৃত্তি নির্বাচন, অন্তর্বিবাহ বা স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারের বহুবিধ রীতিনীতি পরিবর্তিত হলেও জাতব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েনি। ইতিহাসের বিবর্তিত পথ ধরে এগিয়ে চলেছে, তবে বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন রূপে।

কৃত্রিম বিভাগ

যদিও বর্ণাশ্রম বলতে আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার জাতের ব্যবস্থাকে বুঝি, প্রকৃতপক্ষে প্রাক্-ঐতিহাসিক কাল হতে এখানে বহু জাতের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। মনু চাতুর্বর্ণ্যের বিধান দিলেও তিনি বিভিন্ন শ্লোকে ন্যূনপক্ষে ৬২টি জাতির নাম উল্লেখ করেছেন, মহাভারতে দ্বিজসত্তম ভরদ্বাজ ও মহর্ষি ভৃগুর মধ্যে কথোপকথনের মধ্যেও বহুজাতির অস্তিত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ শাস্ত্রকারেরা সুপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন বর্ণ ও উপবর্ণকে প্রধানতঃ চারটি স্তরে বিভক্ত করতে প্রয়াসী হন। নীহার রায় যথার্থই বলেন,

> "বর্ণাশ্রম প্রথা ও অভ্যাস যুক্তিপদ্ধতিবদ্ধ করিয়াছিলেন প্রাচীন ধর্মসূত্র ও স্মৃতিগ্রন্থের লেখকেরা। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-এই চাতুর্বর্ণ্যের কাঠামোর মধ্যে তাঁহারা সমস্ত ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অথচ চাতুর্বর্ণ্যের বাহিরে অসংখ্য বর্ণ, জন ও কোম বিদ্যমান ছিল, প্রত্যেক বর্ণ, জন ও কোমের ভিতর আবার ছিল অসংখ্য স্তর-উপস্তর। ধর্মসূত্র ও স্মৃতিকারেরা নানা অভিনব অবাস্তব উপায়ে এইসব বিচিত্র বর্ণ, জন ও কোমের স্তর-উপস্তর ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিতে এবং সবকিছুকেই আদি চাতুর্বর্ণ্যের কাঠামোর যুক্তিপদ্ধতিতে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেই মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে রঘুনন্দন পর্যন্ত এই চেষ্টার কোনও বিরাম হয় নাই।[২]

এঁদের সযত্ন প্রয়াস সত্ত্বেও ভারতে বর্ণ, উপবর্ণের পার্থক্য থেকেই গেছে। শুধু বর্ণের বৈচিত্র্য নয় জাতব্যবস্থার প্রকৃতিও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ ছিল।

বঙ্গে জাতব্যবস্থার প্রকৃতি

যদিও খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে অর্থাৎ গুপ্তদের রাজত্বকালে বঙ্গে ব্রাহ্মণ্য বর্ণব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, তথাপি পালবংশের রাজত্বকালে (৭৭০-১১২০) বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য থাকায় জাতব্যবস্থার বিশেষ করে বর্ণভেদের কড়াকড়ি ততটা অনুসৃত হতে পারে নি। একমাত্র সেনদের রাজত্বে অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দী হতে উত্তরভারতের অনুকরণে বঙ্গের জাতব্যবস্থাকে গড়ে তোলার প্রয়াস চলে। সম্ভবতঃ সে সময় হতে বাঙ্গালী স্মৃতিকার ও পুরাণকারেরা সচেতনভাবে বাংলার সমাজব্যবস্থাকে আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণ্য স্মৃতির আদর্শ ও যুক্তিপদ্ধতিতে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য বর্ণবিন্যাসের কাঠামোর মধ্যে বাঁধার চেষ্টা করেন।

কিন্তু বাঙ্গালী সমাজ উত্তর ভারতের সমাজ হতে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শুধু জনগোষ্ঠীর বিচারেই নয়, সামাজিক আচার-বিচার, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও প্রথাগত বিচারেও বঙ্গের সমাজ ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জাতব্যবস্থাতেও এ পার্থক্য পরিলক্ষিত

হয়। বাঙ্গালার স্মৃতিকারেরা সেজন্য বঙ্গের সামাজিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে জাতব্যবস্থাকে গড়ে তোলেন। তবে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য সর্বত্রই স্বীকৃত হয়। বৃহদ্ধর্ম পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এর স্বাক্ষর মিলে। মোটামুটিভাবে দ্বাদশ শতকের সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত হলেও আধুনিক কালের জাতব্যবস্থার সাথে এর বিরাট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

বৃহদ্ধর্ম পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বর্ণিত জাতব্যবস্থার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে বঙ্গের জাতব্যবস্থার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিভাত হয়।

(১) বঙ্গে চারটি জাত নয়, প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুটি জাত বিদ্যমান। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

(২) এখানে শূদ্রদের আবার সৎ বা পরিচ্ছন্ন শূদ্র এবং অপরিচ্ছন্ন শূদ্র এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

(৩) শূদ্র ছাড়াও ডোম, চামার, বাগদী প্রভৃতি জাতকে নীচুজাত বলে গণ্য করা হয়। সম্ভবত এরাই হল অচ্ছুৎ বা বহির্ভূত জাত।

(৪) ব্রাহ্মণদের জীবন-প্রণালীর ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ শিথিল করা হয়। এখানে ব্রাহ্মণদের মাছ-মাংস ভক্ষণে কোনরূপ বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি।

(৫) বৃহদ্ধর্ম পুরাণে ছত্রিশটি জাতের উল্লেখ করা হয়। তবে ৪১টি জাতের নাম এতে পাওয়া যায়।

(৬) এ সকল জাতের মধ্যে ব্রাহ্মণদের স্থান ছিল সর্বাগ্রে, এর পরেই ছিল কায়স্থ ও বৈদ্যদের স্থান। নিজ নিজ বৃত্তি ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে এঁদের নিযুক্ত করা হতো।

(৭) বঙ্গের ব্রাহ্মণদের মধ্যেও বহু ভাগ ছিল। আঞ্চলিক বা গুণের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, বারেন্দ্র, রাঢ়ীয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণের উল্লেখ করা যেতে পারে। বরেন্দ্র অঞ্চলে বসবাসকারী ব্রাহ্মণদের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, রাঢ় অঞ্চলের ব্রাহ্মণদের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বলে অভিহিত করা হয়। আবার বসবাসকারী গ্রাম হিসেবেও তাদের জাতের তারতম্য ঘটে। উদাহরণ হিসেবে মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। যে গ্রামে তারা বসতি স্থাপন করতেন সে গ্রামের নামানুসারে তাঁরা গাঞী পরিচয় গ্রহণ করতেন। যথা বন্দ্য, ভট্ট, চট্ট, প্রভৃতি গাঁয়ের নামের সাথে উপাধ্যায় বা আচার্য (মানে শিক্ষক) যুক্ত হয়ে বন্দ্যোপাধ্যায় বা বানার্জি, চট্টোপাধ্যায় বা চাটার্জি, ভট্টাচার্য প্রভৃতি পদবীর সৃষ্টি হয়। এছাড়া বল্লালসেন প্রবর্তিত কৌলীন্য প্রথার প্রসাদেও ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিভিন্ন জাত গড়ে ওঠে। কথিত আছে বল্লালসেন 'পরীক্ষাদ্বারা যাহাদিগকে নবগুণ বিশিষ্ট দেখিলেন তাহাদিগকে কৌলীন্য মর্যাদা প্রদান করিলেন।'[৩] এছাড়া ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁদের আটগুণ ছিল তাঁদের শ্রোত্রিয় এবং যাঁরা সদাচার পরিভ্রষ্ট ছিলেন, তাঁদের গৌণ কুলীনরূপে আখ্যাত করেন। আবার কুলীন ব্রাহ্মণ

ও গৌণ কুলীন ব্রাহ্মণীর মধ্যে বিবাহের ফলে যে সন্তানের জন্ম হয় তারা বংশজ নামে পরিচিতিলাভ করে। এছাড়া কনৌজ হতে ব্রাহ্মণ আসার পূর্বে বাংলাদেশে যে সকল অশিক্ষিত ও আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ ছিল তাদের বংশধরদের সপ্তশতী নামে আখ্যাত করা হয়। অর্থাৎ সামাজিক মর্যাদা অনুসারে—ব্রাহ্মণদের কুলীন, শ্রোত্রিয়, বংশজ, গৌণকুলীন ও সপ্তশতী এই পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়।[৭]

পরবর্তীকালে কুলীনদের মধ্যে বিভিন্ন দোষ প্রবেশ করায় নবগুণবিশিষ্ট খাঁটি কুলীন আর কেহ রইল না। প্রত্যেকের মধ্যেই কোন না কোন দোষ দেখা দেয়। তখন রাজা দেবীবর কম-বেশী দোষ অনুসারে কুলীন ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। "যে যে কুলীন একবিধ দোষে দূষিত, দেবীবর তাহাদিগকে এক সম্প্রদায়ে নিবিষ্ট করেন, সেই সম্প্রদায়ের নামে মেল। মেল শব্দের অর্থ দোষমেলন, অর্থাৎ দোষ অনুসারে সম্প্রদায়বন্ধন। দেবীবর ব্যবস্থা করেন, দোষ যায়, কুল তায়। বল্লাল গুণ দেখিয়া কুলমর্যাদার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, দেবীবর দোষ দেখিয়া কুলমর্যাদার ব্যবস্থা করিয়াছেন।"[৫] উদাহরণ স্বরূপ ফুলিয়া খড়দহ, বিজয় পণ্ডিতী, চন্দ্রাবতী প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিভিন্ন কারণে বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্ম ও অন্যান্য অবৈদিক ধর্মের প্রভাবে বঙ্গের ব্রাহ্মণেরা উচ্চতর যাগযজ্ঞ সম্পাদনে অক্ষম হয়ে পড়ে। সেজন্য পরবর্তী হিন্দু রাজগণ যাগযজ্ঞাদির জন্য উত্তর ও দক্ষিণ ভারত হতে ব্রাহ্মণদের নিয়ে আসেন। বেদজ্ঞানসম্পন্ন পশ্চিম ভারত হতে আগত ব্রাহ্মণদের বলা হয় পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ আর উড়িষ্যা ও দ্রাবিড় অঞ্চল অর্থাৎ দক্ষিণ ভারত হতে আগত ব্রাহ্মণদের বলা হয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।[৬] এছাড়া বৃহদ্ধর্ম পুরাণে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের এবং বল্লালসেনের দানসাগরে সারস্বত ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ শাকদ্বীপ হতে এবং সরস্বতী নদীর তীর হতে এসেছিলেন বলে এঁদের এরূপ নামকরণ করা হয়।[৭]

(৮) বঙ্গের বাইরে থেকে আগত ব্রাহ্মণদের সাথে স্থানীয় ব্রাহ্মণদের বৈবাহিক বা অন্য কোনরূপ সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হত না। হাণ্টারের মতে নিম্নবঙ্গের ব্রাহ্মণেরা শুধু সামাজিক মর্যাদায় নয়, ধর্মীয় যোগ্যতাতেও মধ্যদেশের ব্রাহ্মণদের চেয়ে হীনতর বলে গণ্য হত। তিনি বলেন, "আজও উত্তর ভারতের বহু ব্রাহ্মণ নিম্ন উপত্যকার ব্রাহ্মণদের সঙ্গে একত্রে আহারে রাজী নয়। এমনকি উত্তর পশ্চিমে সাজা প্রাপ্ত অপরাধীরাও জেলখানায় বাঙালি ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রস্তুত অন্নের চেয়ে অবাধ্যতার জন্য বারংবার বেত্রাঘাত শ্রেয় মনে করে।"[৮]

(৯) বঙ্গের ব্রাহ্মণদের প্রতি এরূপ হীনভাব সত্ত্বেও তাদের জাতব্যবস্থার সর্বোচ্চে স্থান দেয়া হয়। এখানে ব্রাহ্মণ ছাড়া বাকী সকল জাতকে শূদ্ররূপে অভিহিত করা হয়, কেননা এরা সকলেই মিশ্র জাত।

কথিত আছে রাজা বেণ জাতব্যবস্থা ভাঙবার জন্য বিভিন্ন জাতের স্ত্রী ও

পুরুষেব মধ্যে অবাধ যৌন ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত করান। তাদের যৌন ক্রিয়ার ফলে মিশ্র জাতেব উদ্ভব হয়। এই মিশ্র জাতসমূহকে আবার উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যে সকল সন্তান আদি চার জাতের পিতা-মাতা হতে উদ্ভুত তারা উত্তম, আর যাদের মাতা আদি চারজাতের কিন্তু পিতা মিশ্র জাত হতে উদ্ভুত তাবা মধ্যম আর যাদের পিতা মাতা উভয়েই মিশ্র জাত হতে উৎপন্ন তারা হল অধম মিশ্র জাত। অধম মিশ্র জাত সাধারণতঃ সমাজবহির্ভূত শ্রেণীরূপে গণ্য।[৯] নিম্নে বিভিন্ন জাত, তাদের শ্রেণীবিভাগ ও বৃত্তির উল্লেখ করা হল :

(ক) **উত্তম শঙ্কর জাত**

	জাতের নাম		বৃত্তি
১।	করণ বা কায়স্থ	:	সরকারী কাজকর্ম পরিচালনা ও পুস্তকের নকল করা
২।	অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য	:	চিকিৎসা, সরকারী কাজে সাহায্য করা
৩।	উগ্র	:	সৈনিক বৃত্তি
৪।	মাগধ	:	কবি বা দৌত্য, বার্তাবহন ইত্যাদি
৫।	তন্তুবায	:	তাঁতী
৬।	গন্ধবণিক	:	মশলাপাতি বা সুগন্ধি জিনিষের ব্যবসা
৭।	নাপিত	:	খোরকাব
৮।	গোপ	:	লেখক
৯।	কর্মকার	:	লৌহজাত জিনিষের প্রস্তুতকারক
১০।	তৌলিক	:	সুপারী বিক্রেতা
১১।	কুম্ভকার	:	মৃৎপাত্র প্রস্তুত কারক
১২	কংসকার	:	কাশাব বাসন প্রস্তুতকাবক
১৩।	শাখিকা	:	শাখার জিনিষ প্রস্তুতকাবক
১৪।	দাস	:	কৃষিজীবী
১৫।	বারুজীবী	:	পানচাষী
১৬।	মোদক	:	মিঠাই প্রস্তুতকারক
১৭।	মালাকার	:	ফুল বিক্রেতা
১৮।	সূত	:	কাঠের মিস্ত্রি (আনুমানিক)
১৯।	রাজপুত্র	:	রাজপুত (”)
২০।	তাম্বলি	:	পানবিক্রেতা (”)

(খ) **মধ্যম সঙ্কর**

২১।	তক্ষণ	:	কাঠের জিনিষ প্রস্তুতকারক

২২। রজক : ধোপা
২৩। স্বর্ণকার : সোনার জিনিষ প্রস্তুতকারক
২৪। স্বর্ণ-বণিক : হীরে জহরের ব্যবসায়ী
২৫। আভীর : গোপালক অথবা দুগ্ধবিক্রেতা
২৬। তৈলকার : তেল প্রস্তুতকারক
২৭। ধীবর : মৎসজীবী
২৮। শৌণ্ডিক : মদ্যব্যবসায়ী
২৯। নট্ট : নর্তকী, জোকার, ভাঁড়ামী ইত্যাদি
৩০। শাবক, শারক অথবা শাবার : ?
৩১। শেখর : ?
৩২। জালিক : মৎসজীবী

(গ) অধম সঙ্কর জাত

৩৩। মালে গ্রাহি (মালদের এক শাখা) : ?
৩৪। কুরঙ : খেয়া পারাপারকারী—
৩৫। চাণ্ডাল : চাণ্ডাল
৩৬। বরুব (বাউরা ?) : ?
৩৭। তক্ষ : ছুতোর মিস্ত্রি
৩৮। চর্মকার : জুতো নির্মাণকারী
৩৯। ঘণ্টজীবী (পাটনী) : ?
৪০। দোলাবাহী : পাল্কীবাহক
৪১। মল্ল (মালো) : ? [১০]

উল্লেখ যে বৃহদ্‌ধর্ম পুরাণে ৩৬ জাতের উল্লেখ থাকলেও তালিকায় ৪১টি জাতের নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ পাঁচটি জাতের নাম মূল গ্রন্থের সাথে পরে সংযুক্ত করা হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে অনুরূপ এক তালিকা পাওয়া যায়। যেখানে সংকর জাতসমূহকে সৎ ও অসৎ শূদ্র এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তবে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে মগধ, গন্ধবণিক, তৌলিক, দাস, বারজীবী, সূত প্রভৃতি জাতের নাম নেই তার পরিবর্তে ভিল্ল, কুবর প্রভৃতি জাতের নাম পাওয়া যায়। তাছাড়া আভীর, নট, শাবাক, শেখর, জালিক প্রভৃতি জাতের নামও অনুপস্থিত, এর পরিবর্তে অট্টালিকাকার, কোটক, লেট, মল্ল, চর্মকার, পৌণ্ড্রক, মাংসচ্ছেদ, কৈবর্ত, গঙ্গাপুত্র, যুঙ্গি, আগরা, কোয়ালী প্রভৃতি জাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে বৃহদ্‌ধর্ম পুরাণে জাত হিসেবে বৈদ্যদের কোন উল্লেখ নেই কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে।[১১] সম্ভবতঃ অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য একই জাত।

উভয় পুরাণেই কিন্তু করণ (কায়স্থ) ও অম্বষ্ঠদের (বৈদ্য) স্থান ব্রাহ্মণদের

পরেই দেয়া হয়েছে। বঙ্গ সমাজে এদের স্থান যাই হোক না কেন স্মৃতিকারদের বিচারে এরা সকলেই শূদ্র। ঐতিহাসিকগণের মতে বাংলার অব্রাহ্মণদের শূদ্ররূপে গণ্য করা কিছুই অস্বাভাবিক নয়। কেননা পুরাণসমূহে শূদ্র বলতে শুধু চতুর্থ বর্ণকেই নির্দিষ্ট করা হয়নি। অপরাপর তিনবর্ণের অন্তর্ভুক্ত হয়েও যারা অব্রাহ্মণ্য ও তান্ত্রিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হন তাদের শূদ্ররূপে গণ্য করা হয়েছে। অষ্টম শতক হতে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও তান্ত্রিক শাক্তধর্মের প্রভাব অনেক বেশী পড়ে বলে সম্ভবত বৃহদ্ধর্ম পুরাণ ও পরবর্তীকালে রচিত অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থে বাংলাদেশের সকল উল্লেখযোগ্য জাতকেই শূদ্ররূপে অভিহিত করা হয়।[১২]

উপরোক্ত আলোচনা হতে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে 'আর্যব্রাহ্মণ্য বর্ণ ব্যবস্থা' বঙ্গে পুরোপুরি প্রচলিত হতে পারেনি। বৌদ্ধধর্ম ও অন্যান্য অব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে এখানে উত্তর বা দক্ষিণ ভারতের ন্যায় বর্ণে বর্ণে ভেদ ততটা প্রকট হয়ে ওঠেনি। স্মৃতিকারেরা যথার্থই বলেন যে বঙ্গে সকলেই সংকর জাত। এর অর্থ হল এখানে বিভিন্ন জাতের মধ্যে পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে বিধিনিষেধের কড়াকড়ি ছিল না। একজাতের ছেলের সাথে অপর জাতের কন্যার বিবাহ প্রায়ই ঘটত। অবশ্য সেন বংশের রাজত্বকাল হতে বর্ণব্যবস্থার কড়াকড়ি খুবই বৃদ্ধি পায়।

বিধিনিষেধের কড়াকড়ি বৃদ্ধি পেলেও তা এমন পর্যায়ে কখনো যায়নি যে নীচু জাতের লোককে দেখলে বা তার ছায়া মাড়ালে অশৌচ হতে হতো এবং প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। একদল নীচু জাতের সাথে উঁচু জাতের ভেদাভেদ ছিল মূলত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের এবং কাঁচা খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে। অবশ্য নীচু জাতের লোকেরা স্বতন্ত্র পল্লীতে বসবাস করতে অভ্যস্ত ছিল। তবে দক্ষিণ ভারতের ন্যায় ভদ্র পল্লী দিয়ে চলাফেরায় বা মন্দিরে প্রবেশে কিংবা একই পুকুরে স্নানাদিতে কোন বিধিনিষেধ ছিল না। আবার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে যেটুকু বিধিনিষেধ ছিল তার বিরুদ্ধে সচেতন ও সংবেদনশীল মানুষের প্রতিবাদ ধ্বনি প্রায়ই উচ্চারিত হতো।

বর্ণভেদ বিরোধী আন্দোলন

এটি লক্ষণীয় যে বঙ্গে বর্ণাশ্রম কখনও জনমানসে স্থানলাভ করেনি। বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে সর্বদাই একটা বলিষ্ট মতবাদ বিদ্যমান ছিল। বৌদ্ধরা যদিও দৈনন্দিন জীবনে জাতব্যবস্থাকে এড়াতে সমর্থ হয়নি তথাপি নীতিগতভাবে তারা বর্ণভেদকে সমর্থন করতে পারেনি। বৌদ্ধাচার্যেরা সচেতনভাবেই বর্ণভেদকে অস্বীকার করেছেন। সুদীর্ঘ পালরাজত্বের সময় বৌদ্ধধর্মের প্রচলন থাকায় জাতভেদ নৈতিক সমর্থনলাভে বঞ্চিত থাকে। ব্যবহারিক জীবনে উঁচু জাত ও নীচু

জাতের মধ্যে পার্থক্য করা হলেও সামাজিক জীবনে নীতিগতভাবে এ ব্যবস্থাকে কেউ সমর্থন করতে পারেনি।

আরও লক্ষণীয় যে বঙ্গে জাতবিরোধী আন্দোলনে এগিয়ে এসেছেন উঁচু জাতের লোকেরা। এ প্রথার অবসানের জন্য নীচু জাতের চেয়েও উঁচু জাতের লোকদের উদ্যোগ ছিল অনেক বেশী। মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্য, আধুনিক কালে রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অনেকেই ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেও জাতব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মে অথবা রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মে জাতপাতের বিচার তুলে দেয়া হয়। বঙ্গের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় প্রাচীন কাল হতেই এ ধারা বইয়ে চলেছে। নীহার রায় লক্ষ্য করেন যে প্রাচীন বঙ্গেও "এমন মানুষ, এমন সাধক ছিলেন যাঁহারা মানুষে মানুষে এই ভেদ সংঘাত অস্বীকার করিয়া তাহার উর্ধ্বে উঠিতে পারিয়াছিলেন। সমস্ত জাত ও বর্ণভেদ অতিক্রম করিয়া মানুষের মানব মহিমা তাহার চিরমুক্ত প্রাণ ও আত্মার জয়ঘোষণাই ছিল তাঁহাদের অধ্যাত্মচিন্তা ও জীবন সাধনার আদর্শ। এই আদর্শ সবচেয়ে বেশি প্রচার করিয়াছেন ভাগবতধর্মী এবং সহজযানী সাধকেরা।"[১৩] তাঁর মতে প্রাচীন বাংলায় একথা খুব জোরের সঙ্গে প্রচার করেছেন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা এবং ভবিষ্য পুরাণের ব্রহ্মপর্বের রচয়িতারা। তিনি বলেন, 'ব্রহ্মপর্বে জাতি ভেদের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ যুক্তি দেওয়া হইয়াছে এবং সর্বশেষে বলা হইয়াছে চার বর্ণই যখন এক পিতার সন্তান তখন সকলেই একই জাতি।"[১৪]

মধ্যযুগে বাংলার ভক্তিবাদীরা বিশেষ করে বৈষ্ণব, সহজিয়া, বাউল প্রভৃতি ধর্মীয় সম্প্রদায় জাতভেদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের কাছে বর্ণাশ্রমের চেয়ে মানবধর্ম ছিল অনেক বড়, অনেক মহান, কেননা,

'সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপর নাই।'[১৫]

কবি চণ্ডীদাসের কাছে "আকাশ পাতাল সকলি মানুষ, মানুষ পরম প্রভু।"[১৬] যেখানে মানুষই হল পরম প্রভু সেখানে মানুষে মানুষে কোন ভেদ থাকতে পারে না। কোন সম্প্রদায়কেই অচ্ছুৎ বা অস্পৃশ্য বলে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। প্রেমের আকর্ষণে সে সকলকেই আপনার করে নেয়। সেজন্য দ্বিজ চণ্ডীদাস জাতে ব্রাহ্মণ হয়েও নীচু জাত তারা রজকিনীর সঙ্গে "আস্বাদিলা প্রেমসুখ রসের নির্যাস।"[১৭]

আন্দোলন নয়, হুমকি নয়—কেবলমাত্র প্রেমের মাধ্যমে বৈষ্ণব ও সহজিয়াগণ জাতভেদের প্রাচীর চূর্ণবিচূর্ণ করে সকলকে একসূত্রে গ্রথিত করেন। তাই চণ্ডীদাস বলেন,

'কানুর পিরিতি
জাতিকুল শীল ছাড়া।'[১৮]

বৈষ্ণবদের ন্যায় বাংলার বাউল সম্প্রদায়ও জাতভেদ মানতেন না। সকল মানুষকেই তাঁরা সমান চোখে দেখতেন। একজাতের মানুষের সাথে যে অন্যজাতের মানুষের কোন ভেদ নেই তা তাঁদের জন্মমৃত্যুতেই প্রমাণ মেলে। এই সহজ সরল সত্যটি লালন ফকির তাঁর একটি গানের মধ্যে দিয়ে সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন,

'কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়,
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়,
জেতের চিহ্ন রয় কার রে' ॥[১৯]

মধ্যযুগে বৈষ্ণবগণ মানবিকতার প্রশ্নে জাতভেদের বিরোধিতা করেন আর আধুনিককালে ব্রাহ্মগণ সমানাধিকারের প্রশ্নে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদকে অস্বীকার করেন। তাঁদের নগর সংকীর্তনের গানের কলি ছিল

নরনারী সাধারণের সমান অধিকার
যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি
নাহি জাত বিচার।[২০]

রামমোহন রায় জাতভেদকে কেবলমাত্র একটি সামাজিক কুপ্রথা বলেই মনে করতেন না এ ব্যবস্থা হিন্দুদিগের রাজনৈতিক অধঃপতন ও দেশাত্মবোধ জাগরণের পরিপন্থী বলে মনে করতেন।[২১]

ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রবর্তক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের মাধ্যমে জাতব্যবস্থার উচ্ছেদসাধনে ব্রতী হন। ইংলন্ডে এক বক্তৃতায় তিনি সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করেন যে, দেশ থেকে পৌত্তলিকতা ও জাতপ্রথার উচ্ছেদ হল তাঁর ব্রাহ্মসমাজের মহান উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি দুটি কর্মপন্থা স্থির করেন, তা হল ব্রাহ্মসমাজে অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন এবং ব্রাহ্মগণ কর্তৃক উপবীত বর্জন। এই কর্মসূচীকে কার্যকরী করার জন্য দলে দলে যুবক উপবীত বর্জন করে জাতপাত নির্বিশেষে সকলের সাথে একাসনে খাওয়া দাওয়া করতে এগিয়ে আসেন। এঁদের মধ্যে অনেক অসবর্ণ বিবাহ করতেও কুণ্ঠিত হন না।[২২]

সে সময়ে অসবর্ণ বিবাহ যেহেতু হিন্দুসমাজে আইনসিদ্ধ ছিল না সেহেতু অসবর্ণ বিবাহের ফলে অনেককে পৈতৃক সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হতে হত। এ অবস্থার প্রতিকারকল্পে ব্রাহ্মগণ তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। সম্ভবতঃ তাঁদের দাবিতে ১৮৭২ সালে Special Marriage'র মাধ্যমে অসবর্ণ বিবাহকে আইনসিদ্ধ করা হয়।

বৈষ্ণব, সহজিয়া, আউল-বাউল ব্রাহ্মসমাজ প্রার্থনাসমাজ, সত্যসাধকসমাজ প্রভৃতি ধর্মীয় মতবাদ হিন্দুসমাজের প্রান্তদেশ থেকে জাতব্যবস্থার বিরোধিতা করে, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুসমাজের কেন্দ্রস্থল হতে জাতব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। বিবেকানন্দ স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতীয়দের মধ্যে

জাতীয়তাবাদের প্রেরণা সঞ্চারিত করতে হলে জাতব্যবস্থার অবসান আবশ্যক। সেজন্য স্বদেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, হে ভারতবাসী! "ভুলিও না—নীচ জাতি মূর্খ দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! ...বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।"[২৩]

উত্তরভারতে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী যে আন্দোলন গড়ে তোলেন তার ঢেউ পশ্চিমবঙ্গের বেলাভূমিকেও স্পর্শ করে। মহাত্মা গান্ধী উপলব্ধি করেন অস্পৃশ্যতাকে বজায় রেখে সকল শ্রেণীর লোককে জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে সমবেত করা যাবে না। ইয়ং ইণ্ডিয়াতে লিখিত এক প্রবন্ধে তিনি বলেন যতদিন পর্যন্ত হিন্দুদের এক বৃহৎ অংশ অপর অংশকে স্পর্শ করাকে পাপ বলে গণ্য করবে ততদিন স্বরাজলাভ কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তিনি প্রশ্ন করেন, 'আমরা যদি আমাদের ভাই বা প্রতিবেশীদের দমন করি, তাদের প্রতিমুহূর্তে অপমান করি কথায় কথায় নাকেখৎ দেওয়াই তাহলে আমরা কি করে স্বরাজের দাবী করতে পারি?[২৪] গান্ধীজী হরিজন সঙ্ঘের মাধ্যমে অস্পৃশ্যতাবিরোধী এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানেও এই সঙ্ঘের নেতৃত্বে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে জাতব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন সংগঠিত হলেও স্বাধীনোত্তর যুগে নির্বাচনী রাজনীতির প্রভাবে জাতের প্রশ্ন নূতনভাবে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। দক্ষিণভারতের প্রায় সবকয়টি রাজ্যে এবং উত্তরভারতের বিহার উত্তর-প্রদেশ এমনকি গান্ধীজীর জন্মভূমি গুজরাটেও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে জাতের প্রশ্নটি প্রধান হয়ে ওঠে।

সুখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি জাতভেদের এই দূষিত আবহাওয়া থেকে বহুলাংশে মুক্ত। এর প্রধান কারণ, (ক) পশ্চিমবঙ্গে জাতব্যবস্থা কখনো নৈতিক মর্যাদালাভ করেনি, (খ) প্রাচীনকাল হতেই জাতব্যবস্থাবিরোধী একটি বলিষ্ঠ মতবাদ গড়ে উঠেছিল, (গ) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এখানে জাতব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উঁচুবর্ণের লোকেরা, (ঘ) এছাড়া বামপন্থী আন্দোলন বিশেষ করে সাম্যবাদী চিন্তাধারা সামাজিক বৈষম্যের মূলে কুঠারাঘাত করে।

এতদ্‌সত্ত্বেও ভারতের বেশীর ভাগ রাজ্যে জাত নিয়ে যে ধরনের নোংরা রাজনীতি চলছে তার প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আবহাওয়াও মাঝে মাঝে বিষাক্ত হয়ে পড়ে। তবে এখানে তামিলনাড়ুর ন্যায় ব্রাহ্মণ বনাম চেট্টিয়ার, বা অন্ধ্রের ন্যায় রেড্ডি বনাম কাম্মা, উত্তরপ্রদেশের ন্যায় জাঠ বনাম রাজপুত বা গুজরাটের বকসী বনাম পেটেলের ন্যায় প্রধান প্রধান জাত যথা কায়স্থ বনাম ব্রাহ্মণ বা বৈদ্যের মধ্যে

কোন বিরোধ দেখা দেয়নি। এখানে জাতের প্রশ্নটি মূলতঃ তপসিলী জাতের উন্নয়নের প্রশ্নের সাথে জড়িত।

পশ্চিমবঙ্গে তপসিলী জাতের অবস্থা

সরকারী ঘোষণায় পশ্চিমবঙ্গে মোট ৫৯টি জাতকে তপসিলভুক্ত করা হয়েছে। ১৯৮১ সালের জনগণনা অনুসারে এদের সংখ্যা হল ১২,০০০,৭৬৮ বা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ২১.৯৯ শতাংশ, ১৯৭১ সালে এদের আনুপাতিক হার ছিল ১৯.৯০ শতাংশ। অর্থাৎ ১৯৭১ সালের তুলনায় এদের আনুপাতিক হার বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২. শতাংশ। গত দশ বছরে এই হার বৃদ্ধির বহুবিধ কারণ থাকতে পারে যথা, (অ) বর্ণহিন্দুদের তুলনায় তপসিলী জাতের জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি, (আ) বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাওয়ার লোভে তপসিলী জাতরূপে নিজেদের পরিচয় দান, (ই) বিহার ও বাংলাদেশ থেকে অধিকসংখ্যক তপসিলী জাতভুক্ত ব্যক্তির আগমন ইত্যাদি।

তপসিলী জাতের অধিবাসীদের বেশীর ভাগই হল পল্লীবাসী প্রায় ৮৭.৬ ভাগ আর মাত্র ১২.৪ ভাগ হল শহরবাসী। অথচ পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসমষ্টির ২৬.৪৮ শতাংশ হল নগরবাসী। শহরে বসবাসের সাথে জীবনমানের উন্নতির একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। এ বিচারে তপসিলী জাতের লোকেরা অনেক পিছিয়ে আছে। স্বাক্ষরতার দিক থেকেও তারা অনেক পিছিয়ে আছে। যেখানে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিতের হার ৪০.৯ শতাংশ সেক্ষেত্রে এদের মধ্যে শিক্ষিতের হার মাত্র ২৪.৩৭ শতাংশ। পল্লী ও শহর উভয় অঞ্চলেই এবছর শিক্ষিতের হার গড় শিক্ষিতের হারের চেয়ে কম। পল্লী অঞ্চলে গড় শিক্ষিতের হার যেক্ষেত্রে ৩৩ শতাংশ সেক্ষেত্রে তপশিলী জাতের শিক্ষিতের হার ২২.৬২ শতাংশ। অনুরূপ শহরাঞ্চলে গড় শিক্ষিতের হার যে ক্ষেত্রে ৬২.৮ শতাংশ সেক্ষেত্রে এদের মধ্যে শিক্ষিতের হার হল ৩৬.৭৫ শতাংশ।[২৫]

আরও লক্ষণীয় যে তপসিলী জাতের মধ্যে শ্রমজীবীর সংখ্যা হল ৩,৫৪৭,৫৪৫ বা ২৯.৫৬ শতাংশ। এদের মধ্যে ৪২.৬৫ শতাংশ হল ভূমিহীন কৃষক, আর ৩০.১৭ ভাগ হল কৃষক। বিভিন্ন কলকারখানা, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত আছে মোট শ্রমজীবীর ৩ শতাংশ। বাকী ৩১ শতাংশ শ্রমিক বিচ্ছিন্নভাবে ছোটখাটো কারখানায় নিযুক্ত আছে। এদের মধ্যে আবার ৭ শতাংশের কাজের কোন নিশ্চয়তা নেই। এ হিসেব থেকে দেখা যায় যে মাত্র ২-৫ শতাংশ ব্যক্তি অর্থপূর্ণ কাজে নিযুক্ত আছে। কৃষিক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখা যায়। যারা কৃষিকাজে নিযুক্ত আছে তাদের মধ্যে আবার বেশীর ভাগই হল ছোট বা মাঝারী কৃষক।[২৬]

এক নজরে তপসিলী জাতের তুলনামূলক চিত্রটি হল নিম্নোক্তরূপ ঃ

(১৯৮১ সালের জন-গণনা অনুসারে)

	সাধারণ ভাবে পশ্চিমবঙ্গে	পশ্চিমবঙ্গে তপসিলী জাতে
জন সংখ্যা	৫৪,৫৮০,৬৪৭	১২,০০০,৭৬৮
মোট জনসমষ্টির শতকরা হার	——	২১·৯৯
শহরে বসবাসকারীর হার	২৬·৪৮	১২·৪০
পল্লী অঞ্চলে „ „	৭৩·৫২	৮৭·৬০
শিক্ষিতের হার	৪০·৮৮	২৪·৩৭
শহরাঞ্চলে „ „	৬২·৮০	৩৬·৭৫
পল্লী অঞ্চলে „ „	৩৩·০০	২২·৬২
শ্রমজীবীর সংখ্যা	—	৩,৫৪৭,৫৪৫
তপসিলী জাতের জনসংখ্যার শতকরা হার		২৯·৫৬
তপসিলী জাতের মোট শ্রমজীবীর মধ্যে		
কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত—		৭২·৮২
(ক) ভূমিহীন কৃষক		৪২·৫৭
(খ) কৃষক		৩০·১৭
অন্যান্য কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের শতকরা হার		২৭·১৮

বামফ্রণ্ট সরকারের নীতি

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার তপসিলী জাতের সমস্যাটিকে মূলতঃ উৎপাদনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে শোষিত শ্রেণীর সমস্যারূপে দেখে থাকে। যেহেতু তপসিলী জাতের বেশীর ভাগ ব্যক্তিই ক্ষেতমজুর ও দরিদ্র কৃষক সেহেতু এদের জীবনমানের উন্নতি ও সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নটি সামগ্রিকভাবে বঞ্চিত অবহেলিত দরিদ্র শ্রেণীর উন্নতি ও মর্যাদার প্রশ্নের সাথে জড়িত। বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে যুগ-যুগান্তরের সামন্ততান্ত্রিক প্রথা, মহাজনী ও বর্গাদারী ব্যবস্থা জগদ্দল পাথরের ন্যায় কৃষককুলের উপর চেপে বসে আছে, এবং জাতব্যবস্থাকে জিইয়ে রেখেছে। ব্যাপক গণআন্দোলনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে না পারলে নিম্নবর্গীয়দের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটানো সম্ভব নয়।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) পলিট ব্যুরোর সদস্য ও তাত্ত্বিক নেতা বি, টি, রণদিভে Class, Caste and Property Relations গ্রন্থে স্পষ্ট রূপেই বলেন, 'কৃষি বিপ্লবের জন্য সংগ্রাম, একচেটিয়া পুঁজি-মালিকদের আধিপত্যের ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান ঘটানোর জন্য সংগ্রাম, সমাজতন্ত্রে পৌঁছুতে জনগণতন্ত্রের রাষ্ট্রের জন্য সংগ্রাম—এ সবের যুক্ত সংগ্রামই হচ্ছে আমাদের সময়ের প্রধান সংগ্রাম। জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণের প্রশ্নকে এই প্রধান সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন

করে হিন্দু সামাজিক সংস্কারের প্রশ্ন হিসাবে আর উপস্থিত করা যায় না। তিনি আরও বলেন, "আমাদের সময়ের প্রধান শ্রেণী সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে বিভিন্ন শক্তি জাতিভেদ প্রথা বিরোধী সংগ্রাম চালাতে চেষ্টা করেছে তারা সকলেই ব্যর্থ হয়েছে।......আবারও প্রমাণিত হয়েছে যে জাতিভেদ প্রথা বিরোধী সংগ্রাম বিচ্ছিন্ন ভাবে চালানো যেতে পারে না, এই সংগ্রাম অবশ্যই চালাতে হবে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও শ্রেণীসংগ্রামের অংশ হিসাবে।" কারণ হিসেবে তিনি দেখান, "বর্তমান সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পত্তি সম্পর্কের ভিত্তির উপরই দাড়িয়ে আছে ; এই সম্পত্তি সম্পর্কই জাতব্যবস্থা ও শ্রেণী নিপীড়ন দুটোকেই জিইয়ে রাখছে।" অতএব তিনি মনে করেন, "জাতিভেদ প্রথার সমস্যার সমাধান হচ্ছে বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীর শাসনের অবসান ঘটানো এবং সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলা।"[২৭]

বর্ণবৈষম্যের প্রশ্নে বামফ্রন্ট সরকারের নীতি মোটামুটিভাবে রণদিভে বর্ণিত তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকারী ক্ষমতায় আসীন হয়ে যে ৩৬ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে তার মধ্যে ভূমিসংস্কার, দরিদ্রতম কৃষকদের জীবনমানের উন্নতি ও ক্ষেতমজুরদের সংবৎসর কাজ দেওয়ার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এতে প্রস্তাব করা হয় :

"উদ্বৃত্ত ও বেনামী জমির দখল এবং ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক ও খেতমজুরদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ। জমির বিভিন্ন ধরণের কেন্দ্রীভূত মালিকানা দূর করার জন্য এবং বর্গাদার ও ভূমিহীন কৃষক ও খেতমজুরদের উল্লেখযোগ্য সহায়তার জন্য ভূমিসংস্কার সংক্রান্ত আইনগুলির মৌলিক পরিবর্তন।

"কৃষকদের দুর্দশা লাঘবের জন্য তাদের বকেয়া ঋণ বাতিল করে দেওয়া। নামমাত্র সুদে ও সহজ কিস্তিতে পরিশোধনীয় নতুন ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা, মজুতদারদের বিরুদ্ধে কার্যকরী নিরোধক ব্যবস্থা।

পাঁচ একর পর্যন্ত জমির মালিকদের খাজনা মকুব। ভূমিহীন কৃষকদের জন্য সারা বছর ধরে কাজের এবং জীবনধারণের জন্য মজুরির ব্যবস্থা। বতমান নির্ধারিত হার থেকে তাদের ন্যূনতম মজুরির হার বৃদ্ধি। ন্যূনতম মজুরি প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করণ।[২৮]

এ সকল প্রকল্প কার্যকরী করায় সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয় তফসিলী জাতের লোক ও আদিবাসীরা। (ক) প্রথমে ন্যস্ত উদ্বৃত্ত জমির কথাই ধরা যাক। ১৯৮০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ন্যস্ত কৃষি জমি বিতরণের পরিমাণ ছিল ৬.৭৩ লক্ষ একর। তা বিলি করা হয় মোট ১১,৯৪,১৭৬ জন কৃষকের মধ্যে। এর মধ্যে তফসিল জাতভুক্ত কৃষকের সংখ্যা হল ৪,৪৩,০১৬ জন (৩৭%) আর আদিবাসী কৃষকের সংখ্যা হল ২,৩২,৬৯৫ জন (১৯'৪৮%) অর্থাৎ মোট কৃষকের ৫৬'৪৮ শতাংশ যদিও এদের মোট জনসমষ্টি হল (২২'৯+৫.৬)=২৮'৫ শতাংশ।[২৯]

(খ) ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বর্গাদার হিসাবে নথিভুক্ত করা হয় প্রায় ১২,৭৯,৯৪০ জন ভাগচাষীকে। এদের মধ্যে তফসিলী জাতভুক্ত ৩,৭৬,৯০৭ জন বা ২৯.৪৪ শতাংশ, আর আদিবাসীর সংখ্যা হল ১৫৫,৭১৫ জন বা ১২.১৬ শতাংশ।[২৯]

(গ) পশ্চিমবঙ্গ বাস্তুভিটা অধিগ্রহণ আইনানুযায়ী ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত ১,৭৫,৯৪৩ জন ক্ষেতমজুর, কারিগর, কৃষিজীবী ও মৎসজীবীকে বাস্তু জমির পাট্টা দেয়া হয়েছে, পাট্টা প্রাপকদের মধ্যে প্রায় ৭১ হাজার জন তফসিলী জাত এবং ৩৪ হাজার জন আদিবাসী, অর্থাৎ যথাক্রমে মোট প্রাপকের ৪০ ও ১৯.৩৪ শতাংশ।[৩০]

(ঘ) রবিচাষের জন্য ঋণদান কর্মসূচীতে যে ৫ লক্ষ ব্যক্তিকে ঋণ দেয়া হয় তার দুই তৃতীয়াংশের বেশী তফসিলী জাত ও আদিবাসীর লোক।[৩১]

সরকারী হিসাবে দেখা যায় যে "বিভিন্ন ভূমি সংস্কার ব্যবস্থায় উপকৃত ব্যক্তিদের প্রতি পাঁচজনের দুজন হলেন তফসিলী এবং একজন আদিবাসী"।[৩২]

বামফ্রন্ট সরকারের এই নীতির ফলে পল্লী অঞ্চলে নিম্নবর্ণীয়দের সাথে অন্যান্য জাতের পার্থক্য ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। তবে চাকুরী ও শিক্ষার ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষিত থাকায় এবং লোকসভা ও বিধান সভায় তপসিলী জাতের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকায় একদল সুবিধাভোগী লোক এই পার্থক্যকে জীইয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর। কেননা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধালাভের এটি এক সহজ উপায়।

ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় সংখ্যালঘিষ্ঠ কায়েমী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্যাতিত মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমেই তাদের স্বার্থ বজায় রাখতে সমর্থ হয়। বিদেশী ইংরেজ শাসকগণ হীন জাতের জন্য আসন সংরক্ষণের নামে হিন্দুসমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বকে আরও বাড়িয়ে তোলে। ১৯১৯ সালে এদের জন্য পৃথক নির্বাচনী এলাকা গঠনেরও প্রস্তাব করা হয়।

স্বাধীনোত্তর যুগে সমাজের এই অন্তর্বিরোধকে প্রশমিত না করে আরও বাড়িয়ে তোলার প্রয়াস চলছে। আসন সংরক্ষণের রাজনীতি ক্রমেই ব্যাপ্তিলাভ করছে। তপসিলী জাত ও আদিবাসী ছাড়াও এখন বিভিন্ন রাজ্যে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাম্প্রতিক গুজরাটের ঘটনাবলী তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বর্তমানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরাও আসন সংরক্ষণের দাবীতে ক্রমেই সোচ্চার হয়ে উঠছে।

এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে যতদিন আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা বজায় থাকবে নির্বাচনী রাজনীতির দৌলতে বর্ণভেদ ততদিন অব্যাহত থাকবে। তপসিলী জাতের মধ্যে যে এলিট গোষ্ঠী এর ফলে বিশেষ সুবিধালাভে সমর্থ হয়েছে তারা কখনো এ সুবিধা ছাড়তে সম্মত হবে না। তাছাড়া তপসিলী জাতের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের ফলে সুবিধাভোগীদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই যাবে। তখন সমাজের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর আরও মজবুত হবে।

যদিও এখনই সংরক্ষণের নীতির বিরোধিতা করা সম্ভব নয়; তথাপি সংরক্ষণের মাত্রা কিভাবে হ্রাস করা যায় বামফ্রণ্ট সরকারকে সে বিষয়ে ভেবে দেখা উচিত। অন্যথায় উত্তর ও দক্ষিণভারতের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গের বায়ুও অদূর ভবিষ্যতে জাতভেদের রাজনীতিতে দূষিত হয়ে পড়তে পারে।

নির্দেশপঞ্জী

১। Singh, Yogendra, Modernization of Indian Tradion, Faridabad, 1973 p. 14

২। রায়, নীহাররঞ্জন: বাঙালার ইতিহাস (আদি পর্ব), সংক্ষেপিত সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৭৩, পৃঃ ১১২

৩। বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র: রচনা সংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড), বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, ১৯৭২, পৃঃ ১৮২

৪। চাকলাদার, স্নেহময়: ভারতের জাতব্যবস্থা ও রাজনীতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃঃ ৮৮

৫। বিদ্যাসাগর, ঐ, পৃঃ ১৮৬

৬। Mazumder, R. C. (ed.): The History of Bengal, vol. 1, Hindu period, N. V. Publications, Patna 1971, p. 582

৭। ঐ: p. 572

৮। হাণ্টার, ডবলিউ ডবলিউ: গ্রাম বাংলার ইতিকথা, (বঙ্গানুবাদ) সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃঃ ৬৫-৬৬

৯। Mazumdar, ঐ: p. 567

১০। ঐ: pp. 568—70

১১। রায়, নীহাররঞ্জন, পৃঃ ১৫০

১২। Mazumdar, ঐ: p. 578

১৩। রায়, ঐ: পৃঃ ১৫৯

১৪। ঐ: পৃঃ ১৫৯

১৫। মজুমদার, বিমানবিহারী: চণ্ডীদাসের পদাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৬৭, পৃঃ ১৮

১৬। ঐ: পৃঃ ২৭

১৭। ঐ: পৃঃ ৩০

১৮। ঐ: পদ ১৮

১৯। ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত): বাংলার বাউল ও বাউল গান, ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, ১৩৬৪, পৃঃ ১২৩

২০। শাস্ত্রী, শিবনাথ : জাতিভেদ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা, ১৩৭০, পৃঃ ৭৮-৭৯

২১। Collet, Sophia Dobson : The Life and Letters of Raja Rammohan Roy, London, 1900, p. 213

২২। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ, ১৮১৭ শকাব্দ, পৃঃ ২৯-৩০

২৩। স্বামী বিবেকানন্দ : বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৭১, পৃঃ ৪১

২৪। Census of India, 1981, Series 1, Part II B (ii), Primary Census Abstracts, Scheduled Castes.

২৫। ঐ :

২৬। Randive, B. T. : Class, Caste and Property Relations, উদ্ধৃত, মনোরঞ্জন বড়াল : ভারতে জাতিভেদ প্রথা প্রশ্নে কমিউনিস্ট আন্দোলন, মার্কসবাদী পথ, ৫ই মে, ১৯৮৩, পৃঃ ৩৫, ৩৬।

২৭। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি : গৌরবোজ্জ্বল পাঁচটি বছর, নির্বাচনী প্রচার পুস্তিকা (২), কলিকাতা, ১৯৮২ পৃঃ ১১-১২

২৮। পশ্চিমবঙ্গ সরকার : ভূমিসংস্কার, পশ্চিমবঙ্গ, কলিকাতা, ১৯৮১

২৯। পশ্চিমবঙ্গ সরকার : পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রণ্ট সরকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা ১৯৮৪, পৃঃ ১৪

৩০। ঐ : পৃঃ ১৪

৩১। ঐ : পৃঃ ১৪

৩২। ঐ : পৃঃ ১৫

জাত-জাতি-জাতীয়তা

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

১

একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করুন। জাতিভেদ-ব্যবস্থায় নিম্নজাতির অধিকতর মর্যাদা দাবি করার একটি প্রক্রিয়া অনেকদিন প্রচলিত ছিল, সমাজতাত্ত্বিক এম. এন. শ্রীনিবাস যার নাম দিয়েছিলেন 'সংস্কৃতায়ন'। এই প্রক্রিয়ায় দেখা যেত যে নিম্নতর জাতি উচ্চ-জাতির আচার-ব্যবহার আদবকায়দা অনুকরণ করে দাবি জানাচ্ছে, আমরা মোটেই নিকৃষ্ট নই, ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে আমরা উচ্চজাতিরই সমান। এই দাবির সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুক্ত থাকত নবলব্ধ আর্থিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতা যার জোরে সেই জাতি, বা তার নেতৃস্থানীয় অংশ, ধর্মাচারের ক্ষেত্রেও অধিকতর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করত। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রায় সব অঞ্চলেই বিভিন্ন জাতির এই ধরনের সংস্কৃতায়ন প্রচেষ্টার কথা আমরা জানি। বলা বাহুল্য, দাবি জানালেই যে সে দাবি উচ্চজাতি মেনে নিত, তা নয়। কারণ উচ্চজাতির শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্নই হল নিম্নজাতির সঙ্গে তার আচারগত পার্থক্য। সব জাত যদি ব্রাহ্মণের মতো আচার-আচরণ করে তা হলে আর ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব থাকে কোথায়? ফলে 'সংস্কৃতায়ন' প্রক্রিয়ার মধ্যেও প্রকাশ পেত উচ্চনীচের সংঘাত। শ্রীনিবাসের মতো 'সংস্কৃতায়ন' এর তাত্ত্বিকেরা এই সংঘাতের দিকটা তেমন একটা অনুসন্ধান করেন নি। ধরেই নিয়েছেন যে এই প্রক্রিয়ায় যদি মর্যাদার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার কমবেশি সুযোগ জাতিভেদ-ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত থাকে তাহলে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতার ওঠাপড়া সত্ত্বেও সামগ্রিক কাঠামোটি অব্যাহত থাকবে। মৌলিক কোনো দ্বন্দ্ব সেখানে প্রকট হয়ে উঠবে না। উচ্চজাতির আচার-আচরণ অনুকরণীয়, এটা মেনে নিয়ে নিম্নজাতি যেমন উচ্চের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিত, তেমনি কিন্তু উচ্চজাতিকে একপ্রকার অমান্যও করত। কারণ নিম্নের এই অনুকরণ-স্পৃহা উচ্চজাতি মোটেই ভালো চোখে দেখত না। অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক-রাজনৈতিক কারণে সংস্কৃতায়ন যেমন সফল হত, অনেক বেশি ক্ষেত্রে কিন্তু তার ভাগ্যে জুটত উচ্চজাতির বিদ্রূপ, বিরোধিতা, সময় সময় কঠোর উৎপীড়ন। তবু জাতিভেদ-জনিত সংঘাতের ক্ষেত্র হিসেবে সংস্কৃতায়ন-নামক সামাজিক প্রক্রিয়াটি তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে পর্যন্তও যথেষ্ট চালু ছিল।

ইদানীং কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত একটা দাবি শোনা যাচ্ছে। নিম্নজাতি আর বলে না, ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে আমরা উচ্চের সমান। বরং বলে আমরা পৃথক, অবদমিত, বঞ্চিত। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে এদেশের ইংরেজ সরকার যখন জনগণনায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর হিসেব নিয়ে জাতি-মর্যাদা অনুযায়ী ক্রমিক তালিকা

প্রস্তুত করার চেষ্টা করত, বিভিন্ন জাতির পক্ষ থেকে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যেত— অমুক জাতির তুলনায় আমাদের নীচে বসানো হয়েছে কেন? আমরা আরো ওপরে বসার অধিকারী। এখন কিন্তু উল্টোটাই দেখা যায় বেশি। সরকারী তালিকায় কে কত নীচে বসবে, তারই প্রতিযোগিতা চলেছে। অতি সম্প্রতি তামিলনাড়ুতে বান্নিয়ার জাতির যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, তার দাবি হল যে তপশিলী জাতিদের মধ্যেও বান্নিয়াররা সবচেয়ে নীচে অবস্থিত, তারাই সবচেয়ে বেশি অত্যাচারিত। সুতরাং তপশিলী জাতিদের জন্য সরকারী সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা আছে, তার একটা নির্দিষ্ট অংশ আলাদা করে বান্নিয়ারদের জন্য সংরক্ষিত করতে হবে, অন্য তপশিলী জাতিরা তার ভাগ পাবে না। জাতিভিত্তিক দাবি জানানোর ক্ষেত্রে উচ্চতর জাতির সঙ্গে ধর্মীয় বা আচারগত মিল নয়, বরং তাদের সঙ্গে সামাজিক পার্থক্য প্রতিষ্ঠা করেই নিম্নতর জাতি রাষ্ট্রের কাছে পৃথক সুযোগসুবিধা প্রত্যাশা করছে। অন্যদিকে উচ্চজাতির দাবি কি? তারা বলছে, জাতিবৈষম্যের ভিত্তিতে সরকারি সুযোগসুবিধা সংরক্ষিত হবে কেন? রাষ্ট্রের চোখে সকলেই সমান, এটাই আধুনিক রাষ্ট্রের আদর্শ। সুতরাং সুযোগসুবিধা খুলে দেওয়া হোক। অবাধ প্রতিযোগিতা চলুক, যে যোগ্য সেই সুযোগ পাক। বলা বাহুল্য, মৌলিক সামাজিক অসাম্যই যেখানে সত্য, সেখানে অবাধ প্রতিযোগিতা আনা মানে যার প্রাথমিক ক্ষমতা বেশি, সেই অবাধ সুযোগের বেশি সদ্ব্যবহার করতে পারবে। উচ্চজাতি এটা বোঝে। ফলে বৈষম্য তুলে দিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠা করো, উচ্চজাতির এই দাবি আসলে তার চিরাচরিত ক্ষমতা বজায় রাখারই আধুনিক পন্থা।

কিন্তু তাহলে জাতিভেদ-ব্যবস্থার মূল কাঠামোটাই উল্টে গেল নাকি? যেখানে নিম্নজাতিরা বলে পার্থক্য বজায় থাকুক আর উচ্চজাতিরা বলে সবাই সমান, সে কেমন জাতিভেদ প্রথা? আমরা জানি এই নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে রাষ্ট্রীয় নীতির ফলেই। আধুনিক ইয়োরোপীয় ছাঁচে রাষ্ট্রীয় সংবিধানের উদারনৈতিক কাঠামো গ্রহণ করা সত্ত্বেও আজকের ভারতীয় রাষ্ট্র জাতিবৈষম্যের বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়েছে। এবং নীতি হিসেবে স্থির করেছে যে নিম্নতর জাতি যেহেতু সামাজিক বৈষম্য আর অত্যাচারের শিকার তার স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এবং তাকে প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা দেওয়ার জন্য বিশেষ আইনগত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আজকের ভারতে জাতিগত আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে-সব দাবি উঠছে, তা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেই উঠছে। বস্তুত, এই প্রসঙ্গে আর-একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা খেয়াল করা দরকার। জাতি নিয়ে যে-সব দাবির কথা গত বিশ-তিরিশ বছরে আমরা শুনেছি, তাতে ধর্মীয় আচার-আচরণের কথা খুব কমই আছে। প্রায় সব দাবিই সরাসরি অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক। এটাও খুব বড় রকমের পরিবর্তন। ধর্মীয় আচারের ক্ষেত্রে জাতিবৈষম্যের অনেক প্রথাই ইতিমধ্যে পালটেছে। খাওয়াদাওয়া, পোশাক,

পুজোআর্চা, ছোঁয়াছুঁয়ি ইত্যাদি দৈনন্দিন ব্যাপারে জাতিবৈষম্যের বহু চিরাচরিত নিয়ম ভেঙে গিয়েছে এবং যাচ্ছে। তা নিয়ে প্রকাশ্য বিরোধ যে খুব একটা হয় আজকাল, তা মনে হয় না। বিরোধ অনেক বেশি অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বৈষম্য নিয়ে। অথচ সেই ক্ষেত্রেই আমরা ধরে নিই যে আধুনিক অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সকলের আইনগত সাম্য প্রতিষ্ঠা করবে, তার ভিত্তিতে সামাজিক প্রতিযোগিতা হবে। আমাদের দেশে তা হচ্ছে না। অর্থনীতি-রাজনীতির 'সেকুলার' ক্ষেত্রেই জাতিগত বৈষম্য এবং তার ভিত্তিতে সংগঠিত দাবি প্রকট হচ্ছে। ধর্মাচারের ক্ষেত্রে পার্থক্য মুছে না গেলেও তা নিয়ে প্রকাশ্য বিরোধ বহুলাংশেই কমে গিয়েছে।

২

এ পোড়া দেশে কি তাহলে সব ঐতিহাসিক নিয়মই উল্টে যায়? উনিশ শতকের ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা বোধহয় একথা শুনলে আশ্চর্য হতেন না। তাঁরা তো বলেই ছিলেন, ভারতীয় সমাজকাঠামোর মূল নীতি ইয়োরোপের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইয়োরোপীয় সমাজের মূলে দ্বন্দ্বের ভেতর একটা ঐতিহাসিক গতি কাজ করেছে। ফলে সে সমাজে ঐতিহাসিক বিবর্তন ঘটেছে। তারই ফলে ইয়োরোপে এসেছে শ্রেণীসংঘাত, এসেছে পুঁজিবাদ, যুক্তিবাদ, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। ভারতীয় সমাজের কোনো নিজস্ব ঐতিহাসিক গতি নেই। একই সমাজকাঠামোকে ক্রমান্বয়ে জিইয়ে রাখা ছাড়া সে আর কিছু করতে পারে না। এর থেকেই ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা বলতেন, ইয়োরোপের উপনিবেশ হওয়াটা ছিল প্রাচ্যের ভবিতব্য। একটা জড়, অনড়, সনাতন প্রথাবদ্ধ সমাজকে উজ্জীবিত করা, তাকে গতিশীল করাই উপনিবেশবাদের ঐতিহাসিক কর্তব্য। ইয়োরোপ যদি ভারতীয় সমাজকে একেবারে গোড়া ধরে নাড়িয়ে না দেয়, সে কখনোই বিকশিত হবে না।

সাম্প্রতিকালের ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা কিন্তু আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। উপনিবেশ তো আর নেই, কিন্তু দু-শো বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের পরেও ভারতীয় সমাজ আধুনিক হয়েছে কি? তাঁরা বলছেন, হয় নি। হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ রাষ্ট্র বা অর্থনীতির আধুনিক রীতিনীতি বাইরে থেকে গুঁজে দিলেই চিরাচরিত সমাজকাঠামো পরিবর্তিত হবে, উনিশ শতকের মনীষীদের এই বিশ্বাস ছিল ভ্রান্ত। উপনিবেশবাদ আসলে কিছুই করতে পারে নি। কারণ ভারতীয় সমাজকাঠামোর মূল যুক্তি, তার মৌলিক ভাবধারা, এতই স্বতন্ত্র, ইয়োরোপের আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে তার অসঙ্গতি এতই গভীর, যে সবরকম পরিবর্তনই একান্ত ভাবে সীমিত থাকতে বাধ্য ছিল। ইয়োরোপের সংস্পর্শে এসে আধুনিক যুক্তিবাদী চিন্তার বীজ ভারতের জমিতে প্রোথিত হলেও তা থেকে যা জন্মেছে তা ইয়োরোপীয় আধুনিকতার বিকারমাত্র।

ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক লুই দুমো এই দুই ভাবধারার মৌলিক বৈপরীত্যের কথাটা খুব জোর দিয়ে বলেছেন। আধুনিক ইয়োরোপের সমাজকাঠামো যে আদর্শের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তার মূল কথা হল সাম্য। সেই আদর্শ বলে যে সমাজ তৈরি হওয়ার আগেও ছিল ব্যক্তি। ব্যক্তিরাই চুক্তির মাধ্যমে সমাজ তৈরি করেছে, রাষ্ট্র তৈরি করেছে। রাষ্ট্রের চোখে সব ব্যক্তিই সমান, আইনের চোখে সকলের সমান অধিকার। এই প্রাথমিক সাম্যের ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চলে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রতিযোগিতা। তাতে কেউ বেশি পায়, কেউ কম পায়। তা থেকেই সৃষ্টি হয় শ্রেণী, শ্রেণীবৈষম্য। শ্রেণীগত যে অসাম্য তার মূলেও রয়েছে সেই সাম্যের আদর্শ। ফলে শ্রেণীগত দাবি প্রতিষ্ঠিত হয় সাম্যের আদর্শেরই নজির দেখিয়ে। ভারতীয় সমাজেও অসাম্য রয়েছে; কিন্তু আদর্শের ক্ষেত্রেই সে অসাম্যকে স্বীকার করে নেয়। গোড়াতেই মেনে নেয়, সব মানুষ সমান নয়। জন্ম থেকেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠী পৃথক। এই পার্থক্য সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, প্রকৃতিদত্ত। তারই নাম 'জাতি'। এই দিক দিয়ে জাতির অর্থ ইংরেজি 'স্পিশিস'-এর অনুরূপ। ফলে আমরা যেমন মানবজাতি, বানরজাতি, সর্পজাতি, উদ্ভিদজাতি বলি, তেমনি আবার পুরুষজাতি, স্ত্রীজাতিও বলি, তেমনি অনায়াসে বলি আর্যজাতি, নিগ্রোজাতি, ইংরেজজাতি, ফরাসীজাতি, হিন্দুজাতি, খৃস্টানজাতি, বাঙালীজাতি, ওড়িয়াজাতি, ব্রাহ্মণজাতি, চামারজাতি। ভারত সরকার অবশ্য বলেন আমরা একটিই জাতি —ভারতীয়।

স্বাভাবিকভাবেই অসম এই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সম্মিলনে গঠিত যে সমাজ, তাতে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় কি করে ? যে উচ্চস্থান দখল করেছে, সে কি শুধু লাঠি দিয়ে পিটিয়ে (অর্থাৎ শুধুই দণ্ডনীতি অবলম্বন করে) ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে ? দীর্ঘস্থায়ী নীতি হিসেবে তা মোটেই ফলপ্রসূ হতে পারে না। উচ্চস্থান বজায় রাখতে হলে ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীকে প্রমাণ করতে হবে যে উচ্চস্থানে বসাটা তার ন্যায্য প্রাপ্য। অন্যদের দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে হবে যে সামগ্রিক সামাজিক প্রয়োজনেই উচ্চ-নীচের তারতম্যটা জরুরি। দুমোর বক্তব্য হল যে জাতিভেদ-প্রথাকে কেন্দ্র করে যে মূল্যবোধ ভারতীয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা এমনই এক আদর্শ প্রচার করতে সক্ষম হয়েছিল। সেখানে উচ্চনীচের বৈষম্য ক্ষমতার বৈষম্য নয়। সামগ্রিক সমাজের প্রয়োজনেই উচ্চনীচের প্রভেদটা জরুরী, কারণ নিম্নজাতি যেমন উচ্চের সাহায্য ছাড়া বাঁচতে পারবে না, উচ্চও তেমন নিম্নের সাহায্য ছাড়া বাঁচতে পারবে না। এই সামগ্রিক প্রয়োজনের বোধ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে সাধারণ ধর্ম, যার থেকে বিশেষ বিশেষ জাতির কর্তব্য নির্ধারিত হয়ে তৈরি হয়েছে জাতিধর্ম। জাতিধর্ম থেকে বিচ্যুতি মানে সাধারণ ধর্মের সংকট, কারণ প্রতিটি জাতিই সামগ্রিক সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রতিটি জাতির নিজস্ব স্থান বা মর্যাদা একমাত্র সামগ্রিক

কাঠামোর মধ্যেই নির্ধারিত হতে পারে, স্বতন্ত্রভাবে তার কোনো অস্তিত্ব বা অর্থ নেই।

পৃথক পৃথক জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে উচ্চনীচের সম্পর্ক নির্দিষ্ট করেই ভারতবর্ষের জাতিভেদপ্রথা সকলকে এক করেছে। এই একের ধারণাটা সকলে স্বীকার করে নিয়েছে। আদর্শ হিসেবে সকলে এটা গ্রহণ করেছে কারণ প্রত্যেকেরই এখানে নির্দিষ্ট স্থান আছে। কাউকে বাদ দিয়ে অন্যেরা চলতে পারে না। দ্যুমোঁর মতে এই আদর্শ আধুনিক ইয়োরোপীয় ভাবধারার সম্পূর্ণ বিপরীত, কারণ এখানে ব্যক্তি নেই, আছে জাতি, সাম্য নেই, আছে উচ্চনীচের ভেদ, প্রতিযোগিতা নেই, আছে পারস্পরিক নির্ভরতা।

ঠিক এইভাবে না বললেও, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মৌলিক প্রভেদ নিয়ে এ-ধরনের কথা আমরাও কিন্তু প্রায়শই বলে থাকি। যেটা দেখি না, সেটা হল যে এই জাতি-ভেদপ্রথার মূল নীতি নিয়ে বিরোধ কিন্তু ভারতীয় সমাজে কোনোদিনই অনুপস্থিত ছিল না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকারে এই সামগ্রিক ধর্মাদর্শ অমান্য করা হয়েছে—জাতিভেদব্যবস্থার ভেতর থেকেই হয়েছে। নিম্নজাতি শুধু উচ্চের আদর্শ অনুকরণ করে মর্যাদাবৃদ্ধির চেষ্টা করেছে, এটাই একমাত্র সত্য নয়। উচ্চের ধর্মাদর্শকেই সে বহুসময় অমান্য করেছে, বর্জন করেছে, বিপরীত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার দাবি জানিয়েছে। বস্তুত ভারতবর্ষের ধর্মীয় ইতিহাস, তার নানা পরিবর্তন, বিরোধ, নতুন ধর্মের প্রবর্তন, শাস্ত্রীয় ধর্ম আর লোকধর্মের নানা সংমিশ্রণের মধ্যে উচ্চনীচের পারস্পরিক ক্ষমতার বিরোধ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই ইতিহাস আমরা অনুসন্ধান করে দেখি নি। ফলে ভারতীয় সমাজে মৌলিক দ্বন্দ্বের চরিত্র এখনো আমাদের কাছে অস্পষ্ট। ইয়োরোপীয় সমাজের বিবর্তনের ছকের সঙ্গে তা মেলে না বলে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা বলে দিয়েছেন, এ দেশের নিজস্ব কোনো ঐতিহাসিক গতিই নেই। আমরা সে কথা মানতে পারি নি। কিন্তু সেই ইয়োরোপীয় ছকেই রেনেসাঁস, রিফর্মেশন, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদের ইতিহাস খুঁজেছি। খুঁজতে গিয়ে প্রতিপদেই দেখেছি, যে প্রক্রিয়ার যা ফল প্রত্যাশিত ছিল, তা হয় নি। সব উল্টে গিয়েছে।

দোষটা কি আমাদের সমাজব্যবস্থার? না আমাদের বিশ্লেষণের উপকরণের? যে তত্ত্বের ভেতর দিয়ে দেখছি, সেটাই হয়ত উপযুক্ত নয়। তাই যা দেখছি, মনে হচ্ছে অর্থহীন, উদ্ভট। যে তত্ত্ব নিয়ে, যে-সব ধারণা নিয়ে আমরা ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানীরা আমাদের নিজেদের সমাজ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি, তার সঙ্গে ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানীদের উপকরণের তফাত আছে কি? জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে পরের কাছ থেকে ধার করাটা অন্যায় নয় নিশ্চয়। কিন্তু যেটা ধার করছি তা আমাদের কাজে লাগছে কিনা। সেটাও কি আমরা যথেষ্ট বিচার করে দেখি? দেখলে কি আমরা নিজেদের সমাজের অ্যানথ্রপলজি নিজেরাই লেখার চেষ্টা করতাম? ইয়োরোপীয়

পণ্ডিতেরা তো ইয়োরোপের অ্যানথ্রপলজি লেখেন নি কখনো? তাদের কাছে সেটা তো শুধু অনগ্রসর, অনুন্নত, ভিন্ন সমাজের অধিবাসীদের জানার বিজ্ঞান। আমরা সেই প্রাচ্যবিদ্যা আর অ্যানথ্রপলজির উপকরণ দিয়েই জাতিভেদপ্রথা আর ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসের রহস্য খুঁজেছি। ফলে রহস্য রহস্যই থেকে যাচ্ছে। আমাদের অর্থনীতি-রাজনীতি-সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজেরাই যা করছি, নিজেদের কাছেই তা ধাঁধার মতো লাগছে।

বর্গের লড়াই বনাম বর্ণের লড়াই

দীপংকর চক্রবর্তী

এক

জাত-পাত নিয়ে বিভেদ-বৈষম্য ও অত্যাচার-নির্যাতনের ইতিহাস আমাদের দেশের একটি খুবই প্রাচীন 'ঐতিহ্য'—আর্য সভ্যতার শুরু থেকেই এই 'ট্র্যাডিশন' চলেছে, যদিও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে তার প্রকাশ ঘটেছে। আজকের ভারতবর্ষে এ নিয়ে যে একটু বেশি হৈ চৈ ও বিতর্ক শুরু হয়েছে, তার কারণ শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে 'নীচু' বর্ণের ও সংখ্যালঘু বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষেরা ক্রমশঃ বেশি শ্রেণী-সচেতন হয়ে উঠছেন এবং তার ফলশ্রুতিতে জাত-পাতগত বৈষম্য বিষয়ে তাদের চেতনা বাড়ছে, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তারা বেশি বেশি এগিয়ে আসছেন, এবং এই পটভূমিকায় কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূরা বিপন্ন বিস্ময়ে তাদের সনাতনী স্বার্থ ও প্রতিপত্তির দুর্গকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে জীবন-মরণ পাল্টা লড়াইকে তীব্র থেকে তীব্রতর ক'রে তুলছে। আর যারা নিজেরা হয়তো এরকম 'নীচু' বর্ণের বা সংখ্যালঘু জাতিসত্তার মানুষ নন, কিন্তু সমাজ-চেতনার আলোকে এ প্রসঙ্গে নির্যাতিতদের পক্ষ সমর্থন করছেন, সক্রিয়ভাবে তাদের পক্ষে লড়াইয়ে সামিল হতে চাইছেন, তারাও সবাই এই পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক ও বিপ্লবী অবস্থানটি কী হবে, তা নিয়ে বিভিন্ন বিতর্ক তুলছেন, এবং (অন্তত এ দেশের) যথারীতি, এ বিষয়ে কোনো ঐক্যমত অবস্থান গড়ে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছেন। জাত-পাতের বিষয়টি নিয়ে কিছু বলতে গেলে এই পটভূমিকাটি মনে রাখা খুবই জরুরী।

আমাদের দেশে প্রাচীন কালে শ্রেণী-সম্পর্ক তথা শ্রেণীবিভেদ এবং বর্ণবিভেদ প্রায় সমার্থক ছিলো। প্রাগৈতিহাসিক যুগের তুলনায় শ্রেণী-সমাজের প্রাথমিক পর্যায় উৎপাদনের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে যে অগ্রগতি ঘটেছিলো, তার ফলে সেই শ্রেণী-সমাজে মুষ্টিমেয় কিছু উচ্চবর্গের মানুষ কর্তৃক ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের ফলকে আত্মসাৎ ক'রে নিজেদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করার বাস্তব ভিত্তি তৈরী হয়েছিলো, এবং সামাজিক এই বিভাজনই রূপ পেয়েছিলো প্রাচীনকালের চতুবর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে। এই পটভূমিকায় নীচুবর্ণের শূদ্ররা সর্বাত্মকভাবে এবং উঁচুবর্ণের অন্যতম বৈশ্যরা আংশিকভাবে ছিলো নীচুবর্গের মানুষ, উঁচুবর্ণের প্রধান দুটি অংশ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা একই সঙ্গে আবার উঁচুবর্গের মানুষ হিসেবে তাদের ওপর শোষণ ও নির্যাতন চালাতো। শ্রেণী-বিভেদের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইসব বর্ণের মধ্যেও শ্রেণী-বিভেদ দেখা দেয় ও তা বাড়তে থাকে, কিন্তু কখনই তা প্রধান ভূমিকা নিতে পারেনি। পরবর্তীকালে দাসসমাজ থেকে সামন্তসমাজে উত্তরণের পরেও এই বর্ণ-বিভেদ মূলত অটুটই থেকে যায়, তবে এই সমাজের নতুন শ্রেণী-

সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে তার রূপ স্বভাবতই অনেকটা পরিবর্তিত হয়েছিলো। তার অন্যতম কারণ সম্ভবত ছিলো এটাই যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যেভাবে প্রধানত দাসবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে দাসসমাজ উন্নততর সামন্তসমাজে উত্তরিত হয়েছিলো, ভারতবর্ষে দাসবিদ্রোহের ব্যাপকতা মোটেই তেমন ছিলো না, এবং তার ফলে দাসযুগে ভারতীয় সভ্যতা উন্নতির যে চরম শিখরে আরোহণ করেছিলো, সামন্তযুগে ভারত উন্নতির সেই শিখরে উন্নীত হতে পারেনি, বরং সমাজের অবক্ষয় প্রথম থেকেই লক্ষণীয় ছিলো। এবং এই পটভূমিকায় উচ্চ বর্গ তথা বর্ণের শাসন-শোষণ প্রায় অব্যাহতই থাকতে পেরেছিলো।

ভারতীয় সামন্তব্যবস্থা এশিয়াটিক সমাজ্যব্যবস্থার যে বিশেষ রূপ নিয়ে গড়ে উঠেছিলো, তার উৎপাদন-সম্পর্কের একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, তা কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী উৎপাদকদেরকে জমির এবং সামন্তপ্রভুদের বেগার খাটার কাজেই আবদ্ধ রাখেনি, উপরন্তু বংশপরম্পরায় তাদের জীবিকাও অনেকাংশে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলো। প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজে তারা এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত ছিলো, এবং প্রকৃত অর্থে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকলেও মুষ্টিমেয় শাসকচক্র নীচুবর্গের মানুষদের দিয়ে জমিতে চাষ করাবার ব্যবস্থা করার মতো ক্ষমতা করায়ত্ত করেছিলো। এর সঙ্গে ছিলো প্রায় অটুট জাত-পাতগত মতাদর্শ ও সংস্কার। ফলত, নীচুবর্ণের লোকদের 'জন্ম জন্মান্তরের' শোষিত শ্রেণীগত অবস্থান তো ছিলই, তাছাড়াও উদ্ভব ঘটেছিলো তথাকথিত নীচু জীবিকার কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত অস্পৃশ্য বা হরিজনদের, বর্গ বা বর্ণ উভয় বিচারেই যাদের অবস্থান সমাজে ছিলো সবচেয়ে নীচে। এবং এভাবে শোষিত মানুষদের মধ্যেও সৃষ্ট হয়েছিলো প্রায় অনড় এক বিভেদের।

এই সামন্তসমাজেই নিজেদের স্বার্থে বৃটিশরা এদেশে উপনিবেশ স্থাপনের পর গোঁজামিল দিয়ে পরিবর্তন এনেছিলো। এদেশে পুঁজিবাদের স্বাধীন বিকাশ স্বাভাবিকভাবেই তাদের স্বার্থের অনুকূল ছিলো না, এবং সেটা তারা চায়ওনি, বরং তারা গাঁটছড়া বেঁধেছিলো সামন্তব্যবস্থা ও সেই ব্যবস্থার শোষক সামন্তশ্রেণীর সঙ্গে। ফলত সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মূল ভিত্তিটারও মৌলিক পরিবর্তন তারা ঘটায়নি, এবং তার ফলে প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজের জাত-পাত বিভেদের ওপরেও তেমন কোনো আঘাত তারা হানেনি। জমিকে তারা পণ্যে পরিণত করেছিলো, দেশজুড়ে প্রশাসনকে বিস্তৃত ও সেজন্য শিক্ষাবিস্তার করেছিল, এবং এর ফলে এই নতুন পরিস্থিতিতে যারা বৃটিশদের সহযোগী মিত্র হিসেবে, উচ্চবর্গে আরোহণ করেছিলো তারাও প্রধানত ছিলো সেই উচ্চবর্ণেরই লোক। এমনকি ঔপনিবেশিক আমলে কল-কারখানার বিকাশ ও বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে যে শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব ঘটলো, গ্রামের সামন্ত-ব্যবস্থা ও সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারার সঙ্গে তাদের আত্মিক ও বাস্তব যোগসূত্র এতোই ঘনিষ্ঠ ছিলো যে, প্রাক্-পুঁজিবাদী জাত-পাত ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা তারাও প্রধানত বর্জন

করতে পারেনি। এমনকি নতুন উৎপাদন ব্যবস্থায় যে নতুন ধরণের জীবিকা গড়ে উঠলো, সেক্ষেত্রেও উঁচু ধরণের জীবিকাগুলিতে প্রাধান্য পেলো সেই উচ্চবর্ণের লোকেরাই, নীচুবর্ণের লোকদের জন্য রইলো নীচু পদগুলি, বাগিচা (Plantation) শ্রমের মতো সবচেয়ে শোষিত নির্যাতিত অবস্থানগুলিই। ফলত এমনকি বিকাশমান শ্রমিকশ্রেণীও জাত-পাত বিভেদ থেকে সর্বাংশে মুক্ত হতে পারলো না।

বৃটিশ শাসনে এদেশে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটা সত্ত্বেও যে ভারতীয় সমাজের 'ঐতিহ্যগত' জাত-পাত ব্যবস্থাটির বিলোপ মূলত ঘটলো না, তার কারণ তাই আমাদের খুঁজতে হবে এ ঘটনার মধ্যেই যে, আমাদের দেশে নিজেদের শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যে গাঁটছড়া বেঁধেছিলো সেই প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তশ্রেণীর সঙ্গে যাদের অস্তিত্ব ও শোষণের বনিয়াদ মতাদর্শগত ভাবে অনেকটাই নির্ভরশীল ছিলো এই জাত-পাত ব্যবস্থার মধ্যে। একদিকে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল এই সামন্তশ্রেণী এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-নির্ভর দেশীয় একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণীর এই শ্রেণী সমঝোতা স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতেও যেহেতু মূলত অক্ষুণ্ণই রয়ে গেছে, এদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোতেও যেহেতু আজ পর্যন্ত মৌলিক কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, সেহেতু এদেশে জাত-পাত ব্যবস্থার ভিত্তিটাও মূলত অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। অর্থাৎ এক কথায় এদেশের মূলত সামন্ত বা আধা-সামন্ত ভূমিব্যবস্থা, এবং তারই সামাজিক ও জাত-পাতগত ভিত্তির ওপরে নয়া বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশের ফলশ্রুতিতেই আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত জাত-পাত ব্যবস্থার অস্তিত্ব রয়ে গেছে।

অবশ্য তার সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করা দরকার যে, বিশেষত স্বাধীনতা-পরবর্তী সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিক ভাবে জাত-পাত ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে আগের তুলনায় দুর্বল হয়ে গেছে। বিভিন্ন জাত-পাতের মধ্যেই যে শ্রেণী বিভেদ অনেক বেশি তীব্র, এবং ফলত জাত-পাতগত স্বাতন্ত্র্য অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে, গত তিন দশকের অসংখ্য সামাজিক ও জাত-পাতগত সমীক্ষা থেকে তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। কিন্তু তবুও, শ্রেণীভিত্তিক বিভাজন এদেশে এখনও পর্যন্ত এমন নির্দিষ্টরূপ অর্জন করতে পারেনি যে, জাত-পাতগত বিভাজনের মূল ভিত্তিটাকে তা অপসারণ করতে পারে। সে কারণেই, শ্রেণী বিভেদের পটভূমিকাতেই জাত-পাতগত বিভেদের বিশ্লেষণ আবশ্যিক হলেও, জাত-পাতবিরোধী লড়াইকে সবিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালিত হলে জাত-পাত ব্যবস্থার বিলুপ্তির নিশ্চয়তা তৈরী হতে পারবে না।

দুই

আবার অন্যদিকে শ্রেণী-সংগ্রামের পটভূমিকাটি বাদ দিয়ে জাত-পাতের বিরুদ্ধে লড়াই যে সমস্ত লড়াইকে শেষ পর্যন্ত কানাগলিতে ঠেলে দিতে বাধ্য, অতীত

অভিজ্ঞতাই তার অজস্র প্রমাণ বহন করছে। বস্তুত বৃটিশ আমল থেকেই বর্ণগত তথা বর্গগত শোষণের ধারাবাহিকতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের আন্দোলন গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে অনেক আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে গড়েই উঠেছে জাত-পাতের ভিত্তিতে, নীচুবর্ণের মানুষ কর্তৃক উঁচুবর্ণের মানুষদের বিরুদ্ধে। কিন্তু এ ধরণের আন্দোলন শেষ পর্যন্ত এই উপলব্ধিতে কখনোই পেঁছোতে পারেনি যে, বর্ণগত বিভেদের ভিত্তিটাই রয়ে গেছে প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজের উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে, বৃটিশ আমলেও যা মোটামুটি অটুটই ছিলো। এই উপলব্ধির অভাবের ফলে এ সব আন্দোলন জাত-পাত ব্যবস্থার ভিত্তিতে, অর্থাৎ সেই প্রাক-পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের ওপর, আঘাত হানতে, এবং তার ধারক ও বাহক বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন বা বর্তমান ভারতীয় শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আক্রমণের বর্শামুখ শেষ পর্যন্ত ও ধারাবাহিক ভাবে নিবদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। মহারাষ্ট্রের সত্যসাধক আন্দোলন, আম্বেদকারের লেবার পার্টি বা তামিলনাড়ুতে পেরিয়ারের জাস্টিস পার্টি প্রভৃতির করুণ পরিণতি এ কথারই প্রমাণ বহন করে।

অন্যদিকে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ক্রমবিকাশমান জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বও, যাদের প্রায় সবাই-ই ছিলেন উচ্চবর্ণের লোক, কখনও ঠাণ্ডা, কখনও গরম কর্মসূচী অনুসরণ ক'রে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতেই আগ্রহী থেকেছেন, এবং এজন্য জনসমর্থনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব ক'রে নীচুবর্গ তথা নীচুবর্ণের জনসাধারণকেও জাতীয় আন্দোলনে সামিল করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যেহেতু তারাও জমিদারী স্বার্থের বিরুদ্ধে কখনোই যাননি, বস্তুত শ্রেণীগত বিচারে তাদের যাওয়াটা সম্ভবও ছিলো না, সেহেতু জাত-পাত-বিভেদের মূলে আঘাত করার প্রশ্নটি প্রায় একেবারেই ওঠেনি। ফলত, অস্পৃশ্যতা বা জাত-পাত বিভেদের বিরুদ্ধে তারা সদিচ্ছামূলক অনেক বক্তৃতা দিলেও বা কর্মসূচী নিলেও, সাবেকী সমাজের জাত-পাতগত অবস্থানকে মৌলিকভাবে পরিবর্তনের কোনো কর্মসূচী জাতীয় আন্দোলন থেকে কখনোই দেওয়া হয়নি। বরং বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাত-পাতভিত্তিক প্রাচীন ভারতের মডেলটিকে তুলে ধরার পুনরুজ্জীবনবাদী ঝোঁক বারবার তাঁরা দেখিয়েছেন। গান্ধী তো প্রকাশ্যেই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার প্রতি তাঁর সর্বাত্মক সমর্থনের কথা অক্লান্ত ভাবে প্রচার করেছেন। তাই জাতীয় ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান জোয়ারে নীচুবর্ণের লোকেরা অনেকে এলেও, জাত-পাত বিভেদের মূল উৎপাটনে জাতীয় নেতৃত্বের দুর্বলতা ও বাস্তব সক্রিয়তার অভাব অনেক সময়েই তাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছে, এমনকি অনেক সময় নিজেদের জাত-পাতগত নিপীড়নজনিত বিক্ষোভের কারণে তারা জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে পর্যন্ত অবস্থান গ্রহণ করেছেন। কাজেই জাতীয় আন্দোলন বলতে যদি আমরা জাত-পাত-বর্ণ-বর্গ নির্বিশেষে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন বুঝি, ভারতের জাতীয় আন্দোলন কখনোই সেই চরিত্র প্রকৃতপক্ষে অর্জন করতে পারেনি।

এ প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট তথা বামপন্থী আন্দোলনের অতীতভূমিকার কথাও আলোচনা করা দরকার। বস্তুত কমিউনিস্টরাই প্রথম এই সঠিক সিদ্ধান্তটি উপস্থাপিত করেন যে, জাত-পাত ব্যবস্থার ভিত্তি নিহিত রয়েছে প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে। কৃষিবিপ্লবের মধ্য দিয়ে তার বিলুপ্তি ঘটিয়েই কেবল জাত-পাত ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটানো সম্ভব। আজ পর্যন্ত ভারতে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের সবচেয়ে সফল মডেলটি কমিউনিস্টরা গড়ে তুলতে পেরেছিলেন চল্লিশের দশকে তেলেঙ্গানায়, এবং সেখানেই কেবল তাদের এই সঠিক সিদ্ধান্তটির কার্যকরী ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়েছিলো। তাছাড়া ভারতের যেসব রাজ্যে বিশেষত কৃষক আন্দোলনে কমিউনিস্টরা বেশি শক্তি অর্জন করতে পেরেছিলেন, সেসব রাজ্যেই জাত-পাত ব্যবস্থার ভিত্তির ওপরে সবচেয়ে বেশি আঘাত হানা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তবুও কমিউনিস্টরা সারা দেশব্যাপী একটি নির্ধারক ভূমিকা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ, প্রথমত সারা ভারতের খুব সামান্য অংশেই কমিউনিস্টরা তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন। দ্বিতীয়ত (এবং প্রধানত), সঠিক উপলব্ধি সত্ত্বেও তাঁদের এ-সম্পর্কিত কর্মসূচীর মধ্যে কিছু মৌলিক ত্রুটি রয়ে গিয়েছিলো, এবং এখনও আছে। কমিউনিস্টরা শ্রেণী-সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গত ৫০/৬০ বছর ধরে গ্রহণ করে এসেছেন ঠিকই, কিন্তু কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে কোথায়ও সুনির্দিষ্টভাবে শ্রেণী-সংগ্রামের অঙ্গ হিসেবে জাত-পাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যথোচিত মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক লড়াই ব্যাপকভাবে তারা চালাননি। শ্রমিকদের আন্দোলন এখনও পর্যন্ত মূলত আবদ্ধ হয়ে রয়েছে অর্থনীতিবাদের গণ্ডির মধ্যে—তাঁদের মধ্যে জাত-পাতব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক লড়াই না চালানোর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই জাতপাতের প্রভাব থেকে তাঁরা মুক্ত হতে পারেননি। এবং তাঁদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জাত-পাতভিত্তিক আন্দোলনের নেতাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে নীচুবর্ণের শ্রমজীবী মানুষকে কমিউনিস্টদের প্রভাব থেকে সরিয়ে এনে নিজেদের সংকীর্ণ আন্দোলনের গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখা। এমনকি কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও কমিউনিস্টরা অনেকাংশে এ দুর্বলতা কাটাতে পারেননি। জাত-পাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মতাদর্শগত রাজনৈতিক লড়াই গড়ে তুলতে অবহেলা তো করা হয়েইছে, উপরন্তু 'লাঙ্গল যার জমি তার' এই শ্লোগানের ভিত্তিতে কৃষক আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে মর্মবস্তুর বিচারে বুর্জোয়া বিপ্লবের সীমিত গণ্ডি তাঁরা অনেকাংশেই ছাড়াতে পারেননি। এই স্লোগান কার্যকরী করতে গিয়ে সবচেয়ে নীচুবর্গ তথা বর্ণের দলিত কৃষক-মজুরদের প্রতি দায়িত্ব অনেকাংশেই তারা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অথচ সর্বাত্মক কৃষিবিপ্লবের সঠিক কর্মসূচী প্রণয়ন ও কার্যকরী করতে পারলে সবচেয়ে নীচুবর্গ তথা বর্ণের কৃষিজীবী মানুষের মধ্যেকার বিভিন্ন বিভেদকে উৎপাটন করা যায়। রুশ ও চীন বিপ্লব তার প্রমাণ দিয়েছে, এমনকি ভারতেও তেলেঙ্গানায় তার প্রমাণ

মিলেছে। বস্তুত ভারতের কৃষক আন্দোলন এখনও পর্যন্ত প্রধানত মধ্য ও গরীব কৃষকদেরকেই সবচেয়ে বেশি সংগঠিত করতে পেরেছে—বর্ণগত বিচারে যারা জাত হিন্দু। নেতৃত্ব প্রায় কোনোখানেই নিঃস্ব বা কৃষিমজুরদের মধ্য থেকে উঠে আসেনি —নাহলে, এটা কি ভাবতে বিস্ময় লাগে না যে, গান্ধী অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করার প্রায় দু'দশক পরে ১৯৪৫ সালেই প্রথম কমিউনিস্টদের পরিচালিত কিষাণসভা অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলো।

তিন

জাত-পাত বিষয়ে আজকের বিতর্ক প্রসঙ্গে কিছু বলবার আগে আর আরেকটি প্রবণতার উল্লেখ করা দরকার। বিগত পঞ্চাশের দশক থেকে বিশেষত মার্কিন সমাজ-তত্ত্ববিদদের প্রভাবে ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদরা ভারতীয় সমাজের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শ্রেণীর বদলে জাতের ভূমিকাকে অধিকতর প্রাধান্য দেবার একটি বিপজ্জনক, এবং স্বভাবতই মার্কসবাদ-বিরোধী, প্রবণতার জন্ম দিয়েছেন। এরা ভারতীয় সমাজকে সেই গ্রাম-সমাজের যুগ থেকেই মূলতঃ শ্রেণী-বিভাজনের ওপর নয়, বরং জাত-পাত-বিভাজনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ব'লে মনে করেন। তাদের মতে, শ্রেণী-সংগ্রাম নয়, বরং জাত-পাত-গত সমন্বয় বা সংগ্রামের মধ্যেই ভারতের প্রগতির পথ নিহিত রয়েছে। কাজেই, জাত-পাত-ভিত্তিক আন্দোলনগুলিকেই এরা শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্বভিত্তিক আন্দোলনের বিকল্প মডেল হিসেবে সমর্থন করেন এবং এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের সমাজে বর্ণ-বিভেদ তথা জাত-পাত-বিভেদের মূলে যে রয়েছে শ্রেণী-বিভেদ, সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রের শ্রেণী-বিভাজনই যে বর্ণ-বিভাজনে রূপ পেয়েছিলো—এই বাস্তব সত্যটিকেই তারা আসলে গুলিয়ে দিতে চান। স্বভাবতই, অতীত ও বর্তমান শাসকশ্রেণীর স্বার্থই এসব তত্ত্ব সুকৌশলে সিদ্ধ করছে। কোটি কোটি মেহনতী মানুষের শ্রেণী-চেতনা গুলিয়ে দিয়ে জাত-পাত-বিভেদের মধ্যে যদি আবদ্ধ রাখা যায়, তবে উৎপাদনের উপকরণের পরিপ্রেক্ষিতে এই শাসকশ্রেণী তাদের সঙ্গে যে উৎপাদন-সম্পর্কে আবদ্ধ, যেভাবে তারা প্রকৃত উৎপাদক মেহনতী মানুষদের উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ ক'রে এক চিরস্থায়ী শোষণের জোয়ালে তাদের বেঁধে রাখে—সে সবকিছুই গুলিয়ে দেওয়া যায়, এবং শাসকশ্রেণীর স্বার্থই সুরক্ষিত হয়। ভারতীয় মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবি মহলে মার্কিন প্রভাবিত ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিষয়ক এই চক্রান্তমূলক তত্ত্ব মূলত প্রত্যাখ্যাত হলেও, নতুন তত্ত্বের নামে সেই পুরানো বক্তব্যই ফিরে আসছে কিনা তা ভেবে দেখা দরকার।

চার

ভারতীয় সমাজে শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে শুধু জাত-পাতগতই নয়, তার সঙ্গে

জাতিসত্তাগত, ধর্মীয় প্রভৃতি যে বিভেদেব বীজ দীর্ঘদিন ধরে কাজ ক'রে চলেছে, 'স্বাধীনতা' বা 'সমাজতন্ত্র' বা 'একুশ শতকের দিকে যাত্রা' প্রভৃতি যে শ্লোগানই মুখে দিক না, শাসকশ্রেণী নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থেই এগুলোকে জিইয়ে রাখতে চায়, আজও চাইছে। শ্রমজীবী মানুষকে বিভক্ত ক'রে রাখার এই 'ঐতিহ্যগত' চক্রান্তের সামনে বিপ্লবীরা কোন অবস্থান গ্রহণ করবেন? তারা কি অতীতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতো, এই সব বিভেদের মূল উৎস সম্পর্কে সচেতনতা সত্ত্বেও, শ্রেণী সংগ্রামের জোয়ারে এই সব বিভেদ ধুয়ে মুছে যাবে ব'লে আত্মতুষ্টিতে ভুগবেন? না, জাত-পাত, বা সংখ্যালঘু জাতিসত্তা বা ধর্মীয় গোষ্ঠীভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর এবং তার মাধ্যমে এ সবের ভিত্তিতে চলতে থাকা শোষণ-নির্যাতনের অবসান ঘটাবার কর্মসূচীকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে মৌলিক শ্রেণী-সংগ্রামের গুরুত্বকে গৌণ স্থানে ঠেলে দেবেন? এটাই আজকে বিপ্লবীদের সামনে প্রধান প্রশ্ন।

প্রধান লাইনটি অনুসরণ করার ফল কী হয়েছে, অতীতের কমিউনিস্ট আন্দোলনই তাব সাক্ষ্য বহন করছে। এর পরিণতিতে দেশের কিছু কিছু অঞ্চলে বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে জাত-পাতগত বা অন্যান্য বিভেদ কিছুটা সীমিত হলেও তার অবসান ঘটেনি, অদূর ভবিষ্যতে তা ঘটার লক্ষণও চোখে পড়ছে না। আর দ্বিতীয় লাইনটিও কি তার চেয়ে কিছু ভালো ফল দেখতে পেরেছে? মূলত জাত-পাত-ভিত্তিক অতীত আন্দোলনগুলির পরিণতিও আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে। সাধারণভাবে শ্রেণী-সংগ্রামের পটভূমিকার কথা ব'লে বা এসব বিভেদের মূল উৎস প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের বিরুদ্ধে সাধারণ স্লোগান তুলে জাত-পাত বা জাতিসত্তা বা ধর্মীয় গোষ্ঠীভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তুললেও তার পরিণতি মূলত অন্যরকম কিছু হবে ব'লে মনে করার কারণ নেই। এর ফলে সেই সব জাত-পাত বা ধর্মীয় গোষ্ঠী বা জাতিসত্তার কিছু মানুষের বাড়তি সমর্থন হয়তো মিলছে, বা মিলবেও, কিন্তু সমাজ বদলের মূল কর্মসূচীকে তাঁরা একই সঙ্গে মেনে নেবেন বা তাকে কার্যকরী করতে এগিয়ে যাবেন, এমন প্রমাণ কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। এই পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮২-তে এরকম এক সংখ্যালঘু জাতিসত্তা-ভিত্তিক মোর্চার সমর্থন নিয়ে নির্বাচন প্রার্থী জনৈক কমিউনিস্ট বিপ্লবীর নির্বাচনী প্রচার পত্রে তাই কৃষি বিপ্লবের কোনো উল্লেখ পর্যন্ত করা যায় না, এটা আমরা দেখছি। অতিসম্প্রতি উগ্র ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল একটি পত্রিকায় তাই বড়ো বড়ো অক্ষরে 'ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে' কমিউনিস্ট বিপ্লবী নেতার জেহাদ ছাপা হলেও, শ্রেণী সংগ্রামের উল্লেখমাত্র তাতে করা হয় না। এবং এ সব কিছুই সোচ্চার প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে: নিপীড়িত বর্ণ বা জাতিসত্তা বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর শোষণ-নির্যাতন বিরোধী আন্দোলনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে এবং কার্যত শ্রেণী-সংগ্রামকে

গৌণ ভূমিকায় সরিয়ে দিয়ে এ দেশের শোষণ-ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তিকে কি আদৌ বিধ্বস্ত করা যায় ?

এ প্রসঙ্গে 'পিছিয়ে-পড়া' বর্ণ বা জাতিসত্তার লোকদের জন্য চাকরী-শিক্ষায়তনে আসন প্রভৃতি সংরক্ষণের প্রশ্নটিও এসে পড়ে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শোষিত-নিপীড়িত পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য এই সংরক্ষণের দাবীটি নিঃসন্দেহে একটি ন্যায্যসঙ্গত দাবী। কিন্তু এদেশের শাসকশ্রেণী এবং তাদের মদৎপুষ্ট রংবেরঙের, রাজনৈতিক দলগুলি যেভাবে এই সংরক্ষণের প্রশ্নটিকে শাঁখের করাতের মতো ব্যবহার করছে, তাতে একদিকে আইন অনুসারে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য যথোপযুক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা কার্যকরী হচ্ছে না, অন্যদিকে অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত উচ্চতর বর্ণের মানুষেরা ক্ষুব্ধ হচ্ছে। সব মিলিয়ে জাত-পাতগত বিভেদের তীব্রতাই অনেক বেড়েছে—যেমনটি ঘটেছে সাম্প্রতিক কালে বিহার মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশে—এবং এসবের ফলে শ্রেণীগত বিভাজন সম্পর্কিত চেতনাই হয়ে পড়ছে বিভ্রান্তির শিকার। অনেক বেশি সন্তর্পণে এবং শ্রেণীচেতনা বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়ে শাসকশ্রেণীর এই চক্রান্তের মোকাবিলা করাটা যখন জরুরী হয়ে পড়েছে, তখন এদিকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধু সংরক্ষণের দাবীর পক্ষে সোচ্চার হলে, এমনকি নোতুন নোতুন জাত-পাত বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর জন্য অধিকতর সংরক্ষণের জন্য লড়াই শুরু করলে, সেটা পরোক্ষ-ভাবে শাসকশ্রেণীর সেই চক্রান্তকেই সিদ্ধ করছে কিনা, তা গভীর ভাবে ভাববার সময় এসেছে।

তার মানে আবার কখনোই এই নয় যে জাত-পাত বা জাতিসত্তাগত বা ধর্মীয় গোষ্ঠীগত শোষণ-নির্যাতনের ব্যাপারে সবিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে শুধুমাত্র শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্ব আওড়ালেই সমস্যার সমাধানের পথ প্রশস্ত হবে। সেকথা আগেও বলেছি। এই সব বিভেদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে সুনির্দিষ্টভাবে, কিন্তু সে লড়াইকে গড়ে তুলতে হবে সামগ্রিক শ্রেণী-লাইনের পটভূমিকায় সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে। প্রশ্নটি সামাজিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে জাত-পাত ইত্যাদির ভূমিকা অস্বীকার করার মধ্যে নিহিত নেই—নিহিত রয়েছে সামগ্রিক শ্রেণী সংগ্রাম ভিত্তিক বৈপ্লবিক রণনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এর অবস্থান ও ভূমিকার স্বীকৃতি, উপলব্ধি এবং তার অবসানের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে। বস্তুত, অতীতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে এ প্রসঙ্গে যে বিভ্রান্ত ছিলো, সেই বিভ্রান্তির উৎসে যেতে হবে, শ্রমজীবী শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে অগ্রণী অংশকে দায়িত্ব নিতে ও নেতৃত্ব দিতে হবে, যাতে একদিকে কলে-কারখানায়, মাঠে-ময়দানে, অফিস-কাছারী-স্কুল-কলেজে তথাকথিত উচ্চবর্ণের বা জাতিসত্তার বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর শ্রমজীবী মানুষেরাই সামাজিক ক্ষেত্রে জাত-পাত বা জাতিসত্তা বা ধর্মীয় গোষ্ঠীগত সমস্ত বিভেদ, কুসংস্কার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সক্রিয় অংশ নিতে এগিয়ে আসেন ; এবং অন্যদিকে পিছিয়ে-পড়া জাত-পাত-জাতিসত্তা বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষেরা শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে গিয়ে সংকীর্ণ

জাত-পাত বা অন্যান্য গোষ্ঠীর শ্রমজীবী মানুষদের সঙ্গেই শুধু নয়, উপরন্তু সমস্ত জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গেই শ্রেণী-সংহতি গড়ে তুলতে পারেন। এবং এই বিভিন্নমুখী অথচ সুসমন্বিত যৌথ আক্রমণের মধ্যে দিয়েই কেবল বিকশিত হতে পারে আমাদের দেশে শ্রেণীগত এবং একই সঙ্গে বর্ণ-জাতিসত্তা-ধর্মীয় গোষ্ঠীগত সমস্ত ধরণের শোষণ-নির্যাতনের জোয়াল থেকে মানুষের মুক্তির জন্য প্রকৃত সংগ্রামী মোর্চা।

হলেও, শ্রেণ।

প্রশ্ন জাগিয়ে

নির্যাতন বিরোধ

তপশীলী, আদিবাসী ও এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ

মহাশ্বেতা দেবী

বিমলা হরির বয়স ছিল চব্বিশ। সে কাঁচড়াপাড়ার এক গরিব হরিজন মেয়ে। ডেঙাপাড়া মেথর কলোনির বাসিন্দা। কল্যাণী কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে ও ১৯৭৯ সালে নাম লেখায়। আজ আর তার ডাক আসার জন্য বসে থাকার দরকার নেই। বিমলার সমস্যা ও নিজেই সমাধান করেছে আত্মহত্যা করে। ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ডেঙাপাড়ায় গিয়েছিলাম তরুণ, সাহসী সমাজসেবী হরিজন তরুণ রাজেন্দ্র বাশফোরের নির্মম হত্যার পর। তখন বিমলাকে কি দেখেছিলাম? মনে করতে পারি না। কাঁচড়াপাড়ার হরিজন বসতিগুলিতে চুল্লুর ঠেক বসিয়ে যে মস্তানরা দাপটে রাজত্ব করছিল, "চোলাই কারবার বন্ধ করো" বলে রাজেন্দ্র তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় দুঃসাহসে। হরিজন কল্যাণ সমিতি অনেক কিছুর জন্য লড়ছে, চোলাই কারবার তার অন্যতম। ডেঙাপাড়ার হরিজন প্রাথমিক স্কুল ভেঙে পড়ছে, পথ বলতে কিছু নেই, কাঁচা নর্দমাগুলো ভয়ানক অস্বাস্থ্যকর, দারিদ্র আর সরকারী ও পৌর ঔদাসীন্যের নগ্ন ছবি চারদিকে। অথচ কাঁচড়াপাড়ায় হাজার হাজার হরিজন থাকে। তাদের বসতি হয় রেলের জমিতে, নয় পৌরসভাধীন এলাকায়। ওরা নিজেদের জীবন বদলাতে চায়, সত্যিই চায়। কিন্তু অন্যেরা তো চায় যে ওরা ওইভাবে পচে মরুক। বিমলা হরিও বাঁচতে চেয়েছিল। চার বছর ও অপেক্ষাও করেছিল। এক্সচেঞ্জে ওর ডাক এল না। কখনোই আসে না।

আমার হাতের সামনে যে তালিকা, তাতে কল্যাণী, বারাকপুর ও নৈহাটি এক্সচেঞ্জ নাম লেখানো পঁয়তাল্লিশ জন হরিজনের নাম আছে। অনেকে ১৯৭৮-এ নাম লিখিয়েছেন, আজও সাড়া পাননি।

পুরুলিয়া হল যেমন গরিব, তেমন পিছিয়ে থাকা জেলা। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে অবহেলিত জেলা। জেলার মধ্যে বান্দোয়ান ও মানবাজার-২ আবার তার মধ্যেও অবহেলিত দুই ব্লক। ওখানেই থাকে হতভাগ্য খেড়িয়া, বিরহড়, পাহাড়িয়া, সাঁওতালরা। ওই দুটি ব্লকে আজও কোনো পাকা রাস্তা নেই যাতে সদরে যাওয়া চলে। মানবাজার-২তে তো কোথাও যেতে হলেই মাইল মাইল পায়ে হাঁটতে হয়। স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বছরেও পুরুলিয়া নগ্ন ঔদাসীন্যে অবহেলিত। যেসব জায়গার

নাম করলাম, ওগুলি প্রধানত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। সাঁওতালরা অবশ্যই ওদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী এবং ওদের মধ্যে শিক্ষার হারও তুলনায় বেশী। ওদের মধ্যে সমাজ ও রাজনীতিচেতনাও বেশি। চুরকু গ্রামে থাকেন স্বাধীনতাসংগ্রামী বৃদ্ধ কানুরাম শবর। উনি একটা বৃত্তি পান বটে, কিন্তু এই খেড়িয়াশবর বৃদ্ধের ছেলেরা পুরুলিয়া এক্সচেঞ্জের বান্দোয়ান শাখা থেকে কোনো ডাক পায়নি।

বান্দোয়ান এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো পঞ্চান্ন জনের তালিকা দেখছি। কয়েকজন গ্রাজুয়েটও। সাঁওতাল জীবনচন্দ্র মুরমু ১৯৭০ সালে নাম লেখায়। ১৯৭৫ থেকে লেখানো অনেক নামও আছে। সাঁওতাল গ্রাজুয়েট হতে পারে, এক্সচেঞ্জে নাম লেখাতে পারে, তবু কাজের সুযোগ সে পায় না। নাম লেখানো ছেলেমেয়েদের গ্রামে প্রাথমিক স্কুল খোলা হয়, শিক্ষক নেয়া হয়, শিক্ষাপ্রাপ্ত আদিবাসী কিন্তু বেকারই থেকে যায়। তারপর বহু বছর ব্যর্থ প্রতীক্ষার পর ওরা শিক্ষাতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার তুলনায় মেদিনীপুর অনেক বেশি রাজনীতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্য দিয়ে গেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরে অনেক আদিবাসী। এখানে আছেন সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভুমিজ, লোধা, হো, মাহালী, কোড়া, বাইগা ও অন্যরা। দারিদ্র্যের কারণে গরিবরা খেতকাপড়ের বিনিময়ে শিশুদের গরুবাগালী কাজে পাঠান। বর্তমান রাজ্য সরকার গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক স্কুল খুলেছেন বটে, তবে জনসংখ্যা অনুপাতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই কম। তা সত্ত্বেও যখন কোনো গরিব ছেলে বা মেয়ে বৃত্তি পরীক্ষা দেয়, তাতে পরিবারকে অনেকটা স্বার্থত্যাগ করতে হয়। কেননা ওই ছেলেমেয়েদের রোজগার থাকে না শিক্ষাকালে। যখন লোধা জাতির গান্ধী মল্লিক ডালকাটি গ্রাম থেকে, বা কৃষ্ণপ্রসাদ ভক্তা চাকুয়া গ্রাম থেকে অষ্টম বা নবম শ্রেণী অবধি পড়ে, ঝাড়গ্রাম এক্সচেঞ্জে নাম লেখায়, ততদিনে তারা চাকরি পাবার বয়সে পৌঁছেছে। ওদের মতো আর যারা আছে, সকলেরি মনে হয় যে পড়ার জন্য পারিবারিক দায়দায়িত্ব অনেক অবহেলা করা হয়েছে, এখন কাজ পাওয়া দরকার। গান্ধীর নাম ১৯৭৬ থেকে এবং কৃষ্ণপ্রসাদের নাম ১৯৭৮ থেকে লেখানো আছে।

ঝাড়গ্রাম, বেলদা, মেদিনীপুর ও খড়গপুর এক্সচেঞ্জে লেখানো ১৭৭ জন শিক্ষা-প্রাপ্ত কুর্মী, সাঁওতাল, মুণ্ডা, লোধা ও মাহালি ছেলের নাম আমার সামনে।

মাহালিরা সংখ্যায় খুবই কম। ১৯৭৫ থেকে লেখানো অন্তত একশোটি নাম দেখছি। তার মধ্যে ছয়জন মাহালি হতভাগ্যের নামও আছে।

মুর্শিদাবাদের পরমেশ্বর মারাণ্ডি সাঁওতাল। এই উৎসাহী সমাজকর্মী যুবকটি বহরমপুরের কৃষি আয়কর আপিসে কর্মী এবং স্বীয় সংগঠনের মাধ্যমে নানা কাজ করে। মুর্শিদাবাদ জেলা হিসেবেই অত্যন্ত উপেক্ষিত, অতি অনুন্নত। পর্যটন-স্থান হিসেবে এর যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, সে বিষয়ে চূড়ান্ত অবহেলা। বিখ্যাত হাজারদুয়ারী প্রাসাদের যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ, উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ, অন্তত সেখানে পেঁছবার পথঘাটের ব্যবস্থা, এজন্য জেলাবাসী আজও অপেক্ষা করে বসে আছে। সাঁওতালরা কবে কেমন করে মুর্শিদাবাদে এল, তা জানবার জন্যই পরমেশ্বর প্রথমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। জেলার বেশ কিছু সাঁওতাল দীর্ঘকাল ধরেই খ্রীশ্চান। তাদের মধ্যে শিক্ষার হারও যথেষ্ট উন্নত। ভাবলে অবাক লাগে, দুঃখও হয়, আজও আমাদের সমাজে অনেকে আদিবাসী মানেই সাঁওতাল বলেন। কত শুনেছি যে বীরসা মুণ্ডা সাঁওতাল বিদ্রোহ করেছিলেন। প্রতিবেশীকে আমরা এত কম চিনি কেন?

পরমেশ্বরের পাঠানো এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো শিক্ষাপ্রাপ্ত সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের একশো নয়টি নামের তালিকায় দেখছি, মুর্শিদাবাদের এক্সচেঞ্জগুলি এঁদের কোনদিন ডাকেনি। ধোবাগুড়িয়া গ্রামের স্বরেন মুর্মুর নাম ১৯৭৪ সালে লেখানো। বহু ছেলে, বহু মেয়ের নাম ১৯৭৫ থেকে লেখানো আছে।

পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, কাঁচড়াপাড়া, মুর্শিদাবাদ, এ তো সামান্য কয়েকটি মাত্র। বলা চলে বিন্দুপরিমাণ, ওইসব জেলা ও অন্য জেলাতে সিন্ধুপরিমাণ এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো আদিবাসী ও তপশীলী নিশ্চয় আছেন।

এইসব নাম যাঁদের, তেমন কয়েক শত জনকে তো আমি চিনি। চিনি বলেই ওদের বেকারত্বের ব্যাপারটা আমার কাছে খুব সত্যি।

স্বীকার করছি যে সারা পশ্চিমবাংলায় বেকারি আজ এক নিদারুণ, ভয়ংকর সমস্যা। যুব সমাজের সামনে এক বিরাট অন্ধকার অনিশ্চয়তা। যাঁরা তপশীলী বা আদিবাসী নন, তাঁদের সমস্যা নিশ্চয় বিশাল, অপার। একথাও সত্যি যে সংরক্ষিত পদের বিরুদ্ধে অনেক চিঠিপত্র খবরের কাগজে দেখি।

মজা হচ্ছে, "এইসব আসন সংরক্ষিত", এ ঘোষণা কিন্তু সত্যি সত্যি আদিবাসীর বেকার সমস্যার সমাধানে কোনো সাহায্য বলতে গেলে করছে না। আদিবাসীর শিক্ষালাভের সুযোগটা দেখুন। প্রাথমিক পর্যায়ের পর যে পড়বে, মাধ্যমিক বা

কলেজ তার গ্রাম থেকে অনেক দূরে। আবাসিক ব্যবস্থা এত কম, যে সেজন্যও সে পড়তে পারে না। তারপর সমীক্ষা করলে দেখা যাবে, বাণিজ্যিক বা বিজ্ঞান শাখায় আদিবাসী শিক্ষার্থী খুব কম। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষা, বা প্রযুক্তি শাখায়, তার কাছে স্বপ্ন। পশ্চিমবঙ্গে কয়জন আদিবাসী বি. এস. সি. / এম. এস. সি. / বি. কম. / এম. কম / ডাক্তার / ইঞ্জিনিয়ার / বিজ্ঞানী হয়েছেন? অথবা হাইস্কুলে শিক্ষক / শিক্ষিকা, বা কলেজে অধ্যাপক / অধ্যাপিকা কয়জন?

তাই যেসব চাকরিতে স্নাতক / স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দরকার, বিশেষ করে স্পেশালাইজড স্টাডিতে, সেখানে সংরক্ষিত পদের ঘোষণাটি আদিবাসীর ক্ষেত্রে প্রহসনমাত্র। কোন্ আদিবাসী মেরিন বায়োলজিস্ট, নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট বা হেমাটোলজিস্ট পদে চাকরি পান? ওঁরা তো বাণিজ্যিক পাঠক্রমেও বলতে গেলে পড়েন না, সুযোগই পান না। ইকনমিক্স, অ্যাকাউন্টেন্সি বা বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়ছেন, এমন আদিবাসী কোথায়?

সাধারণত আদিবাসীর শিক্ষা প্রাথমিক স্কুলেই শেষ হয়। বড় জোর ছয় ক্লাস, নয়তো আট ক্লাস। লোধা বা মাহালি ক্বচিৎ মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক অবধি পৌঁছান। সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা বা ভূমিজ হয়তো মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক শেষ করতে চেষ্টা করেন। যখন পারেন না, সে তো দারিদ্র্যেরই কারণে। সাঁওতালরা সবচেয়ে অগ্রণী। তাঁরা যদিবা সামান্য কয়জন বি. এ. বা এম. এ. পড়েন, তাও আর্টসে, বিজ্ঞানে বা অন্য বিষয়ে নয়। তাই যখন চাকুরি যাঁরা দেবেন, সেই সংস্থা আদিবাসী ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, টেকনিশিয়ান চেয়ে বিজ্ঞাপন দেন, একশোর মধ্যে নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে "আদিবাসী যোগ্য প্রার্থী পাওয়া গেল না" বলে বাইরে থেকে লোক নিতে হয়। যে-কোনো নিরপেক্ষ সমীক্ষায় প্রমাণ হবে ভালো মাইনের প্রতিযোগিতামূলক চাকরিতে আদিবাসী প্রার্থী বাস্তবে পাওয়া যায় না।

অবশ্যই এমন চাকরিও আছে যাতে আদিবাসী ও তপশীলী প্রার্থী পরীক্ষায় বসতে পারেন। ব্যাঙ্ক ও সরকারী অফিসে কেরানীর কাজ যেমন। এসব চাকরির বিজ্ঞাপন যখন বেরোয়, তখন সুদূর গ্রামে বসে তার খবর পাওয়াও কঠিন, এবং খবর পেলেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফর্ম পূরণ ও দাখিল (সহস্র নিয়ম মেনে) করাও কঠিন। আদিবাসীর জন্যে এখানেও পদ সংরক্ষিত আছে। কিন্তু জেলার এক্সচেঞ্জ সেসব খবর রাখেন না। আমি জেনে খুব অবাক হয়েছি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রকে খোদ রাইটার্স বিল্ডিঙে একটি আদিবাসী এমপ্লয়মেন্ট

সেল্ আছে। এই সেল্ কি কাজ করে, আদিবাসীদের চাকরি পেতে কি সাহায্য করে, তা কেউ জানে না।

এই সেলের তো উচিত, প্রথমত রেজিস্টার্ড আদিবাসী সংগঠনগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা। আদিবাসীদের বিভিন্ন সংগঠনই বেকার ও এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো ছেলেমেয়ের তালিকা জোগাতে সক্ষম। তারপর এই সেলের উচিত, কোথায় আদিবাসীর জন্য চাকরি খালি আছে সে খবর (ক) সংগঠনগুলির কাছে পৌঁছানো (খ) জেলার এক্সচেঞ্জকে নাম পাঠাতে চাপ দেয়া।

ব্যাঙ্কের রিক্রুটমেণ্ট বিভাগে আমি জানতে চেয়েছিলাম, আপনারা আদিবাসীর জন্য যে সংরক্ষিত পদ রাখেন, তাতে আদিবাসী কিভাবে নিয়োগ করেন। তিনি বললেন, যে তাঁকে নাকি কয়েকটি আদিবাসী সংগঠনের নাম তালিকা দেয়া আছে, তিনি সেখানে জানান। জানতে চাইলাম, ওভাবে কোনো আদিবাসীকে কোনোদিন চাকরি পেতে দেখেছেন কিনা। তিনি মাথা নাড়লেন। কোথা থেকে তাঁর কাছে সংগঠনের তালিকা এল, সেসব সংগঠনের ঠিকানা কি, আর কোনো কথাই বের করতে পারিনি। সরকারের আদিবাসী এমপ্লয়মেণ্ট সেল্ এ বিষয়ে কি বলেন? রাইটার্সের ওই সেল্ কাদের নিয়ন্ত্রণে? ওই সেলের সাহায্যে রাইটার্স বিল্ডিঙে বা কতজন আদিবাসী কাজ পান, সবই আমরা জানতে ইচ্ছা করি।

জেলার এক্সচেঞ্জগুলিকে তো চাপ দিয়ে জানতে চাওয়া উচিত, যে ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৩ মার্চ, এই এক দশকে ওইসব এক্সচেঞ্জে কতগুলি আদিবাসী সংরক্ষিত পদের খবর ছিল, এবং সঠিক কতজন আদিবাসী চাকরি পেয়েছেন।

এটা কেমন কথা, যে আট-নয়-দশ বছরেও আদিবাসী এক্সচেঞ্জ থেকে ডাক পান না? আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত চাকরিগুলি কারা পাচ্ছেন? যা শোনা যাচ্ছে, তা কি সত্যি? শোনা যাচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে যে তপশীলী ও আদিবাসীর পক্ষে জাতি পরিচয়পত্র পাওয়া এখন খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং প্রায়ই শোনা যাচ্ছে যে ঘুষ দিয়ে অন্যেরা তপশীলী বা আদিবাসী সার্টিফিকেট নিচ্ছেন এবং সংরক্ষিত পদে চাকরি পাচ্ছেন। এক্সচেঞ্জগুলিও এখন চরম দুর্নীতির কেন্দ্র। টাকার লেনদেন না হলে ডাক আসবে না, এ তো জেলায় জেলায় শুনি।

সংরক্ষণ নীতি অতীব উদার। কয়েকটি চাকরির উদাহরণ দিই। হিন্দুস্থান এয়ারোনটিকস্ লিমিটেড চেয়েছেন মেডিক্যাল অফিসার (সার্জন) এবং সার্ভিস ইঞ্জিনীয়ার। দ্বিতীয় চাকরিটিতে MIG এয়ারক্রাফট-এর ১ থেকে ১০০ অবধি খুঁটিনাটি জানা আবশ্যিক।

ইফফকো চান সিকিউরিটি সুপারভাইজার। যে-কোন বিষয়ে স্নাতক চাই, চাই সেনাবিভাগে অন্তত ৫ বছরের অভিজ্ঞতা এবং কোন শিল্প কারখানায় উক্ত যোগ্যতায় কাজ করবার অভিজ্ঞতা থাকলে আরো ভালো।

ফেরো স্ক্র্যাপ নিগম চান অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার / জুনিয়র ম্যানেজার / ফিনান্স ও অ্যাকাউন্ট্স একজিকিউটিভ। এর জন্য ভারত সরকারের চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্স ফার্মের সদস্য তো হতেই হবে, আরো মহাভারত আছে।

এখন দেশজোড়া লক্ষ লক্ষ বেকার যখন দেখেন যে সব কাজেই কিছু পদ "সংরক্ষিত", স্বভাবতই চাকরি না পাবার হতাশা থেকে তাঁদের মনে শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে "সংরক্ষিত" ব্যাপারটির বিষয়ে ক্ষোভ জমায়, সেটা স্বাভাবিকও।

এসব কাজ প্রতিযোগিতামূলক। বিজ্ঞাপিত সত্তর ভাগ কাজ তাঁবাই পান, যাঁদের অভিভাবকরা তাঁদের দামী স্কুল-কলেজ স্পেশালাইজ্‌ড ধারায় পড়িয়ে বর্তমান ক্ষুধিত বর্বর সময়ে ক্ষুরের ফলার উপর দিয়ে দৌড়বার জন্য তৈরি করে দিয়েছেন। এ কথাও খুব সত্য, যে বড় বড় কলকারখানায় এমন সব চাকরিতে যাঁরা ঢুকছেন, তাঁরা প্রায়শ আদিবাসী নন, এবং বিহারের শিল্পাঞ্চলে আদিবাসীকে টাকা খাইয়ে তার উত্তরাধিকারী সেজে সেই শ্রমিক অবসর নিলে তার ছেলে / মেয়ে বা অন্য ন্যায্য উত্তরাধিকারী যে কাজ পেতে পারত, তাতে অন্য জাতি কত ঢুকে যাচ্ছেন, কেউ তার হিসাব রাখবে না কেননা এই দুষ্টচক্রে বহু বাঘ সিংহ ও ইউনিয়ন নেতা জড়িত। জামসেদপুর টেলকোতে কত আদিবাসী নেবার কথা এবং প্রকৃত আদিবাসী কতজন নিযুক্ত আছেন? এ কথা কি সত্যি, (পশ্চিমবঙ্গ হরিজন কল্যাণ সমিতি যা বলছেন), হরিজনদের জন্য যে চতুর্থ শ্রেণীর কাজ, সেই মেথর, ক্লীনার, জমাদার পদে বহু অন্য জাতি ঢুকে বসে আছেন। তাঁরা নালা-নর্দমায় বা পায়খানায় ঝাঁটা ধরেন না। সে কাজ সামান্য হরিজনরাই করছে, এঁরা নাকি তৃতীয় শ্রেণীতে চলে যাচ্ছেন, যাবেন।

"সংরক্ষিত পদ" দেখে যাঁরা ক্ষুব্ধ, তাঁরা নিশ্চিন্ত হোন। বেশির ভাগ চাকরি এমন, যে অন্য জাতিকেও ভীষণভাবে তৈরি হয়ে পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ দিতে হয়, এবং এ কথা কে না জানে যে পিছনে "দাদা" না থাকলে কোনো কাজই মেলা মুশকিল।

আদিবাসীর অস্তিত্ব কিরকম পশ্চিমবঙ্গে? বেঁচে থাকার তেল-নুন-লাকড়ি ফুট ফরাক, এর জন্যই যে প্রতিযোগিতা, সে ভীষণ রণে হার মেনে তাঁরা নামাল খাটতে

যান। তিনি যে স্কুলে পড়েছেন, তাতে তিনি এমন শিক্ষা লাভ করেননি, যা তাঁকে ওরকম কোনো বড় কাজে প্রার্থী হিসেবে তৈরি করবে।

সোজা কথা, কি কেন্দ্রীয় সরকারে, কি রাজ্য সরকারে আদিবাসী প্রার্থী এখন অবধি অধিকাংশই চতুর্থ শ্রেণীতে কাজ পাবার উপযুক্ত। আজকাল একটি অভিযোগ সকল জাতি নির্বিশেষে জেলায় শোনা যায়, যে স্থানীয় রাজনীতিক ক্ষমতাশালী "দাদাকে খুশি" করতে পারলে তবেই আঞ্চলিক এক্সচেঞ্জ থেকে ডাক আসবে এবং এক্সচেঞ্জ আপিস থেকে কর্মদানকারী সংস্থা অবধি "খুশি কবার" ব্যবস্থা খুবই চালু। যদি কোনো আদিবাসী কপালজোরে স্থানীয় ব্যাঙ্ক বা আপিসে চাকরি পেলও, সে চাকরিতে ঢোকার ও থাকার জন্যে তাকে পার্টিমদতপুষ্ট ইউনিয়ন দাদাদের "খুশি" রাখতে হবে। এর মধ্যে কি কোনো সত্যতা নেই? কয়েকটি ঘটনার বিষয়ে চিঠি তো আমার হাতেই আছে।

শোনা যায় যে পুরুলিয়া ও মেদিনীপুরের একাংশে ঝাড়খণ্ডী হাওয়া আছে। এবং এ কথাও সত্যি যে রাজ্য সরকার বড দরের মস্তান, ঠিকাদার, অসাধু ব্যবসায়ী, কালোবাজারী তেলের ডীলার, অত্যাচারী পুলিশ, জাল বর্গা রেকর্ড, সব সইতে পারেন, "ঝাড়খণ্ড" নাম সইতে পারেন না। ভালো, খুব ভালো। তবে এ কথাটাও তো ভাবতে হয় যে পুরুলিয়ার বংশীর মতো কোনো শিক্ষাপ্রাপ্ত, নাম লেখানো তপশীলী বা আদিবাসীকে যদি তেরো বছরেও এক্সচেঞ্জ থেকে ডাকা না হয়, তাদের মনে হবে যে তারা ইচ্ছাকৃত নির্মম ঔদাসীন্যেব ফলে অবহেলিত হচ্ছে। তখন তারা কেন বিক্ষুব্ধ হবে না? বিক্ষোভেব কাবণ তো অপসারণ করলেই হয়।

রাজ্য সরকারের নীতি যদি সংখ্যালঘিষ্ঠ আদিবাসীদের প্রতি বিশেষ সংবেদনশীল হয় (যা শোনা যায়), তাহলে চার থেকে আট ক্লাস পড়া লোধা বা খেড়িয়া কেন বনরক্ষী কাজের জন্যেও বিবেচিত হয় না? তারপর বিগত সাত / আট বছরে ঘোষিত আদিবাসী এলাকায় যে হাজার হাজার প্রাথমিক শিক্ষক / শিক্ষিকা নিযুক্ত হয়েছেন, তার বাস্তব চিত্র কেমন? কতগুলি ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন, এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো আদিবাসী ওইসব চাকরি পেয়েছেন? বহু অ-আদিবাসীও বলেছেন, "উপযুক্ত আদিবাসী প্রার্থী নেই বলে অন্য জাতি থেকে লোক নেয়া হল" এটি অনেক সময়েই মিথ্যা দ্বারা সত্যকে ঢেকে রাখা।

এ রাজ্যের শিক্ষাপ্রাপ্ত আদিবাসীদের বিষয়ে ঈর্ষা করার কোনো ভিত্তি নেই।

যাঁরা জানেন না, তাঁরা মনে করেন যে এরা হল রাজ্য সরকারের আদরের সন্তান। দুর্গম, দূরবর্তী আদিবাসী এলাকায় কষ্ট করে ঘুরলেই এ ধারণা মুছে যাবে। দেশের অগণিত বেকাররা ক্ষুব্ধ, আদিবাসীরা চাকরি ক্ষেত্রে সংরক্ষিত পদ পাচ্ছে। বাস্তব ঘটনা হল, তা তো তারা পাচ্ছেই না, বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে যে কাজ তার যোগ্য, সে কাজের বেলাও সে সংরক্ষিত পদের সুবিধা পাচ্ছে না। লোধা ও মাহালিদের লেখাপড়া শেখা ও এক্সচেঞ্জে নাম লেখানোর অভিজ্ঞতা এমন নৈরাশ্যজনক যে লেখাপড়া ব্যাপারটাতেই ওরা আগ্রহ হারায়। পুরুলিয়ার বান্দোয়ান মহকুমার যে সাঁওতাল মেয়েরা মাধ্যমিক অবধি পড়েছে, বা পাশ করেছে, তারা পড়েছে উভয় সঙ্কটে। চাকরি পাবার সুবিধে নেই, কোনো কার্যকরী প্রশিক্ষণ মাধ্যমে ওরা স্বয়ম্ভর হবে এমন ব্যবস্থা রাজ্য সরকার করেন নি। এতটা লেখাপড়া শিখে দিনমজুর হিসেবে খাটতে ওরা যেমন চায় না, তেমনি জমিমালিক ওদের নিয়োগ করতে নারাজ। যারা লেখাপড়া জানে, তারা ন্যায্য মজুরির দাবী তুলতে পারে। স্কুলে শিক্ষাসমাপ্তি আদিবাসীর ক্ষেত্রে একটা প্রতিবন্ধক, তার সহায়তা নয়।

গোমস্তাপ্রসাদ সরেন লিখেছে, "তালিকাটা দেখুন। ওদের সাহায্য করতে চেষ্টা করুন। ওরা অনেকেই পুরুলিয়া থেকে অনেক দূরে জংলা বা পাহাড়ী এলাকায় থাকে। পথঘাট নেই। রেডিও বিরল, ওরা খবরের কাগজও রাখে না। ডাক-ব্যবস্থায় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা, ফলে কাজের চিঠি এলেও তা সময়ে ওদের হাতে পৌঁছয় না। এখন এক্সচেঞ্জগুলি দুর্নীতির ডিপো। এক্সচেঞ্জ এবং রাজনীতিক দলগুলি এদের প্রতি উদাসীন। ওরা এক্সচেঞ্জে কার্ড রিনিউ করার পরেও ডাক পায় না। ওরা কি করবে, কোথায় যাবে?"

গোমস্তার প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। আমি শুধু জানি যে আদিবাসী ও তপশীলীদের বেকারির সমস্যা এক ভয়াবহ সমস্যা। কলকাতায় সবচেয়ে বেশি কাজের খবর থাকে। কলকাতার এক্সচেঞ্জগুলি জেলার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে আদিবাসী-তপশীলী সংরক্ষিত কোটা পূরণের জন্য তালিকা চাইবে, এমনটিই হওয়া উচিত, তা হয় না। আদিবাসী কলকাতায় বাস করে না, জেলায় বাস করে। সে খবর পায় না। কলকাতায় যে আদিবাসী-তপশীলী সংরক্ষিত কোটা বিজ্ঞাপিত হয়, সেগুলি কারা পায়? রাইটার্সের আদিবাসী কর্মবিনিয়োগ সেল কি সরকারী খরচে রাখা এক দারুভূত জগন্নাথমাত্র?

জেলায় এক্সচেঞ্জগুলি এদের কোনো সাহায্য করে না। সমগ্র অবস্থাটি আদিবাসী ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষালাভে কোনো উদ্যম যোগায় না। যে-কোনো সরকারের পক্ষেই

আদিবাসীকে খানিক শিক্ষাদান, তারপর তাকে বছরের পর বছর বেকার ফেলে রাখা কিন্তু বিপজ্জনক। এর ফলে প্রথমে মনে জমে হতাশা হতাশা, থেকে জন্ম নেয় ক্রোধ। ফলে ওদের ও সরকারের মধ্যে যে ব্যবধান, তা বাড়তে থাকে। চার দশক ধরে আদিবাসী স্বার্থ যেভাবে উপেক্ষিত হয়েছে, যে আদিবাসীরা দৃঢ় বিশ্বাস করে, যে রাজা আসবে, রাজা যাবে, কিন্তু তাদের স্বার্থ কিসে রক্ষা হয়, সে কথা কেউ ভেবে দেখবে না।

মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ : লেখক

ফুলে থেকে আম্বেদকার ঃ এক অসমাপ্ত বিপ্লব

শিবনারায়ণ রায়

'যদি তুমি জাত-ব্যবস্থাকে ভাঙতে চাও, তবে তোমাকে বেদ এবং শাস্ত্রগুলিকে—যা কোন যুক্তিকে স্বীকার করে না, যা নৈতিকতাকে অস্বীকার করে—ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে হবে। তোমাকে অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে স্মৃতি-অনুসারী ধর্মকে।'

—বি. আর. আম্বেদকার, জাতির পূর্ণবিলয় (Anihilation of Caste)
বম্বে, ১৯৪৫ ; পৃ ৭০

১৮৭৩ সালে জ্যোতিরাও ফুলে (১৮২৭-৯০) তাঁর ঐতিহাসিক ইস্তেহার 'গুলামগিরি' ('সভ্য ব্রিটিশ শাসনের ছত্রছায়ায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের ছদ্মবেশে সামাজিক দাসত্ব') প্রকাশ করেন ; এটিকে তিনি 'সেই সমস্ত মার্কিন নাগরিক যারা নিগ্রোদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছিল' তাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন[১]। হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার যারা ছিল সবচেয়ে নিপীড়িত তাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লেখা এই ইস্তেহার ছিল হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইদানিং কালের সবচেয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং বিধ্বংসী সমালোচনা ; কিন্তু ঐ উৎসর্গীকরণ এটিকে বিশ্বজনীন গুরুত্ব দান করেছে। ফুলে অনুভব করেছিলেন যে হিন্দু-ভারতে শূদ্র এবং অস্পৃশ্যরা যে ধরণের সামাজিক অসম্মান ও শোষণের শিকার হয়েছিল, পৃথিবীর অন্যান্য সমাজের অবহেলিত সম্প্রদায়গুলির তুলনায় তা ছিল অতি নিকৃষ্ট মানের এবং তাদের মুক্তির জন্য আন্দোলন সুরক্ষিত-নিপীড়নমূলক এলিটীয় সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিত্তহীনদের অধিকার অর্জনের বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের অংশ।

অন্যান্য ভারতীয় সমালোচকরাও অবশ্যই ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার সমালোচনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন উচ্চ জাতিভুক্ত এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল মূলত: সংস্কারপন্থী (reformist), র‍্যাডিক্যাল নয়। বাংলাদেশের রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) উভয়েই ছিলেন ব্রাহ্মণ ; প্রথমজন হিন্দুদের বহু ঈশ্বরবাদ (polytheism) এবং সতী প্রথার (বিধবারমণীদের আত্ম বলিদান) বিরুদ্ধে আঘাত হেনেছিলেন ; দ্বিতীয়জন বিধবা-বিবাহ সমর্থন করেছিলেন এবং বহুবিবাহ রীতির বিরোধিতা করেছিলেন ; কিন্তু তাঁরা কেউই হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার কোন কাঠামোগত রূপান্তরের কথা চিন্তা করেননি।[২] মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে (১৮৪২-১৯০১)—যিনি ছিলেন মহারাষ্ট্রের চিৎপাবন ব্রাহ্মণ জাতিভুক্ত—এঁর ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য ; সমাজ বিবর্তনের উপর আস্থাশীল এই মহান উদারনীতিক সংস্কারক সমাজ, ধর্ম এবং রাজনীতির মৌল রূপান্তরের বিরোধী ছিলেন।[৩] ১৮৩০-এর দশকে কলকাতার 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠী হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ করেছিল

ঠিকই কিন্তু এই আক্রমণ ছিল বুদ্বুদের মত ক্ষণস্থায়ী ; এই গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের নাবালকত্বের সংক্ষিপ্ত পর্বের শেষ দিনগুলিতে আপোষ করতে দ্বিধা করেননি।[৪] 'লোকহিতবাদী' গোপাল হরি দেশমুখ (১৮২৩-৯২) সম্ভবতঃ মহারাষ্ট্রের একমাত্র উচ্চ-জাতীয় বুদ্ধিজীবী যিনি হিন্দু সমাজ ও ঐতিহ্যের এক সুসমৃদ্ধ আমূল সংস্কারবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন (১৮৬৬ সালে প্রকাশিত তাঁর লেখা 'শতপত্রী' বা একশত চিঠি ভারতের প্রগতিশীল চিন্তার ইতিহাসের এক প্রামাণ্য দলিল), কিন্তু এক বিধবার পুনর্বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত চাপে পড়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন।[৫]

ভারতীয় সমাজের কাঠামোগত বৈপ্লবিক রূপান্তরণের আদর্শে সমর্পিতপ্রাণ চিন্তাবিদ হিসাবে ফুলের নাম বিশেষ উল্লেখনীয় তাই নয়, তিনি ছিলেন আধুনিক ভারতের অন্ত্যজ জাতিভুক্ত প্রথম চিন্তাবিদ।[৬] তিনি মালি (তারা বাগান তৈরী করে) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, এরা মহারাষ্ট্রের 'কুনবি' (kunbi) জাতির অন্তর্গত একটা উপজাতি। কুনবিরা ছিল কৃষক, এদের অধিকাংশই কোনমতে জীবিকানির্বাহের স্তরে বাস করত ; জাতি-বিন্যাসের দিক থেকে তারা ছিল মাহার (mahars) এবং মঙ্গ (mangs) দের মত অস্পৃশ্যদের তুলনায় উঁচু জাতের, কিন্তু এর জন্য উঁচু জাতি এবং কায়েমি স্বার্থের অত্যাচার তাদের কিছু কম সহ্য করতে হয়নি।[৭] ফুলে বুঝতে পেরেছিলেন যে পরম্পরাগতভাবে ব্রাহ্মণরা সামাজিক ক্ষমতা এবং বিশেষ সুযোগ-সুবিধার উপর যে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত তার মধ্যেই নিহিত ছিল হিন্দু সমাজের বিভিন্ন অন্যায় ও অসাম্যের চাবিকাঠি। ফুলে'র সমস্ত রচনা ও জনমুখী কাজকর্মের উদ্দেশ্যই ছিল, অ-ব্রাহ্মণজাতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত অংশগুলিকে সংগঠিত করে এই একচেটিয়াবাদের মূলোৎপাটন। প্রগতিশীল পশ্চিমী চিন্তাবিদদের পথ অনুসরণ করে ফুলে তাঁর সৃষ্টিকর্মে সমসাময়িক সমাজের বিশ্লেষণ-বর্ণনার সঙ্গে কোন্ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় এই বিশেষ অবস্থার উদ্ভব হয় তার ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, বিগত তিন হাজার বছরের ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস, ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের চিরকালীন সংগ্রামেরই ইতিহাস। তিনি দাবি করেছেন, ব্রাহ্মণরা হল আর্য, তারা বহির্দেশ থেকে ভারতে এসেছিল এবং অতঃপর দেশীয় জনগণকেই—যাদের শূদ্র বলা হত—পরাভূত করেছিল। ব্রাহ্মণরা তাদের দমননীতিকে চিরস্থায়ী করার জন্য প্রবর্তন করেছিল এক বিস্তৃত আদর্শগত-প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো : বর্ণপ্রথার উদ্ভবসংক্রান্ত অলীককাহিনী, কর্ম এবং পুনর্জন্মের তত্ত্ব, জাতিগত স্তরবিভাজনের মত অনিষ্টকারী ব্যবস্থা, জাতিগুলির মধ্যে সংহতি বিনষ্টকারী ধর্মশাস্ত্রের বিভিন্ন সূত্র এবং নীতিমান (codes)। দেশীয় জনগণের একাংশ—যাদের প্রথমদিকে ক্ষত্রিয় বলা হত—যারা ব্রাহ্মণদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তারা পরবর্তীকালে পরাভূত হয় এবং মর্যাদার দিক থেকে শূদ্রদের স্তরে অবনমিত হয়। ধূর্ত ব্রাহ্মণ জাতি অ-ব্রাহ্মণদের

বিভিন্ন দেব-দেবী, অনুষ্ঠান, বিশ্বাস এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির জটিল কাঠামোর মধ্যে বিশোষিত করে নিয়েছিল, এবং এভাবে তারা দেশীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে অনেকখানি দুর্বল করে ফেলেছিল ; পুজোর্চনা ও শিক্ষাদান সংক্রান্ত সমস্ত বিশেষ অধিকারগুলির উপর নিজেদের একচেটিয়া অধিকার কায়েম করে তারা সমাজের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল। ব্রাহ্মণরা তাদের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক একচেটিয়াবাদের সঙ্গে যখন রাজনৈতিক ক্ষমতাও করায়ত্ত করেছিল তখন অ-ব্রাহ্মণরা তাদের দাসে রূপান্তরিত হয়েছিল। অবশ্য অ-ব্রাহ্মণরা কখনোই তাদের সংগ্রাম থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত হয়নি এবং বিভিন্ন সময়ে যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা অ-ব্রাহ্মণদের হস্তগত হয়েছে (যেমন, মুসলীম এবং ব্রিটিশ শাসনকালে) তখনই তারা সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে।[৮]

ফুলের ইতিহাস রচনায় কয়েকটি একটি অত্যন্ত স্পষ্ট (বিশেষত, আর্য এবং ব্রাহ্মণ সমার্থক শব্দ—যা ফুলে দাবি করেছেন—তা ঐতিহাসিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়), কিন্তু তাঁর রচনায় অনেক মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টির সন্ধান মেলে যা ভারতীয় ইতিহাস ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধান দিতে পারে। তাঁর রচনার অত্যন্ত মূল্যবান দিকটি হল, উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের, বিশেষত পশ্চিম ভারতের, সামাজিক কাঠামোর সমালোচনাধর্মী বিবরণ। তিনি দেখিয়েছেন যে, এমনকি ব্রিটিশ শাসনকালেও 'পেশোয়া যুগের মত সমান কঠোরতার সঙ্গে জাতিভিত্তিক স্তরবিভাজন মেনে চলা হয়েছে।' শূদ্র এবং অস্পৃশ্যরা ছিল দরিদ্র ও নিরক্ষর ; জমিদার, মহাজন এবং সরকারী অফিসাররা, যাদের অধিকাংশই ছিল ব্রাহ্মণ, (ফুলে যদি বাংলাদেশে বাস করতেন তবে এক্ষেত্রে তিনি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কায়স্থ ও বৈদ্যদের নামও যোগ করতেন) তাদের নির্দয়ভাবে শোষণ করত, তারা নিম্নস্তরভুক্তদের মধ্যেও নিম্নতম রূপে বিবেচিত হত, এবং যতরকম অসম্মান ও শাস্তির কথা ভাবা যায় সবই তাদের সহ্য করতে হত। যদিও ব্রিটিশরা সমাজ সম্পর্কে নতুন নীতি ও তত্ত্বের প্রবর্তন করেছিল, কিন্তু ব্রাত্যজাতিগুলি কখনো তা জানতেও পারেনি, আর সরকারও নীতিগুলি বাস্তবায়নের জন্য কোন আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণরা (এবং পূর্ব ভারতে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি ঐতিহ্যানুসারী উচ্চ জাতি) পশ্চিমী শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে ব্রিটিশ সরকারের সমস্ত চাকরী এবং বৃত্তির উপর একচেটিয়া স্থাপন করে নিজেদের অবস্থান সংহত করেছিল।[৯]

ফুলে মনে করতেন যে, যেহেতু ব্রিটিশ সরকার গণতন্ত্র এবং আধুনিকীকরণের তত্ত্বে বিশ্বাসী তাই হয়তো একদিন তারা ব্রাহ্মণ ও উচ্চ জাতিগুলির ক্ষমতা খর্ব করার আন্দোলনে শূদ্র ও অস্পৃশ্যজাতিগুলির সহায়ক হবে। উদীয়মান হিন্দু জাতীয়তাবাদ তাঁর মধ্যে বিশেষ আশা সঞ্চার করতে পারেনি, কারণ ব্যাপক অর্থে এটা ছিল পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের মতাদর্শ ; তাঁর আশঙ্কা ছিল যে সামাজিক বিপ্লব ব্যতিরেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা সুসংহত জাতিভিত্তিক

এলিট গোষ্ঠীগুলির বিদ্যমান সাংস্কৃতিক-সামাজিক সুযোগসুবিধার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা যোগ করবে মাত্র। যাইহোক, ব্রিটিশের উপর নির্ভরশীল হওয়ার পরিবর্তে তিনি মহারাষ্ট্রের অ-ব্রাহ্মণ জাতিগুলিকে পরিচালনা, উৎসাহ দান এবং সংগঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অসংখ্য লেখা এবং 'দীনবন্ধু' (১৮৭১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়) পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি তিনি ১৮৭৩ সালে 'সত্যসাধক সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার লক্ষ্য ছিল "কপটচারী ব্রাহ্মণ এবং তাদের সুবিধাবাদী ধর্মগ্রন্থগুলোর হাত থেকে নিম্ন জাতির লোকদের রক্ষা করা।" তিনিই ভারতবর্ষে প্রথম অস্পৃশ্য শিশুদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৫২), এবং শিশুহত্যা নিবারণের উদ্দেশ্যে আবাসন স্থাপন করেন (১৮৬৩) যেখানে অবৈধ সন্তানের বিধবা জননীদের আশ্রয় দান করা হত এবং যত্ন নেওয়া হত। তাঁর মুখ্য সৃষ্টিকর্ম 'সর্বজনিক সত্য ধর্ম'-এ তিনি এক মানবিকতাবাদী দর্শনের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, যা নারী-পুরুষ, জাতি, ধর্ম, জাতিকুল (race) নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য পরিপূর্ণ সামাজিক সাম্যের কথা ঘোষণা করেছিল। 'কর্ম', 'পুনর্জন্ম', 'মোক্ষ', জাতি সংক্রান্ত নিয়ম নীতি, পবিত্র-অপবিত্রের ধারণা এবং প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি পুরাতনী হিন্দু বিশ্বাসবোধগুলিকে সুস্পষ্টভাবে পরিহার করে তিনি মানুষের প্রয়োজন ও সমস্যা সমাধানের জন্য এক যুক্তিবাদী ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছিলেন, এবং এমন একটা আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার চিত্রকল্প দান করেছিলেন যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে তার সৃষ্টিশীল সম্ভাবনাগুলির বিকাশের জন্য পরিপূর্ণ সুযোগ পাবে। তিনি ভারতে এমন এক সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে দরিদ্র এবং অধিকারহীনরা পাবে মর্যাদা ও আত্মসম্মান এবং তাদের নিজ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

কিন্তু ফুলের সামনে প্রতিবন্ধকতাগুলিও কম ছিল না। ভারতেই ঐতিহ্যপ্রিয় গ্রামীণ জনসাধারণের কাছে তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার প্রতি সহানুভূতিসূচক সাড়া পাবার আশা করা ছিল অত্যাশার নামান্তর। অপরপক্ষে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে শহুরে মধ্যবিত্ত একটি গোষ্ঠীর যে অংশ তখন রাজনৈতিক ব্যাপারে চরমপন্থী মনোভাব গ্রহণ করতে শুরু করেছিল তারাও ফুলের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি সহানভূতিশীল ছিলেন না। ভারতবর্ষে উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ও সমর্থকদের অধিকাংশই এসেছিলেন উচ্চ-জাতিভুক্ত হিন্দুদের মধ্যে থেকে; তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতা চেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের বিশেষ সুযোগপ্রাপ্ত সামাজিক অবস্থানের মূল্যের বিনিময়ে নয়; তাঁরা এটা নিজেদের বুঝিয়েছিলেন এবং অন্যদেরও বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, সমাজ পরিবর্তনের আগে রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রয়োজন। তাদের দৃষ্টিতে যে কোন দাবি, এমনকি সমাজ সংস্কারের দাবিও (সামাজিক বিপ্লব তো দূরের কথা), যা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভকে বিলম্বিত করতে পারত তা দেশপ্রেম বিরোধী বলে বিবেচিত হত, স্বাধীনতা (তাদের অর্থে) মানেই প্রতিষ্ঠিত এলিট

গোষ্ঠীর হাতে সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন (যা ফুলে মনে করতেন) এরকম ব্যাখ্যায় তাঁরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। এবং সেই কারণে তাঁদের কাছে আমূল সমাজ সংস্কারবাদী ফুলে একজন রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীল ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই বিকৃত মতবাদ এত সুপ্রচল হয়েছিল যে আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসে ফুলের নাম ক্বচিৎ লক্ষ্য করা যায়।[১০] আধুনিক ভারতের ট্রাজেডির অন্যতম একটা উৎস হল, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রগতিশীলতার মধ্যবর্তী ফারাকটি, যা এখনো পূর্ণ হয়নি; এবং তা হলে ফুলের প্রকৃত গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকৃত হবে। কমপক্ষে, এই গুরুত্ব তাঁর সমসাময়িক বহুল প্রচারিত অনুজ ব্যক্তিদের—যেমন, ভি এম্‌. চিপলুংকার (১৮৫০-১৮৮২) বা বি. জি. তিলক (১৮৫৬-১৯২০)—মহত্ত্বের সমান হবে; মহত্তর নাও যদি হয়।[১১]

ফুলের মৃত্যুর পর তিন দশক ধরে ভারতীয় সমাজের অন্ত্যজ জাতিগুলির সমস্যা ও আশা আকাঙ্ক্ষাগুলির স্বীকৃতি দান বা তাদের স্বার্থ প্রকটনের ক্ষেত্রে খুব সামান্যই উন্নতি হয়েছে। জাতীয় আন্দোলন, যা নিয়ন্ত্রণ করত উচ্চ-জাতির হিন্দুরা, তা ভারতীয় মুসলীমদের নবজাগ্রত রাজনৈতিক নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল। যাইহোক্‌, কুড়ি এবং ত্রিশের দশকে ভারতীয় রাজনীতি তার এলিটীয় কাঠামোর গণ্ডী অতিক্রম করতে শুরু করে। যুদ্ধোত্তর কালে ভারতীয় জনজীবনে নতুন শক্তির আবির্ভাব হয়। রাশিয়ার বিপ্লবের আদর্শ শহুরে শিক্ষিত জনগণের একাংশকে প্রভাবিত করতে শুরু করে, এই পর্বের সবচেয়ে উল্লেখনীয় ঘটনা হল, গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন সাধারণ জনগণের বিপুল অংশকে আকর্ষণ করে আরও ব্যাপ্তি পায়।[১২] অস্পৃশ্যদের দুঃসহ দুরবস্থা দেখে গান্ধীজী বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের কাছে এই প্রথা রদ করার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে ভারতীয় জাতব্যবস্থা বর্জনের কোন প্রয়োজনীয়তা ধরা পড়েনি, কারণ তিনি মনে করতেন যে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে জাতপ্রথার উপযোগিতা আছে। কিন্তু তাঁর মতে অস্পৃশ্যতা ছিল 'হিন্দুধর্মের উপবৃদ্ধি (excrescence)' মাত্র।[১৩] তিনি 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় (২৩.৪.১৯২৫) লিখেছিলেন, 'অস্পৃশ্যদের শূদ্র জাতিভুক্ত করাই শ্রেয়, কারণ পঞ্চম কোন জাতিতে বিশ্বাস স্থাপন করা অন্যায্য।' এক্ষেত্রেও তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাধারণ স্টাইলের অনুসরণেই তিনি সবচেয়ে মহান্‌ সমন্বয় সাধকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চেষ্টা করেছিলেন; তিনি অনুধাবন করতে পারেননি যে, জাত ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ব্যতীত ভারতবর্ষ থেকে অস্পৃশ্যতাকে কখনোই দূর করা যাবে না। এই বিষয়টাই ফুলে তার 'গুলামগিরিতে' উল্লেখ করেছেন, যা অন্যকোন উৎসাহী প্রবক্তার অপেক্ষায় ছিল; ভীমরাও রামজী আম্বেদকার (১৮৯২ ১৯৫৬) হলেন সেই মুখপাত্র।[১৪] 'হু আর দ্য শূদ্রস্‌' বইটি আম্বেদকার ফুলেকে উৎসর্গ করেন; এই ঘটনা উভয়ের

সান্নিধ্যের পরিচায়ক। তাঁর মতে ফুলে ছিলেন 'আধুনিক ভারতের মহান্ শূদ্র যিনি নিম্নজাতের হিন্দুদের তাদের দাসত্ব সম্পর্কে সচেতন করেছিলেন এবং এই সত্য প্রচার করেছিলেন যে, ভারতের মত দেশে বিদেশী শাসনমুক্তির চেয়ে সামাজিক গণতন্ত্র অধিকতর প্রয়োজনীয়'।[১৫]

আম্বেদকার ছিলেন জাতিতে 'মাহার'। এটা ছিল মহারাষ্ট্রের বৃহত্তম অস্পৃশ্য জাতি, বর্তমানে যারা জনসংখ্যার প্রায় দশ শতাংশ। ভারতবর্ষে অস্পৃশ্য হয়ে জন্মানোর দুঃখ আম্বেদকার হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন। 'মাহার'দের চিরাচরিত কাজ ছিল "রাস্তা, কূপ এবং শ্মশানের রক্ষণাবেক্ষণ, সংবাদ বহন, মৃত গৃহপালিত পশুদের সৎকার এবং অনুরূপ শারীরিক ও অপবিত্র কাজ।"[১৬] যাইহোক আম্বেদকারের বাবা এবং ঠাকুর্দা কাজ করতেন সেনাবাহিনীতে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ শাসন কায়েম হওয়ায় তাঁরা এই সুযোগটা পেয়েছিলেন। এটা তাঁর সৌভাগ্য যে তাঁর অসাধারণ বৌদ্ধিক প্রতিভা খুব অল্পকালের মধ্যেই স্বীকৃত হয়েছিল, এবং বরোদার গাইকোয়াড়ের মত গুণীব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর পক্ষে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিদেশ যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। ১৯২৩ সালে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি., লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস্. সি. এবং লন্ডনের গ্রেস্ ইন্ থেকে আইনশাস্ত্রে ডিগ্রী নিয়ে বম্বে ফিরে এসেছিলেন। শিক্ষাগত সাফল্য তাঁর সমাজ চেতনাকে আবৃত করেনি; তিনি নিজেকে অস্পৃশ্যদের মৌলিক মানবিক অধিকার অর্জনের সংগ্রামের জন্য সংগঠিত করার কাজে উৎসর্গ করেছিলেন।

১৯২৪ সালে তিনি 'বহিস্কৃত হিতকারিণী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন, ১৯৫৬ সালে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন, রিপাবলিকান পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই বছরই তিনি মারা যান; আম্বেদকারের সমগ্র জীবন জনসেবায় উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, অস্পৃশ্যদের অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক ক্ষমতা, এবং এই লক্ষ অর্জনের জন্য প্রয়োজন সংগঠন এবং আধুনিক শিক্ষা। অভিজ্ঞতা থেকে তিনি আরও বুঝেছিলেন যে, সনাতনী হিন্দুধর্মের এবং স্তরভিত্তিক জাত-কাঠামোর মধ্যে থেকে অস্পৃশ্যরা কোন দিনই 'মনুষ্যত্ব' (manuski) অর্জন করতে পারবে না। ১৯২৭ সালে 'মাহাড়ে' অনুন্নত সম্প্রদায়ের এক সভায় তিনি জনসমক্ষে 'মনুস্মৃতি' পুড়িয়ে ফেলেন. এই ঘটনা ছিল ভারতীয় জনজীবনে এক নতুন শক্তির আবির্ভাবের দ্যোতক। সামাজিক ব্যাপারে সমস্ত উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের কাছে মনুই ছিলেন সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ, তাঁর সংহিতাগুলিতে জাত-কাঠামো সুদৃঢ় ভিত্তি পেয়েছিল, যে ব্যবস্থায় সর্বোচ্চে ছিল ব্রাহ্মণরা এবং অস্পৃশ্যরা ছিল সর্বনিম্নে।[১৭] ভারতের সামাজিক ইতিহাসে 'মনুস্মৃতি'র প্রভাব ছিল অন্য যেকোন শাস্ত্র—প্রাচীন বা আধুনিক—এর তুলনায় অনেক বেশি সুগভীর (এবং যুগপৎভাবে ক্ষতিকারক)। মনুকে অস্বীকার করার মাধ্যমে আম্বেদকার হিন্দু সমাজের আদর্শগত ভিত্তিকেই অস্বীকার করেছিলেন; ফুলের মত তিনিও মনু বর্ণিত অসম সমাজ ব্যবস্থার

পরিবর্তে জনজীবনের প্রতিক্ষেত্রে মানবিক সাম্যের নীতি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

১৯২৭-১৯৩৫ সালের মধ্যে আম্বেদকার মাহাড় এবং নাসিকে অস্পৃশ্যদের জন্য গ্রামের জলাধার ব্যবহার এবং মন্দিরে প্রবেশের অধিকারের দাবিতে বেশ কয়েকটি 'মাহার সত্যাগ্রহে'-র নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর এইসব কর্মকাণ্ড কংগ্রেসের কাছ থেকে কোন সমর্থন পায়নি। বরং তিনি অস্পৃশ্যদের জন্য এক পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী দাবি করায় কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে, বিশেষত গান্ধীজীর সঙ্গে, তাঁর তীব্র বিরোধ বেধেছিল। আম্বেদকার স্বাধীনতা বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু তিনি যথার্থ দাবিই করেছিলেন যে, কোন রাষ্ট্র কর্তৃক অপর কোন রাষ্ট্রকে পরাধীন করে রাখা যেমন ঠিক নয় তেমনি কোন শ্রেণী বা জাতির শাসন অপর কোন শ্রেণী বা জাতির উপর কায়েম হওয়া উচিত নয়। গান্ধীজীর বিরোধিতার ফলে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর জন্য তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল; গান্ধীজী ঐ বিষয়কে কেন্দ্র করে অনশন শুরু করেন এবং আম্বেদকার আপোষ করতে বাধ্য হন। কিন্তু এই ঘটনায় ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের প্রতি তাঁর অবিশ্বাস গভীরতর হয়েছিল মাত্র।[১৮]

১৯৩৫ সালে আম্বেদকার হিন্দুধর্মের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছিলেন। ঐ বছরই তিনি 'ইনডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টি' প্রতিষ্ঠা করেন যা ১৯৩৭ সালের বম্বে বিধানসভা নির্বাচনে মোটামুটি ভাল ফল করেছিল। ১৯৪২ সালে তিনি গঠন করেন 'তপসিলী জাতি ফেডারেশন', এবং এর তিন বছর পর প্রতিষ্ঠা করেন 'পিপলস্ এডুকেশান সোসাইটি' যার লক্ষ্য ছিল অস্পৃশ্যদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রসারণ। তাঁর লেখাপত্রের মাধ্যমে একদিকে তিনি গান্ধীজী এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার চালিয়েছিলেন, কারণ তাঁরা অস্পৃশ্য জাতির রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, অপরদিকে তিনি ভারতীয় ইতিহাস, বিশেষত শূদ্র এবং অস্পৃশ্যজাতির উৎস সম্পর্কে অ-রক্ষণশীল ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। জাতিকুলগত উৎসের মধ্যে তিনি জাতিগত দ্বন্দ্বের কারণ খোঁজেননি, যেমনটি ফুলে করেছিলেন। তাঁর মতে, শূদ্ররা প্রকৃতপক্ষে কোন একটা পৃথক 'বর্ণ' নয়, তারা ছিল ভারতীয় আর্য সমাজের ক্ষত্রিয় বর্ণের একটা অংশ; ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র রাজাদের মধ্যে অহরহ বিরোধ চলতে থাকায় ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের উপনয়ন সংক্রান্ত কাজ করতে অস্বীকার করেছিল; এই ঘটনায় শূদ্রদের সামাজিক অবস্থানের অবনয়ন ঘটে এবং চতুর্থ একটি বর্ণের জন্ম হয়।[১৯] তিনি মনে করতেন যে অস্পৃশ্যরা ছিল মূলত বৌদ্ধ, হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের যুগে যেসব বৌদ্ধ ব্রাহ্মণদের শ্রেয়-অবস্থান মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল তারা হয়েছিল নিন্দাভাজন, তাদের ভূসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল এবং তারা সভ্য সমাজের সীমানার বাইরে নির্বাসিত হয়েছিল।[২০] পরবর্তীকালে অস্পৃশ্যদের বৌদ্ধধর্ম এবং এই ধর্মের সাম্যবাদী নীতি (যা ছিল স্তরবিভাজন সম্পর্কিত হিন্দু-মতাদর্শের বিরোধী) গ্রহণ

করার জন্য যে প্রস্তাব তিনি করেছিলেন এই তত্ত্বের মধ্যে তার বীজ নিহিত ছিল।[১১]

স্বাধীন ভারতে আম্বেদকারের ঘোরতর শত্রুরাও অস্পৃশ্যদের প্রধান নেতা এবং মুখপাত্র হিসাবে তাঁকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। খণ্ডিত স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতারা রাজনৈতিক সম্ভেদের (cleavages) ব্যাপারে খুবই সতর্ক হয়ে উঠেছিলেন; তাঁরা অস্পৃশ্যদের বিশ্বাস অর্জনের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং ভারতীয় সমাজকে অস্পৃশ্যদের নিজ সমাজ হিসাবে গড়ে তোলার উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা এজন্য আম্বেদকারের সহযোগিতা প্রার্থনা করেছিলেন এবং তা পেয়েছিলেন। সামাজিক ক্ষেত্রে একজন বিপ্লবী হলেও রাজনৈতিক জীবনে আম্বেদকার ছিলেন নরমপন্থী; তিনি হিংসার পক্ষপাতী ছিলেন না; ফুলের মত তাঁরও পরিবর্তনের অস্ত্র হিসাবে শিক্ষা ও আইনের উপর অগাধ আস্থা ছিল। একজন আইনজ্ঞ এবং সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞ হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল সুবিদিত। তিনি স্বাধীন ভারতের সংবিধান তৈরীর কাজে বৃত গণপরিষদের খসড়া কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম ক্যাবিনেটে আইন মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এই সময় তিনি মনুস্মৃতির (যেটা তিনি কুড়ি বছর আগেই জনসমক্ষে পুড়িয়ে ফেলেছিলেন) বিকল্প একটি সংহিতা রচনার সুযোগ পেয়েছিলেন। গণতান্ত্রিক সংবিধানের খসড়া রচনায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে এবং গণপরিষদকে পরিচালনার মধ্যে দিয়ে তিনি এই কাজ করতে চেয়েছিলেন। সংবিধানের তৃতীয় অংশে (যেখানে মৌলিক অধিকারসমূহ বর্ণিত হয়েছে) সাম্যের অধিকার লিপিবদ্ধ করা ছাড়াও অস্পৃশ্যতাকে আইনের চোখে শাস্তিযোগ্য একটি অপরাধ হিসাবেও (অনুচ্ছেদ ১৭) বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া সংবিধানের ষোড়শ অংশে তপসিলী জাতি এবং উপজাতিভুক্তদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, এই নীতিগুলি হল সেই সমস্ত নীতি যার জন্য ফুলে এবং আম্বেদকার আজীবন সংগ্রাম করেছিলেন। অন্তত সরকারী এবং সাংবিধানিক ক্ষেত্রে চিরকালের নিবর্ত্ত সম্প্রদায়ের মনুষ্যত্বের (manuski) স্বীকৃতি মিলেছে সন্দেহাতীতভাবে।

কিন্তু বাস্তব সমাজ জীবনে এর কোন প্রতিফলন ঘটেনি। এলিটীয় কৃষ্টিতে লালিত সংখ্যাগরিষ্ঠ বর্ণ-হিন্দুদের—পবিত্র, অপবিত্রের ধারণায় যাদের ছিল অন্ধ বিশ্বাস এবং যারা স্তরবিভক্ত হিন্দু সমাজের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত—দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আশা করা দুরাশা ছাড়া কিছু ছিল না, যদিও জাতীয় নেতারা সরকারী-ভাবে গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রতি তাদের আস্থা জ্ঞাপন করেছিলেন, অবশ্য তাঁদের এই আস্থা প্রকাশের মধ্যে যথার্থ অঙ্গীকারের পরিবর্তে ভানটাই ছিল বেশী। জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে আম্বেদকারের সহযোগিতার অবসান ঘটে যখন তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ১৯৫১ সালে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি আবার

অস্পৃশ্যদের সংগঠিত করা এবং শিক্ষাদানের কাজে ফিরে এলেন। ১৯৫৬ সালে তাঁর মৃত্যুর আগে তিনি রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য 'রিপাবলিকান পার্টি''র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন; তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, পরবর্তীকালে তিন লক্ষেরও বেশি ভারতীয় অস্পৃশ্য এই ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

আম্বেদকারের মৃত্যুর পরও অস্পৃশ্যদের অবস্থার কোন গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি ঘটেনি। একথা সত্য যে সংবিধানের ষোড়শ অংশে বর্ণিত ব্যবস্থাগুলির কল্যাণে আইনসভাগুলিতে তপসিলীভুক্ত সম্প্রদায়গুলির জন্য কিছু আসন সংরক্ষিত আছে; সরকারী চাকরির ক্ষেত্রেও তাদের জন্য কিছু সংরক্ষিত পদ আছে; এবং বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে তাদের রক্ষার জন্য আইনগত ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এখনো তাদের অধিকাংশই গ্রামে এবং শহরের বস্তি অঞ্চলে বাস করে, তাদের অধিকাংশই খুবই দরিদ্র ও অশিক্ষিত, এবং তাদের সংগঠনগুলো দুর্বল ও খুব একটা কার্যকর নয়। অপরপক্ষে, তাদের প্রতি হিন্দু জাতিভুক্তদের দৃষ্টিভঙ্গীর খুব বেশি উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয় না, বরঞ্চ দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন এটাই ইঙ্গিত করে যে তারা সম্ভবত আরও নির্দয় ও অনেক ক্ষেত্রে আরও আগ্রাসী হয়েছে এবং প্রশাসন যন্ত্র, বিশেষ করে জেলা ও নিম্নস্তরগুলিতে, অন্ত্যজ জাতি ও শ্রেণীসমূহের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়। অনেক প্রমাণ আছে যে, ভারতীয় সংবিধানের বিশেষ ব্যবস্থাদি সত্ত্বেও ফুলে এবং আম্বেদকারের কাঙ্খিত সামাজিক বিপ্লব স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরও সাধিত হয়নি।[২২]

পুণার গোখেল ইনস্টিটিউট কর্তৃক মহারাষ্ট্রের আটটি জেলার উপর পরিচালিত সমীক্ষার প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, এখনো ৯০ শতাংশ অস্পৃশ্য পরিবার গ্রামের সীমানার বাইরে বাস করে, এবং মাত্র ৫০ শতাংশ পানীয় জলের জন্য সরকারী কূপ ব্যবহার করতে পারে। ১৯৭২ সালে গুজরাট বিধানসভায় প্রদত্ত এক সরকারী বিবৃতি অনুযায়ী, শুধুমাত্র গুজরাটে ৩০ মাসে বর্ণ-হিন্দুরা ৬২ জন অস্পৃশ্যকে হত্যা করেছে। অন্যান্য সরকারী রিপোর্ট থেকে দেখা গেছে যে সারা ভারতে এই ধরণের হত্যা প্রতি বছরে কয়েক'শ ঘটে; অবশ্য এর মধ্যে অপ্রকাশিত হত্যার সংখ্যা ধরা হয়নি। ভারত সরকার অস্পৃশ্যদের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য যে 'ইলায়াপেরুমাল কমিটি' নিযুক্ত করেছিল তার সিদ্ধান্ত হতাশাব্যঞ্জক। এই কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে 'সারা ভারতে এখনো তীব্রভাবে অস্পৃশ্যতাকে মেনে চলা হয়।'

আমার মনে হয় আম্বেদকার যেসমস্ত লক্ষ্যগুলো অর্জনে সফল হয়েছিলেন সেগুলো হল: প্রথমত, অস্পৃশ্যদের প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন; দ্বিতীয়ত, অস্পৃশ্যদের জন্য একটি মতাদর্শ, রাজনৈতিক সংগঠন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে অস্পৃশ্যদের একাংশের মধ্যে বর্ণহিন্দুদের আধিপত্যকে প্রতিরোধ করার এবং নিজেদের মানবিক অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম চালানোর ব্যাপারে উৎসাহিত করতে পেরেছিলেন; এবং তৃতীয়ত, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের (যা প্রধানত

বর্ণ-হিন্দুদের নিয়ে গঠিত ছিল) কাছ থেকে অস্পৃশ্যদের স্বার্থানুকূল কিছু নীতি এবং পদ্ধতি সম্পর্কে অঙ্গীকার আদায় করে নিয়েছিলেন। বিত্তহীন শ্রেণীর জন্য সামগ্রিকভাবে তাঁর জীবন উৎসর্গীকরণ এবং তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা তাঁকে গণমোহিনী নেতার চরিত্র দান করেছিল। কিন্তু কোন ব্যক্তির একক প্রচেষ্টা সমাজ বিপ্লবের বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি করে না, ব্যক্তিটি যতই প্রতিভাবান এবং সমর্পিতপ্রাণ হোন না কেন। পুরনো সমাজ পরিবর্তন করে সামাজিক ও রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য পশ্চিম ইওরোপকে তিনটি প্রধান বিপ্লবের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, এগুলো হল : রেনেসাঁ, ফরাসী বিপ্লব এবং শিল্প বিপ্লব। ভারতবর্ষে বিশেষত এখনো যাঁরা গ্রামে বাস করছেন তাঁদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পুরনো সমাজের প্রভাব এখনো খুবই প্রবল। জাতীয়তাবাদী নেতারা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের জন্য যে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের কাঠামো নিরূপণ করেছেন তার মূল সমাজে প্রোথিত নেই। বৌদ্ধিক এবং শিল্প বিপ্লব ব্যতীত ভারতীয় সমাজের কোন কাঠামোগত পরিবর্তন কখনোই কার্যকর হবে না। আম্বেদকার তা বুঝেছিলেন এবং গুরুত্বের সঙ্গেই দুটো বিষয়কে সমর্থন করেছিলেন। একাজ করতে গিয়ে তিনি শুধু অস্পৃশ্যদের নেতাই নয় ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণের পক্ষে সহায়ক শক্তি হিসাবেও স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। ভারতের তথা আশি লক্ষ অস্পৃশ্যদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আম্বেদকারের মত আধুনিকীকরণের পক্ষে সহায়ক শক্তিগুলি সার্বিক সমাজের আদর্শগত প্রাতিষ্ঠানিক শৃংখল ভাঙতে পারবে কি না তার উপর।

নির্দেশিকা :

১। গুলামগিরি, ইংরাজী অনুবাদ, বম্বে স্টেট কমিটির সৌজন্যে প্রাপ্ত

২। দি ইংলিশ ওয়ার্কস্ অফ রাজা রামমোহন রায়, ১ম-৪র্থ খণ্ড, কে. নাগ এবং ডি. বর্মণ সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৪৫; এবং দি লাইফ্ অ্যাণ্ড লেটারস্ অফ্ রামমোহন রায় : এস্. ডি. কোলেট, সম্পাদনা : ডি. কে. বিশ্বাস এবং পি. সি. গাঙ্গুলি, কলিকাতা, ১৯৬২; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : বিনয় ঘোষ, দিল্লী, ১৯৬৫, এবং এ হিষ্ট্রি অফ্ দি রেনেসাঁ ইন্ বেঙ্গল : শিবনাথ শাস্ত্রী (রোপার লেথব্রিজ কর্তৃক অনূদিত এবং পুনর্মুদ্রিত, কলিকাতা, ১৯৭২)

৩। এম্. জি. রানাডে, এ বায়োগ্রাফি : টি. ভি. পারভেট, বম্বে, ১৯৭৩; ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়া ইন্ দি নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি : আর. কুমার, লণ্ডন, ১৯৬৮

৪। অ্যাওকেনিং ইন বেঙ্গল, জি. চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৫; ইণ্ডিয়ান্ সোশ্যাল অ্যাণ্ড্ পলিটিকাল্ আইডিয়াস্ ফ্রম রামমোহন টু দয়ানন্দ : বি. বি. মজুমদার, কলিকাতা, ১৯৬৭, ৩য় অধ্যায়

৫। র‍্যাশানালিস্টস্ অফ্ মহারাষ্ট্র: এন. আর পাঠক, এল্. এস্. যোশী এবং জি. পি. প্রধান, কলিকাতা, ১৯৬২ এবং বি. বি মজুমদার (গ্রন্থ পূর্বোল্লিখিত) অধ্যায় ৮ এবং ১০; আর. কুমার (গ্রন্থ পূর্বোল্লিখিত), অধ্যায় ৮ এবং ৯; এবং ইণ্ডিয়ান্ নেশানালিসম্ অ্যাণ্ড্ সোশ্যাল রিফর্ম: সি. এইচ্. হিমসেঠ, প্রিন্সটন, ১৯৬৪

৬। মহাত্মা ফুলে চরিত্র ভ করা (মারাঠী): এ. কে. ঘোরপাড়ে, পুণা, ১৯৫৩

৭। দি ট্রাইবস্ অ্যাণ্ড্ কাস্টস্ অফ্ বম্বে: আর. ই. এন্‌থোভেন, ৩য় খণ্ড, বম্বে, ১৯২১

৮। র‍্যাশানালিস্টস্ অফ মহারাষ্ট্র ('জ্যোতিরাও ফুলে'): এল. এস্. জোশী, পৃ: ১৫-২৮

৯। দি ইমারজেনস্ অফ্ ইণ্ডিয়ান্ নেশানালিসম্: অনিল শীল, লণ্ডন, ১৯৬৮; দি ইণ্ডিয়ান্ মিডল্ ক্লাসেস্: বি. বি. মিশ্র, লণ্ডন, ১৯৬৯

১০। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে ১৯০৭ পর্যন্ত নরমপন্থী ও চরমপন্থী দুধরণের জাতীয়তাবাদীরাই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; ১৮৯২ থেকে ১৯০৯-এর মধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ১৩৮৩৯ জন প্রতিনিধির ভিতর ব্রাহ্মণদের সংখ্যাই ছিল মোট ৫৫২৩। পি.সি. ঘোষ, দি ডেভেলাপমেণ্ট অব দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ: ২৩। সিডিশন কমিটির রিপোর্ট, কলকাতা, ১৯১৮, পৃ: ২২৬ অনুসারে মোট যে ১৮৬ জন ব্যক্তি ১৯০৭ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে বাংলায় বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপজনিত অপরাধের জন্য অভিযুক্ত এবং নিহত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ৬৫ জন ছিলেন ব্রাহ্মণ, ৮৭ জন কায়স্থ, ১৩ জন বৈদ্য।

১১। তিলক্ অ্যাণ্ড্ গোখেল: এস. এ. উলপার্ট, বার্কলে এবং লস্ অ্যাঞ্জেলস্, ১৯৬১; লোকমান্য তিলক: জি. পি. প্রধান এবং এ. কে. বেঝট্, বম্বে, ১৯৫৮

১২। গান্ধী ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড্ দি ওয়ার্লড্, শিবনারায়ণ রায় সম্পাদিত, মেলবোর্ন, ফিলাডেলফিয়া এবং বম্বে, ১৯৭০

১৩। আন্‌টাচেবিলিটি: এম. কে গান্ধী, লাহোর, ১৯৪৪; দি রিমুভ্যাল অফ্ আন্‌টাচেবিলিটি, বি. কুমারাপ্পা সম্পাদিত, আহমেদাবাদ, ১৯৫৪; এবং মাই বর্ণাশ্রম ধর্ম, সম্পাদনা এ. টি. হিংরেনী, বম্বে, ১৯৬৫

১৪। ডক্টর আম্বেদকার: লাইফ্ অ্যাণ্ড্ মিশান: ডি. কার, বম্বে, ১৯৬২; সোশ্যাল ফিলজফি অফ্ বি. আর. আম্বেদকার অ্যাণ্ড্ পলিটিকাল ফিলজফি অফ্ বি. আর. আম্বেদকার: ডি. আর জেতভ, আগ্রা, ১৯৬৫

১৫। হু্য আর দ্য শূদ্রস্? : বি. আর. আম্বেদকার, বম্বে, ১৯৭০

১৬। ডক্টর আম্বেদকার অ্যাণ্ড্ দি মাহার মুভমেণ্ট

১৭। শ্রেষ্ঠত্ব ও জন্মগত অধিকারের দাবিতে ব্রাহ্মণ সমস্ত জাতবর্ণের উর্ধ্বতন পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত, দি লজ অব মনু, জি. বুলার, পুনর্মুদ্রণ, দিল্লি, ১৯৬৪, পৃ. ৪০২।

দশম অধ্যায়ে ব্রাহ্মণদের গৌরবান্বিত করা হয়েছে এবং তৎপরেই জাতিচ্যুতদের বিস্তৃত বিবরণসহ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

১৮। অ্যানিহিলেসান অফ্ কাস্ট্ : বি. আর. আম্বেদকার, বম্বে, ১৯৩৬, ৩য় সংস্করণ, ১৯৪৫ ; মিঃ গান্ধী অ্যাণ্ড্ দি ইম্যানসিপেশান অফ্ দি আন্টাচেবলস্, বম্বে, ১৯৪৩ এবং হোয়াট কংগ্রেস অ্যাণ্ড গান্ধী হ্যাভ্ ডান টু দি আনটাচেবলস্, বম্বে, ১৯৪৫

১৯। হু আর দ্য শূদ্রস্ ? : বি. আর. আম্বেদকার, পৃঃ ২৩৬-৩৭

২০। দি আন্টাচেবলস্ : বি. আর. আম্বেদকার, নিউ দিল্লী, ১৯৪৮

২১। জে. এম্. মাহার-এ প্রকাশিত অ্যাডল্ ফিসক্-এর প্রবন্ধ 'সিড্যুল কাস্ট বুদ্ধিস্ট অরগানাইজেশান' ; এবং ডি. ই. স্মিথ-সম্পাদিত সাউথ এশিয়ান পলিটিকস্ অ্যাণ্ড রিলিজিয়ান (প্রিন্সটন, ১৯৬৬)-এ প্রকাশিত ই. জিলট এর 'বুদ্ধিসম্ অ্যাণ্ড্ পলিটিকস্ ইন্ মহারাষ্ট্র'

২২। এ বিবলিওগ্রাফি অন্ সিড্যুল কাস্টস্, সিড্যুল ট্রাইবস্ অ্যাণ্ড্ সিলেকটেড মার্জিনাল কমিউনিটিস্ অফ্ ইণ্ডিয়া, ৫ম খণ্ড, সম্পাদনা, বি. কে. রায় বর্মণ।

ইণ্ডিয়াস্ একস্-আন্টাচেবলস্ : এইচ্. আর. ইসাক, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৫

সেগ্রিগেশান অ্যাণ্ড্ ডিসেগ্রিগেশান ইন্ ইণ্ডিয়া : পি. টি. বোরেল, বম্বে, ১৯৬৮

অ্যানুয়াল রিপোর্টস্ অফ্ দি কমিশনার ফর্ সিড্যুল কাস্টস্ অ্যাণ্ড্ সিড্যুল ট্রাইবস্, দিল্লী, ১৯৫৬ এবং জি. এম্ মাহার সম্পাদিত দি আন্টাচেবলস্ ইন্ কনটেমপোরারী ইণ্ডিয়া

কৃষক আন্দোলন ও জাতপাত

অনন্ত মাজী

নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বর্ণের যুগ হতে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সমাজ ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটেছে, আর্য সভ্যতার সহিত দ্রাবিড় সভ্যতার সংঘাত ও সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। ভারতের পূর্বাঞ্চলে আদিবাসী, দ্রাবিড়, মঙ্গোল ও আর্য সভ্যতার সংমিশ্রণে সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছে।

একদিকে গ্রীক্, পাঠান, মোগল, অন্যদিকে শক্, হূণদের আক্রমণে ভারত বিপর্যস্ত হয়েছে। পাঠান, মোগল ও ব্রিটিশ রাজত্বে বিভিন্ন ধরণের অবস্থার বিপাকে প্রধানতঃ আদিবাসী ও তপশীলদের মধ্যে ধর্মান্তর ঘটেছে। এ দেশে গৌতম বুদ্ধের জন্ম হলেও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যা খুবই কম। এই পরিবর্তিত অবস্থায় বর্তমান স্বাধীন ভারতে জাতপাতের মনোভাব কেন প্রকাশ পাচ্ছে তা অনুধাবন করা দরকার।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। ড· আম্বেদকারের নেতৃত্বে তপশীলী জাতির আন্দোলন ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। দক্ষিণ ও মধ্যভারতে এই আন্দোলন ব্যাপক রূপ নিয়েছিল। তামিলনাদ রাজ্যে ডি· এম· কে· এবং এ· ডি· এম· কে· অন্ধ্রে তেলেগু দেশম্ পার্টির রাজনৈতিক প্রভাব বর্তমানে লক্ষণীয়। পূর্বভারতে ত্রিপুরায় টি· ইউ· জে· এস·, আসামে অসম গণ পরিষদ এবং সমতল ও পাহাড়ের উপজাতিদের আন্দোলন চলছে। নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, মেঘালয়, মণিপুর ও অরুণাচল রাজ্য গঠিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গেও দার্জিলিং-এর নেপালী ভাষাভাষীদের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলায়, দক্ষিণ বিহারে এবং উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, কেওনঝোড়, ও সুন্দরগড় জেলায় ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন চলছে।

ড· আম্বেদকারের নেতৃত্বে ভারতীয় সংবিধান রচিত হয়েছিল। গণপরিষদে উক্ত সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর কার্যকর হয়েছে। এই সংবিধানে তপশীল জাতি ও উপজাতিদের অধিকার স্বীকৃত হয়ে তপশীলভুক্ত হয়েছে। সংবিধানগত অধিকার কার্যকর করতে গেলে ব্যাপক কৃষক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন জরুরি।

মুখ্যতঃ মজুর, খেতমজুর ও কৃষকদের নিয়ে গঠিত আদিবাসী ও তপশীলী সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে গেলে অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে এবং গণ-তান্ত্রিক অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম অপরিহার্য। ব্রিটিশ রাজত্বে কৃষক সাধারণের উপর যে মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ চাপানো হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে দক্ষিণ ভারতে কৃষক বিদ্রোহ, পশ্চিমবাংলায়, দক্ষিণ বিহার

ও পশ্চিম উড়িষ্যায় সাঁওতাল বিদ্রোহ, মধ্যবাংলায় নীল বিদ্রোহ, পাবনায় কৃষক বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগিয়ে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এইসব সংগ্রামে স্বাধীনতার আশা-আকাঙ্ক্ষাও প্রতিফলিত হয়েছিল। ১৯২০ সালে বিভিন্ন কলকারখানায় ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলনের সমন্বয়ে সারাভারত ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠিত হয়। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলের কৃষক আন্দোলনগুলির সমন্বয়ে ১৯৩৬ সালে সারা ভারত কৃষক সভা গঠিত হয়। বর্তমানে কৃষিখামারগুলিতেও ট্রেড্ ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে। ১৯৬৮তে গ্রামাঞ্চলের অসংগঠিত খেতমজুরদের নিয়ে সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নও গঠিত হয়েছে। সারাভারতে খেতমজুরদের সংখ্যার (বর্তমানে প্রায় ৫ কোটি) অনুপাতে সংগঠিত ক্ষেতমজুরদের সংখ্যা নগণ্য। ফলে এখনও বেগার প্রথা লোপ পায়নি। তাঁরা খাদ্যসমস্যা, বেকারী, বাস্তু প্রভৃতি সমস্যায় জর্জরিত। মজুরীর হারও মালিকের স্বেচ্ছাধীন। নাবালক ও শিশু শ্রমিকদের সংখ্যাও অনেক বেড়েছে।

জাতপাতের অজুহাতে এঁরা নির্মম শোষণ ও অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন। বিভিন্ন জাতপাতের প্রভাব কাটিয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কৃষক ও খেতমজুরদের শ্রেণী-সংগ্রাম এবং গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন ও সংগ্রাম করতে হবে। শোষক শ্রেণী জাতপাত ও ধর্মের দোহাই দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করার প্রয়াস চালায় তা কাটিয়ে ওঠাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয়েছে। সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, লায়েক বিদ্রোহের ইতিহাসে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সমস্ত কৃষক সংগ্রামে জাতপাতের প্রভাব গৌণ হয়ে পড়েছিল। হিন্দু, মুসলমান, তপশীল জাতি ও উপজাতি এসব সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল।

বর্তমান শতকে ১৯৪৬ সালে সারা বাংলা দেশে ৬০ লক্ষ ভাগচাষী বা আধিয়ারের তেভাগা সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে এই সংগ্রামের কয়েক মাস পূর্বে বৃটিশের চক্রান্তে হিন্দু-মুসলমানদের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয়েছিল। কিন্তু এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের সময় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও ঘৃণা ভুলে গিয়ে হিন্দু, মুসলমান, তপশীলী ও আদিবাসী সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে উক্ত মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পুলিশের গুলিতে ৬৪ জন শহীদ হয়েছিলেন। দিনাজপুরে প্রথম শহীদ হন শিবরাম সাঁওতাল এবং সমীরুদ্দিন এই ৬৪ জন ছিলেন হয় খেতমজুর না হয় কৃষক। দক্ষিণ-পূর্ব মেদিনীপুরে নন্দীগ্রাম, মহিষাদল, সুতাহাটা থানার বিভিন্ন এলাকার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়—

এই বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ভাগচাষ প্রথায় চাষ হত। ভাগচাষীদের জমির কোনও নিরাপত্তা ছিল না। বাজে আবওয়াব, কর্জ ধানের সুদ, উচ্ছেদ প্রভৃতি সমস্যায় জর্জরিত হয়ে নির্মম শোষণের শিকার হতে হ'ত। ভাগচাষী ছিলেন মাহিষ্য মুসলিম ও তপশীলী সম্প্রদায়ের মৎস্যজীবী ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়। জোতদাররা ছিলেন প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য। কয়েকজন মুসলিমও ছিলেন।

এই সংগ্রামে জাতপাতের কথা ভুলে গিয়ে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। বিভিন্ন মামলায় ও সংঘর্ষে পুরুষেরা গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার পরও যে সমস্ত মেয়েরা এই সংগ্রামে পুলিশের সহিত সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে পর্দানশীন মুসলিম মেয়েরাও ছিলেন। তখন জাতপাতের প্রভাব দেখা যায়নি।

এই সময়ে ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণায় টঙ্ক প্রথা, মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর থানায় সাঞ্জাপ্রথা এবং ঘাটাল ও দাসপুরে কুতপ্রথা, হাওড়া জেলার শ্যামপুরে বাবুদি প্রথার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলেছিল তাতেও জাতপাতের বালাই ছিল না। সমস্ত কৃষক ঐক্যবদ্ধভাবেই লড়েছিল।

স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত বহু রকম উস্কানি সত্ত্বেও কোনও বড়রকম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা আসা সত্ত্বেও সংখ্যালঘু মুসলিমদের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হয়নি। অবশ্য বর্তমানে নেপালী ভাষাভাষীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য দার্জিলিং জেলার পার্বত্য মহকুমাগুলিতে যে হিংসাত্মক আন্দোলন চলছে, তা মীমাংসার মাধ্যমে সমাধান হয়ে যাবে আশা করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাংশে ও পুরুলিয়া জেলায়, দক্ষিণ বিহারের জেলাগুলিতে, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, কেওনঝোর, সুন্দরগড় জেলায় ঝাড়খণ্ডের দাবীতে যে আন্দোলন চলছে তাতে সাঁওতাল, ভূমিজ, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের সহিত স্থানীয় কুর্মক্ষত্রিয় ও অন্যান্য স্থানীয় অধিবাসীদের অংশগ্রহণ এবং সমর্থন দেখা যায়। এই সমস্ত এলাকার অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হ'লে এই আন্দোলনও প্রশমিত হয়ে যাবে।

পশ্চিমবাংলায় গণতন্ত্রের অগ্রগতি ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশী। মেহনতী মানুষের মধ্যে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকারবোধ লক্ষ্যও করা যাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষায় অগ্রণী কেরলরাজ্যে জাতপাতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগুলির সক্রিয় ভূমিকা লক্ষণীয়ভাবে এখনও রয়েছে। বিহার রাজ্যে উচ্চবর্ণের বড় বড় জমির মালিকদের অত্যাচারে গরীব আদিবাসী ও তপশীল সম্প্রদায়ের খেতমজুর ও গরীব চাষীদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। এই রাজ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জোতদারেরা বিভিন্নস্থানে হরিজন ও আদিবাসীদের হত্যা করে ও ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে এবং হত্যাকাণ্ড চালিয়ে কলঙ্কজনক নজির সৃষ্টি করেছে। এই রাজ্যে জাতপাত-এর মনোভাব প্রকটভাবে দেখা গিয়েছে, উত্তর প্রদেশে জাঠ, ব্রাহ্মণ ও ঠাকুর সম্প্রদায়ের অত্যাচার এখনও অব্যাহত রয়েছে। বহুক্ষেত্রে হরিজন ও তপশীলী সম্প্রদায়ের গরীব মানুষেরা নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে না। মহারাষ্ট্রে ও মধ্যপ্রদেশেও অনুরূপ জাতপাতের মনোভাব দেখা যায়। অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে এবং গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের জন্য কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হলেও জাতপাতের মনোভাবের দরুণ তা দুর্বল হয়ে রয়েছে। 'বেগার প্রথা' বিলোপের আইন হওয়া

সত্ত্বেও আজও বহু বেগারকে অসহনীয় অবস্থায় জীবন কাটাতে হচ্ছে। উঠবন্দী ও উচ্ছেদযোগ্য কোর্ফা রায়তগণ উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। এদের মজুরীর হারও কম।

জাতপাতের প্রভাবমুক্ত ভারত গড়তে হলে বিভিন্ন ধরণের শোষণ বন্ধ করে বিভিন্ন জাতপাতের গরীব ও মেহনতী মানুষদের জীবন, জীবিকা, বাস্তু ও জমিতে নিরাপত্তা (Security of tenure) আনা বিশেষ প্রয়োজন। এজন্য মধ্যস্বত্বের বিলোপ সাধন করে উদ্‌বৃত্ত ও আবাদযোগ্য পতিত জমি বণ্টন এবং খাজনা প্রথার বিলোপ করা, উঠবন্দী ও বর্গাচাষীদের জমির মালিকানা দেওয়া প্রভৃতির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ভূমি সংস্কার করতে হবে। দিনমজুর ও খেতমজুরদের ন্যায্য মজুরী, কাজের গ্যারাণ্টী, বাস্তুজমি ও সস্তায় খাদ্যের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার, সমস্ত গণতান্ত্রিক দল ও মতের মানুষকে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। বিভিন্ন জাতপাতের মানুষদের ধর্মীয় উপাসনা গৃহে প্রবেশের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা চলবে না। সকল মানুষের সমান অধিকারের চেতনা গড়ে তুলতে হবে।

চারণ কবি মুকুন্দদাসের কথায় "জাতের নামে বজ্জাতি সব, জালজুয়াচুরি করছ তাই"—মনে রেখে "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই" আদর্শকে স্থাপনের মাধ্যমে নতুন গণতান্ত্রিক ভারত গড়ে তুলতে হবে।

জাতপাত ও ট্রেডইউনিয়ন

তিমির বসু

জাতপাত নিয়ে রাজনীতি নতুন নয়। নতুন হচ্ছে জাতপাত ও তার সমস্যা নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনার প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ। প্রগতিশীল অথবা প্রতিক্রিয়াশীল —কোন ধরনের রাজনীতিই 'জাতপাত' বাদ দিয়ে এগোবার কথা ভাবতে পারছে না। ভারতের সামাজিক কাঠামোর প্রতি স্তরে 'জাত' এবং বর্ণগত বৈষম্য জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে আছে। অথচ বামপন্থীরা, বিশেষ করে কমুনিস্টরা, ব্যাপারটা সযত্নে এড়িয়ে যায়। আজ দেশের সর্বত্রই এমন এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যার মোকাবিলা চিরাচরিত বামপন্থী রাজনৈতিক প্রয়োগ দ্বারা সম্ভব নয়। নতুন অবস্থার জন্য প্রয়োজন নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রয়োগ আঙ্গিক আর নতুন সাংগঠনিক আকার।

যদিও শ্রমিক আন্দোলন, বলা ভাল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন তেমনভাবে জাতপাত কণ্টকিত হয়নি কিন্তু সংগঠকদের ক্ষেত্রে সমস্যা যথেষ্টই রয়েছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশে অসমানতা রয়েছে, তারতম্য রয়েছে জাতপাতের প্রভাবে। তুলনামূলকভাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাতের প্রভাব কম সন্দেহ নেই। কিন্তু 'উচ্চবর্ণের' আধিপত্য নেই—একথা একেবারেই ভিত্তিহীন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে জাতপাত সংক্রান্ত বিষয়ক তেমনভাবে আলোচিত হয় না তার কারণ লাল ঝাণ্ডা ইউনিয়ন ব্যাপারটার উপর তেমন কোন গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের প্রতিপদে জাতপাত, প্রাদেশিকতা এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের মোকাবিলা করতে হয়। পশ্চিমবাংলার শিল্পে এখনও পর্যন্ত ভিন্ন প্রদেশের শ্রমিকের সংখ্যাই বেশী। বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের কৃষক—সম্পন্ন এবং দরিদ্র কৃষক কিম্বা ভূমিহীন কৃষক এরাই পশ্চিমবাংলার তথাকথিত শিল্প প্রলেতারিয়েত। বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে জাতপাতের রাজনীতির প্রচণ্ড প্রভাব রয়েছে সাধারণ মানুষের উপর, শ্রমিকের জীবনযাত্রায় তার প্রতিফলন ঘটা খুবই স্বাভাবিক। সবুজ ঝাণ্ডা কিম্বা লাল ঝাণ্ডা ইউনিয়ন এ ব্যাপারে কিছুটা অসহায় মনে হয়।

বিহার কিম্বা উত্তরপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলে যারা সামাজিক ও বর্ণগত প্রতিপত্তির অধিকারী তারাই কলকাতার সংগঠিত শ্রমিক। সমাজগবেষকরা ব্যাপারটায় নতুনত্বের সন্ধান পেতে পারেন। স্থায়ী চাকুরী, তুলনামূলকভাবে ভাল মজুরী, অন্ততঃ বাজারদরের সঙ্গে কিছুটা সঙ্গতিমূলক, আর চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর এই সেদিনও আত্মীয়-স্বজনের চাকুরীর নিশ্চয়তা [সার্ভিস পর এক আদমী]—সংগঠিত শিল্পে এই অবস্থাটা আজ কিছুটা পাল্টাচ্ছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ধারার

চিরাচরিত বেশীরভাগ শ্রমিক হচ্ছে তিওয়ারি, পাণ্ডে, চৌধুরী ঝা নতুবা ভূমিহার সিং। যাদব, কোরি এরাও আছে তবে কিছুটা অল্প সংখ্যায়। আর ব্যাপক অসংগঠিত শিল্পে, ক্রমবর্ধমান ঠিকামজদুরিতে যারা নিয়োজিত তাদের অধিকাংশই হরিজন—চামার, দুসাদ, রবিদাস। এমন কিছু শিল্প আছে যেখানে তিওয়ারিজীরা কখনই ঢোকার চেষ্টা করেনি। ট্যানারী শিল্পে বিহারের চামার সম্প্রদায়ের মনোপলি। এমনকি চীনা এবং মুসলিম মালিকানায় পরিচালিত ট্যানারীতে এরাই কাজকরে যদিও শুরুতে চীনারা ব্যাপক সংখ্যায় কাজ করত। মুসলিমরা সমস্ত শিল্পেই আছে। একই ইউনিয়নে থেকে বহু জঙ্গী আন্দোলন করবার পরও এরা যে একটা বিশেষ ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যেরও অধিকারী এটা এরা পদে পদে বুঝিয়ে দেয়। আর প্রাদেশিকতা কীভাবে শিকড় গেড়ে বসে আছে তার হদিস অনেকেই রাখেন না। 'হিন্দী' যেহেতু রাষ্ট্রভাষা সেহেতু বাঙালী বাবুকে হিন্দীতে লেকচার দিতে হবে কিন্তু বিশ বছরের উপর কলকাতায় থাকার পরও পাণ্ডেজীরা বাংলায় বোলচালের পক্ষপাতী নয়। অথচ সবাই এধরণের প্রাদেশিকতার শিকার—ঘটনা এমন নয়। ভিন্ন চিত্রও আছে। এইসব অন্ধদের সম্পর্কে কিছুটা এগিয়ে থাকা শ্রমিকরাই বেশ মজার ঠাট্টা চালু করেছে—বিহার সে যেইস্যা পার্শেল আয়া ওইস্যাই পার্সেল আপস চলা গিয়া। 'পার্সেল' খোলা জলে তবেই তো স্থানীয় কালচারের সংগে সহমর্মিতার প্রশ্ন আসবে। ঘটনাচক্রে শিল্পশ্রমিকদের মধ্যে একধরণের জাতবিন্যাস শুরু থেকেই চলে আসছে। উচ্চবর্ণের শ্রমিক তার কর্মক্ষেত্রে কিছুতেই নিম্নবর্ণের শ্রমিককে ঢুকতে দেয় না। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে এক জায়গায় কাজ করবার পরও পাণ্ডেজীরা রবিদাসের ছোঁয়া জল খাবে না। পাণ্ডেজীদের কাজের জায়গায় কীভাবে ঠাকুর বা পণ্ডিতের চা-এর দোকান গজিয়ে যায় সেটাও বেশ তাজ্জব ব্যাপার।

ষাটের দশকের শেষ দিকে স্থায়ী কাজে বিভিন্ন বেসরকারী কোম্পানী এবং সরকারী সংস্থা ব্যাপকভাবে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ শুরু করে। নতুন নিয়োগ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৭০ সাল নাগাদ ঠিকামজদুরি বিলোপ আইনের জন্ম। ঠিকা মজুরদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত করা বরাবরই বেশ সমস্যা ছিল—আইনগত সমস্যা তো ছিলই। এই আইনের ফলে ইউনিয়ন করবার যৌক্তিকতা পরোক্ষে কিছুটা স্বীকার করা হলেও এই আইনে ইচ্ছাকৃত ফাঁক রাখার ফলে পুরো ব্যাপারটাই শেষপর্যন্ত ফাঁকিতে পর্যবসিত হয়। স্থায়ী কাজে উত্তরোত্তর ঠিকাপ্রথা বেড়েই চলেছে।

৭০-এর পর কলকাতা এবং আশেপাশে বেশ কিছু ঠিকা মজদুর ইউনিয়ন তৈরী হয় মূলতঃ এই আইনের সুযোগ নেওয়ার জন্য। কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই এমন একটি বিদেশী সংস্থা যেখানে স্থায়ী শ্রমিকের আন্দোলনবিমুখতা তথা ধর্মঘট না করার মানসিকতা প্রায় কিংবদন্তীতে পেঁৗছেছিল—লালঝাণ্ডা ইউনিয়ন থাকা সত্বেও। অদক্ষ মজুরদের ব্যাপক সংখ্যায় যেসব বিভাগে দরকার হয়

তার মধ্যে Mains Department বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদ্যুৎ বণ্টন প্রধানতঃ নির্ভর করে এই Mains Department-এর উপর। হাই টেনশন আর লো টেনশন মিলিয়ে এক সময় হাজার দুয়েক দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিক ছিল। এই স্থায়ী শ্রমিকরা বেশীর ভাগই বিহারের উচ্চবর্গের—পাণ্ডে, গিরি, চৌধুরী কিম্বা ভুমিহার সিং। অদ্ভুতভাবে এদের অধিকাংশই আবার বিহারের মুজফফরপুর জেলার। অনেকে দু-পুরুষ বা তিনপুরুষ ধরেও বাস করছে। অর্থাৎ বাপ অবসর নেওয়ার পর ছেলে ঢুকেছে। বহু বৃটিশ কোম্পানীই ইউনিয়নবিরোধী খয়ের খাঁ তৈরী করবার জন্য এই ব্যবস্থা সেদিন পর্যন্ত চালু রেখেছিল। কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাইতে প্রায় ৮০ বছর এই Mains department বাদে-এ একটা বড় ধরণের ধর্মঘট হয়েছিল ৭০ দশকের শুরুতে। কোম্পানী মা-বাপ—এই ধারণা মুজফফর-পুরওয়ালাদের মধ্যে এতই বদ্ধমূল ছিল যে লালঝাণ্ডা কিম্বা সোসালিস্টদের হাফ-লালঝাণ্ডা ইউনিয়ন ইতিপূর্বে বিশেষ কিছুই করতে পারেনি। সত্তরের দশকেই হাই টেনশন আর লো টেনশন লাইনে ব্যাপকভাবে ঠিকাগজদুর নিয়োগ শুরু হয়। দেখা গেল এখানে যারা কাজ করছে তাদের প্রায় সবাই হরিজন আর মুসলিম সম্প্রদায়ের। বামুন দু একজন আছে কিন্তু তারাও হরিজনদের বামুন। অদ্ভুতভাবে এদের সবাই প্রায় গয়া জেলার। ঠিকামজুরদের মধ্যে উচ্চবর্ণের কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল না। Mains-এ কাজের ধরণটাই এমন সে বহু সময় স্থায়ী শ্রমিক আর ঠিকা শ্রমিককে পাশাপাশি কাজ করতে হচ্ছে। সবাই একই কাজ করছে যদিও ঠিকা শ্রমিক বেশী কাজ করে কম মজুরি পাচ্ছে। কিন্তু রাম কিম্বা রবিদাস কোন পাণ্ডে কিম্বা চৌধুরীর সামনে এলে প্রথমেই একটা সেলাম ঠুকে নিচ্ছে। একই কাজ করা সত্ত্বেও পাণ্ডেবাবাজীরা হরিজন মজুরদের ছোট জাত বই অন্য কিছুই ভাবতে পারে না।

স্থায়ী মজুররা একবার ধর্মঘট করায় ঠিকা মজুরদের সামনে প্রলোভন ছিল স্থায়ী চাকুরী পাবার যদি তারা কোম্পানীর কথামত নিয়মিত কাজ করে। কিন্তু তারা করেনি। আপাতদৃষ্টিতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংহতির স্বার্থে। আসলে পাণ্ডে চৌধুরীরা ছোটলোক চামার ধাঙড় প্রভৃতি ঠিকা শ্রমিকদের ধর্মঘটে সহযোগিতা করতে বলায় কাজ হয়েছিল বেশী। একই এই ঠিকা মজুররা যখন স্থায়ীকরণ তথা কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই শ্রমিকের সমান সুযোগসুবিধা আদায়ের জন্য ধর্মঘট করে বসল তখন পাণ্ডে চৌধুরীদের দিয়ে কিছুতেই এক ঘণ্টার জন্য সংহতিমূলক কর্মবিরতি করানো যায়নি। এমনকি স্থায়ী ও ঠিকা—উভয় ইউনিয়নে 'বহিরাগত' বাঙালী বাবুদের নেতৃত্ব থাকা সত্ত্বেও এটা সম্ভব হয়নি। অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের একটা ব্যাপার ছিল বৈকি কিন্তু ঠিকা মজুররা উচ্চবর্ণের কিম্বা নিদেনপক্ষে ভুমিহার হলেও এই ধর্মঘট করা অসম্ভব হত না।

বিহারের গ্রামে এই হরিজনরাই ভুমিহার মধ্য বা সম্পন্ন চাষীর জমিতে দিনমজুর।

এইসব ছোটজাত দিনমজুররা আজকাল অধিক মজুরি দাবি করছে বলে সংগঠিত শিল্পের ভূমিহার শ্রমিক তার অসন্তোষ চাপা রাখে না। গ্রামের জাতপাত তথা শ্রেণীগত বিরোধ কলকারখানার দরজায় পেঁছে গেছে। সমস্যাটা রীতিমত জটিল যদিও কম্যুনিস্টরা চিরাচরিত কাঠামোর বাইরে অন্য কিছুই ভাবতে পারছে না।

জাতপাতভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন তৈরীর চেষ্টা একদম হয়নি এমন ভাববার কারণ নেই। তপশীল সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রমজীবী অথবা মসিজীবীদের ইউনিয়ন আছে যদিও তার তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই। কিন্তু জাত বা ধর্মভিত্তিক ইউনিয়ন গঠনের প্রচেষ্টা ভয়াবহ হতে পারে। কলকাতা তথা পশ্চিমবাঙলায় 'জাত'ভিত্তিক ইউনিয়ন বিশেষভাবে সফল বোধহয় কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে। সিটু এবং আই. এন. টি. ইউ. সি থাকা সত্ত্বেও এখানে হরিজন মজদুর সংঘ বলে একটা ইউনিয়নের জন্ম হয়েছে। এর বয়স অপেক্ষাকৃত কম সময়ের, পুরানো সব ইউনিয়ন ভেঙেই এর শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে। 'হরিজন' শব্দটা আমদানি করে কাজের কী স্থবিধা হচ্ছে বোঝা মুশকিল কারণ কলকাতা কর্পোরেশনে বিহারের হরিজন মজুরদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার জন্য কেউ নেই। অবশ্য ধাপায় যে কাজটা হয় সেখানে কিছু বাঙালী তপশিলীভুক্ত লোকজন কাজ করে। তাহলে কেন হরিজন মজদুর সংঘ? এ ব্যাপারে সংঘের নেতা বেরামেলা দাসকে বহুবার জিজ্ঞেস করেও তেমন কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। সরকারের লেবার দপ্তর ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন মঞ্জুর করবার সময়ও ব্যাপারটা নিয়ে আপত্তি তোলেনি কেন বোঝা মুশকিল। রাজনৈতিক ঝাণ্ডার ইউনিয়নে থাকার একটা অবস্থা থাকে কিন্তু 'হরিজন' ঝাণ্ডা সামনে নিয়ে আসার বলে 'অ-হরিজন' কর্মচারীরা স্বাভাবিকভাবেই এইরূপ মনোভাব পোষণ করবার দিকেই এগোবে।

শিল্পশ্রমিক ইউনিয়নে 'জাত পাত' নিয়ে বিভাজন এখনও তেমনভাবে প্রকট হয়নি। 'জাত'ভিত্তিক এসোশিয়েশন বেশীর ভাগই সোসাইটি অ্যাক্টে রেজিস্ট্রীভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ মৎসজীবী সমিতি সোসাইটি অ্যাক্টে রেজিস্ট্রীকৃত হলেও অনেকটা সাধারণ শিল্প ট্রেড ইউনিয়নের ছকে মাঝে মাঝে কিছু আন্দোলন করে থাকে। মৎসজীবীর অধিকার রক্ষার ব্যাপারে এরা বেশ সোচ্চার। নেতৃত্বে স্কুলের প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে পদস্থ সরকারী কর্মচারীরাও রয়েছে। অথচ 'কৈবর্তসমাজ' থেকে যারা যশ খ্যাতি ইত্যাদি অর্জন করেছে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করে এরা বেশ আনন্দ পায় বলে মনে হয়। পশ্চিমবাঙলায় 'জাতপাত' সংক্রান্ত উৎপাত নেই বলে বামপন্থীরা যে গর্ব করে থাকে তার আদৌ কোন ভিত্তি নেই।

যেখানে একই ইউনিয়নে 'উচ্চবর্ণ' আর 'নিম্নবর্ণের' মজুররা পাশাপাশি রয়েছে সেখানেও নেতৃত্বে আছে উচ্চবর্ণের লোকেরা। অর্থনৈতিক সংকট বাড়ার সাথে সাথে প্রদেশগত দ্বন্দ্বও ইদানীং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। কলকাতা পোর্ট আর ডকে জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন শোর মজুরদের একটা

ইউনিয়ন মাঝখানে বেশ সোরগোল তুলেছিল। নেতারা প্রধানতঃ উত্তরপ্রদেশের মজুরদের বোঝাতে পেরেছিল—যতক্ষণ তেরঙা বা লালঝাণ্ডাওয়ালা বাঙালী বাবুরা ইউনিয়ন নেতৃত্বে থাকবে ততক্ষণ তাদের ছেলেদের চাকুরীর কোন সম্ভাবনা নেই। আসলে আধুনিকীকরণের ধাক্কায় শ্রমিক সমাজে দ্রুত নতুন নিয়োগ হচ্ছে না বললেই চলে। এই অবস্থা মোকাবিলা করবার জন্য সমস্ত রঙের ইউনিয়নই ব্যর্থ, ফলে প্রাদেশিকতা ভিত্তি করে ইউনিয়ন দাঁড় করাবার চেষ্টা।

যদিও 'জাতপাত'ভিত্তিক ইউনিয়ন তেমন আবেদন রাখতে পারছে না তবুও Dalit Voice এর V. T. Rajschlar-রা যেভাবে 'জাত'ভিত্তিক আন্দোলনের সপক্ষে প্রচার চালাচ্ছে এবং এক সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আর এক সাম্প্রদায়িকতা দাঁড় করাচ্ছে তার প্রভাব কমবেশী শ্রমিক আন্দোলনেও এসে পড়বে।

খণ্ডিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো আদৌ যুক্তিসংগত নয় কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনে একটা বিপদের সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে এসম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মতামত ব্যক্ত করা যায় বইকি।

পশ্চিমবঙ্গের লোধাশবর

মহাশ্বেতা দেবী

লোধাদের সবথেকে বেশি সংখ্যায় দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলায়। যতদিন এখানে বনভূমি ছিল, তারা শিকারী হিসেবে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু বর্তমানে অবিরাম, নির্মম বন উচ্ছেদের ফলে বনভূমি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ফলে আজ তারা বর্তমান ক্ষুধিত বর্বর সময়ের নাগপাশে ধরা পড়ে কোনোমতে অস্তিত্বটুকু টিকিয়ে রাখার জন্য লড়ছে, হেরে যাচ্ছে, তবু লড়ছে। সংখ্যায় কম হবার ফলে তারা অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যেও অসহায়বোধ করছে। এই ধরণের মানসিকতা পুরুলিয়ার খেড়িয়া, বিরহড় এবং পাহাড়িয়া প্রভৃতিদের মধ্যেও প্রকট হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক দলগুলির এই ক্ষুদ্র উপজাতিদের অস্তিত্ব অবহেলা করার অন্যতম কারণ হোল এদের মধ্যে ভোটারসংখ্যা মাত্র কয়েক হাজার। নিম্নসংখ্যক হবার ফলে এরা কোন দলের কাজে লাগছে না। যখন লোধা হত্যা ব্যাপক আকার ধারণ করে, তখন মাত্র কয়েকদিনের জন্য লোধারা সংবাদপত্রের পাতায় "সংবাদ" হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি দেখতে পাইনি যে রাজ্যের কোন রাজনৈতিক দল এই হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। প্রহ্লাদ ভক্তা লোধাদের মধ্যে একমাত্র স্নাতক। সে নিয়মিত আমার পত্রিকা "বর্তিকা"-র জন্য লেখে। সর্বপ্রথম তার লেখা থেকেই আমি লোধাদের সম্পর্কে জানতে পারি। ১৯৭১ সালে আমার বাবার মৃত্যুর পরে আমি 'বর্তিকা' (জেলা সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক) সম্পাদনার ভার নিই। বাবার জীবিত অবস্থায় বর্তিকা বহরমপুর থেকে প্রকাশিত হোত। আমি যখন বর্তিকার বিষয় সম্পূর্ণ বদল করে সমাজের নিম্ন ও অবহেলিত মানুষদের জন্য প্রকাশ করতে আরম্ভ করলাম তখন অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানতাম যে ভারতীয় জনগণ যদি নিরক্ষর বা কম শিক্ষিতও হয়, তারা কখনোই সভ্যতা, জ্ঞানবুদ্ধি বা অভিজ্ঞতায় দীন নয়। সুতরাং বর্তিকাকে আমি তাদের হাতে তুলে দিলাম। বর্তিকাতে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত গ্রামসমীক্ষা বা কৃষি শ্রমিকদের জীবনযাত্রা, ক্ষুদ্র কৃষক বা রিক্সাওয়ালাদের জীবন, ইত্যাদি বিষয় প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি সমস্তই প্রত্যক্ষ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ওদের লেখা। যারা আমাকে এই সমস্ত লেখা দিয়ে সাহায্য করেছে, তাদের লেখার পদ্ধতি বা ভাষা কোনটাই আমি পরিবর্তন করে অসম্মান করিনি। 'সমাজের সাধারণ মানুষ তার অভিজ্ঞতার কথা নিজের ভাষাতেই লিখে জানাবে। সমাজের শিক্ষিত লেখকরা তাতে বাধা সৃষ্টি করবে না'—বর্তিকার এই উদ্দেশ্য আজ অনেকাংশেই সফল হয়েছে। বর্তিকার অন্যান্যদের মধ্যে প্রহ্লাদ ভক্তা অবশ্যই একজন বিশিষ্ট লেখক। একজন লোধার মুখ থেকে তার নিজের ঘটনা শোনার ফলে আমি স্বভাবতই উৎসাহিত বোধ করেছিলাম।

প্রহ্লাদ তার সমাজের সঙ্গে আমার পরিচিতি ঘটিয়েছিল। লোধাদের দেখে আমার মনে হয়েছে তারা বুদ্ধিমান, বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে সচেতন এবং অবশ্যই বড় মাপের হৃদয়ের অধিকারী। আমার সমস্ত চিন্তাধারাই আজ তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে।

রাষ্ট্রীয় সরকারের জনসংখ্যা গণনা অনুযায়ী লোধা এবং খেড়িয়াদের একই উপজাতি হিসাবে গণনা করা হয়েছে। কিন্তু খেড়িয়ারা লোধাদের থেকে অনেক পিছিয়ে পড়া উপজাতি ঃ ১৯৭১ সালের জনসংখ্যা গণনা অনুযায়ী লোধা ও খেড়িয়া মিলে জনসংখ্যা ছিল ৪৫,৯০৬ জন। এর মধ্যে লোধার সংখ্যা ছিল ৩৫,০০০। এই জনসংখ্যা অবশ্যই ১৯৮১ সালে এক থাকবে না, যদিও পরিবর্তন হবে খুব সামান্য। এই দুই উপজাতিই বিশেষ করে লোধারা যুগের পর যুগ ধরে সন্ত্রাসিত ও নির্যাতিত হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করছে। এর প্রতিফলন অবশ্যই তাদের জনসংখ্যাকে প্রভাবিত করেছে। লোধাদের জন্মের হার আশানুরূপ বাড়ছে না। ১৯৭১ সালের জনসংখ্যা গণনা অনুযায়ী দেখা যায় যে লোধা খেড়িয়াদের মধ্যে কেবলমাত্র ৪·০৯ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেছে। মাধ্যমিক বা তার থেকে ওপরে পাশের হার ০·৩১ শতাংশ। এদের মধ্যে মাত্র ১৮,৩৭৯ জন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত রয়েছে। সকলের মধ্যে বিশেষত লোধারা চরমতম দরিদ্র। ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে এক লোধা যুবক কর্তৃক নিম্নলিখিত গ্রামসমীক্ষাটি আমার বক্তব্যকে আরো পরিষ্কার করেছে।

গ্রামের নাম—শাঁখারিডাঙ্গা
লোধা বাস্তু—৮৮টি
কৃষিযোগ্য জমি—১৪ ডেসিমেল থেকে ১ একর
৫৯ জন লোক।
মোট জমিহীন—২৯ জন
বাস্তুজমি নেই—১৮ জনের
মোট জনসংখ্যা—৪৭০ জন
ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়—৩৩ জন
মজুরী পায়—১৬৪ জন
মাসে ১৫ টাকা রোজগার করে—১৬ জন
,, ৩০ ,, ,, ,,—১৩০ ,,
,, ৪৫ ,, ,, ,,—১৬ ,,
,, ৫০ ,, ,, ,,—২ ,,

শাঁখারিডাঙ্গা একটি লোধাগ্রাম। লোধাদের মিশ্র জনপদে বাস করতে দেখা গেলেও তারা সাধারণত মহল্লা বা টোলীতেই বসবাস করে থাকে। লোধারা নিজেদের লোকেদের মধ্যে থাকতেই ভালবাসে। লোধাদের জীবনে দারিদ্র্যই একমাত্র অভিশাপ নয়। ব্রিটিশরা একসময় এদের "অপরাধপ্রবণ" বলে আখ্যা দিয়েছিল এবং সাধারণ

মানুষেরা আজও তাদের সেই চোখেই দেখে। যখনই কোন জায়গায় চুরি বা ডাকাতি হয়, পুলিশরা লোধাদের ধরে পীড়ন করে। পুলিশ এবং প্রশাসন ভালো করেই জানে যে এই সমস্ত চুরিডাকাতির পেছনে গ্রামের উচ্চ স্তরের বড়লোকদের হাত আছে। কিন্তু লোধারা তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে না। কেবলমাত্র সামান্য কিছু সংখ্যক লোধাই অপরাধকার্যে লিপ্ত আছে। অপরাধ এখন একটা শিল্পের আকার ধারণ করছে। চোরাই মাল বেচাকেনা করাই প্রকৃত অপরাধ। কিন্তু এই কাজে যারা লিপ্ত থাকে তারা সাধারণত বিত্তবান ও ক্ষমতাশালী হওয়ার ফলে পুলিশ তাদের ছুঁতেও পারে না। যখন চুরির ঘটনা বাড়ে, তখন লোধাদের হত্যা করা হয়। একজন বৃদ্ধা মহিলাকে ধর্ষণ করেছে এই অপরাধে ১৯৮২ সালের জুলাই মাসে ঝাড়গ্রামের কাছে তিনটি গ্রামে ছয়জন লোধাকে হত্যা করা হয়। কিন্তু লোধাদের সম্পর্কে এই রটনা ছিল সম্পূর্ণ বানানো গল্প। পাশের একটি গ্রামের উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরাই ছিল প্রকৃতপক্ষে আসল অপরাধী। কিন্তু কেউই সত্য ঘটনা উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হয়নি, কারণ লোধাদের সাহায্য করার জন্য কেউ নেই। লোধা হত্যা পশ্চিমবঙ্গে একটি নিয়মিত ঘটনা। যেমন,

(১) ১৯৭৯ সালে ১৮ জন লোধাকে পাতিনায় হত্যা করা হয়।

(২) ১৯৮২ সালের জানুয়ারি মাসে ৬ জনকে হত্যা করা হয় এবং ৪ জনকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়।

(৩) ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঝাড়গ্রাম নুননুনিগেড়িয়াতে ২ জনকে হত্যা করা হয়।

(৪) ১৯৮২ সালে মার্চ মাসে শাকপাড়া গ্রাম একজন লোধাকে মেরে ফেলা হয়।

(৫) সরো, বাসঝানপা এবং চাকুয়া গ্রামে ১৯৮২ সালের জুন মাসে ৬ জন লোধাকে হত্যা করা হয়।

এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কোন রাজনৈতিক দল প্রতিবাদ জানায়নি। কোন একটি ক্ষেত্রেও হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান করা হয়নি। লোধারা লোধা হবার জন্যই আমরা, পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরা, তাদের হত্যা করি অথচ হরিজন হত্যা ইত্যাদির জন্য পাশের রাজ্যগুলোর সমালোচনা করে থাকি। লোধারা কি শুধুই অপরাধী! হত্যা এবং লুঠতরাজ আজ পশ্চিমবঙ্গে একটি নিয়মিত ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গের সব জেলায় লোধাদের বসবাস নেই। তাহলে শুধুমাত্র লোধাদেরই কেন দোষী সাব্যস্ত করা হয়? লুঠতরাজ বা অন্যান্য অপরাধ যদি আজকে লোধাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে তাহলে তারা আজও এত গরিব কেন? এ কাহিনী বড় জটিল। এ কথা গ্রামবাসীরাও স্বীকার করে যে চুরি বা ডাকাতির জন্য শুধুমাত্র লোধাদেরই প্রকৃত দোষী বলে মনে করা উচিত নয়। অথচ আশ্চর্যের কথা যে এরা নিজেরাও লোধা হত্যায় অংশ নেয়। জেলা প্রশাসন অথবা কলকাতার উচ্চপদস্থ বিভাগগুলি

এই সমস্যার কথা ভাল করে ভেবে দেখেননি এবং সমাধানের কোন চেষ্টাও করেননি। লোধা হত্যা হবার পরে সেই জায়গায় একটা অস্থায়ী পুলিশ ছাউনি পড়ে। শোকগ্রস্ত পরিবারকে কিছু সাহায্য করা হয়। তারপর সবাই সে ঘটনা ভুলে যায় যতদিন না আবার কোন লোধা হত্যার ঘটনা ঘটছে। আমি শুধুমাত্র হত্যার ঘটনা উল্লেখ করেছি। উন্মত্ত জনতার দ্বারা যে সমস্ত লোধারা অন্ধ, পঙ্গু ও নিপীড়িত হচ্ছে, তাদের কথা আমি উল্লেখ করিনি।

আমি একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি যে অন্যরা সবসময় লোধাদের সম্পর্কে কথা বলে। আমার সামান্য জ্ঞানবুদ্ধি ও সচেতনতা থেকে মনে হয়েছে যে লোধাদের কথা লোধাদের নিজেদের মুখ থেকে বলতে দিলেই সবথেকে ভাল হয়। আমার লোধাদের দেখে মনে হয়েছে তারা বুদ্ধিমান এবং সচেতন হবার ফলে নিজেদের কথা বলতে পারবে। যখন আমি জানতে পারলাম যে তারা এক সময় লোধাশবর উন্নয়ন সংস্থা তৈরী করে রেজিষ্ট্রি পর্যন্ত করিয়েছিল। আমি তাদের সেই সংস্থা পুনরুজ্জীবিত করার জন্য উদ্যোগ নিতে বললাম।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এই সংখ্যালঘু আদিবাসীদের জন্য যে নীতি নিয়েছেন, তাঁদেরকে হাততোলা করে রেখে দেবার সে নীতি একেবারে ভুল। এ নীতি হল, "আমরা যতটুকু দেব, তোমরা ততটুকু হাত পেতে নেবে।" ওদের জন্যে যেসব প্রকল্প ওদেরকে তা রূপায়ণে কাজ করতে দিতে হবে। লোধা, বিরহড়, খেড়িয়া, পাহাড়িয়া, এদেরকে যদি বিশ্বাস করা না হয়, কোনো দায়িত্ব দেয়া না হয় তারা কেমন করে আত্মবিশ্বাস পাবে, দায়িত্ববান হবে? তার ভালোর জন্যে যেসব প্রকল্প রচনা করা হচ্ছে, সেই কাজেও তার বুদ্ধি নিতে হবে। সাধারণত এসব প্রকল্প তাঁরাই রচনা করেন যাঁরা জানেন না, বা জানার দরকারও বোধ করেন না যে আদিবাসী বাস্তবিক কি চায়, কি তার প্রয়োজন। বাঁধা নিয়মে প্রকল্প রচিত হয়, তারপর সেটি ঠিকাদারের হাতে তুলে দেয়া হয়। আদিবাসীদের জন্য গৃহীত স্কীম থেকে ফায়দা কে তোলে তা পাঠকরা ভালোই বুঝবেন। লোধাকে কেন জিগ্যেস করা হয় না, কিসে তার অভাব মিটবে, কি তার প্রয়োজন? কেন স্বল্প ব্যয়ে রূপায়ণযোগ্য ছোট ছোট স্কীম তৈরি করা হয় না? স্কীম রূপায়ণকালে তো মজুর চাই। লোধাদের দিয়ে ছোট ছোট শ্রমিক-সমবায় তৈরী করিয়ে তাদের দিয়ে কাজগুলি কেন করানো হয় না? শিক্ষাপ্রাপ্ত লোধারা এমন সব সমবায়ের সাহায্যে নিরক্ষর লোধা মজুর দিয়ে স্কীমগুলি রূপায়িত করতে যথেষ্ট পারেন। লোধাদের জন্যে ঠিকাদাররা যেসব ঘরদোর করেছেন, সে আমি দেখেছি। তেমন ঘরের চেয়ে বড়সড় মাটির ঘর অনেক ভালো। যেই ঠিক হল যে পাকা ঘর তৈরি হবে, সেই সিমেণ্ট, ইট ও বালির সঙ্গে সঙ্গে ঠিকাদার মঞ্চে প্রবেশ করবেই করবে।

এতে লাভবান হয় কে?

লোধারা তো কখনোই নয়। তিন দশকের বেশি সময় ধরে লোধার নামে বিশাল

অঙ্কে টাকা খরচ হচ্ছে তো হচ্ছেই, আর লোধারা দারিদ্র্যসীমার তল থেকে অতলে নামছে তো নামছেই। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন ডোম ও লোধাদের জন্য ঝাড়গ্রাম মহকুমায় সত্যডিহি, পিতলকাঁটি ও পোরিহাটিতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে দুই সারি অতি পলকা কুঁড়ে ঘর তৈরি হয়। তা দেখে মুখ্যমন্ত্রী বিরক্ত হন, ঘটনাটির সঙ্গে যাঁরা জড়িত, তাঁরা সবাই এমন ভাব দেখান, যে পর্বতের মূষিক প্রসব দেখে তাঁরা বড়ই বেদনাহত। ব্যস, ওই পর্যন্তই। সমাজের নিম্ন স্তরের গরিবদের জন্যে রচিত স্কীম নিয়ে এদেশে যার যা ইচ্ছে তাই করে বেরিয়ে যেতে পারে। ১৯৮২ সালে রাজ্য সরকারের জনৈক কর্তাব্যক্তিকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম, "লোধাদের বক্তব্য ওদের ডেকে শুনুন, ওরা যেসব ছোট ছোট স্কীম করবে, সামান্য খরচে সেগুলি ওরাই রূপায়িত করবে।" তিনি আমার কথা তবু শুনলেন, কিন্তু আরেক উচ্চ ক্ষমতাশীল স্পষ্টই বললেন, লোধারা চোর ডাকাত। ওদের হাতে পয়সা দিয়ে বিশ্বাস করা যায় না।

আমি তাঁকে জবাব দিই যে লোধার জন্যে বরাদ্দ টাকা মারছে ধূর্ত ঠিকাদাররা এবং এ কাজে তাদের সাহায্য করছে সরকারী কর্মচারীরা, পঞ্চায়েত এবং রাজনীতিক দলের লোকেরা। (লোধাদের বিষয়ে এমন সব চিঠিরই কপি আমি রেখে দিয়েছি)। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের নিয়মানুসারে প্রতিটি লোধা বসতি ও গ্রাম আই টি. ডি. পি. স্কীমের আওতাভুক্ত। এই বহুল প্রচারিত ও মহানকীর্তিত আই. টি. ডি. পি. ব্যাপারটি বাস্তবে সমস্যা সমাধানে সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়েছে, কেননা বাস্তবিক লোধারা তো কিছুই পায় না। কিন্তু লোধারা তো প্রাণে বেঁচে থাকার জন্যে মরিয়া, তাই, তারা এসব স্কীম চায়। স্কীম লোধার দোরগোড়া অবধি পেঁছয় না, কেননা সেগুলিকে কার্যকর করাই হয় না। এখন লোধারা নিজেরাই যে-যার গ্রাম সমীক্ষার কাজে নেমেছে এবং আমাকে তাদের রিপোর্টগুলি পাঠাচ্ছে। আমি একটি রিপোর্টের কথা বলি।

গ্রামের নাম মাধবপুর। থানা ও ব্লক নারায়ণগড়। লোধা পরিবার বত্রিশ (৩২)। জনসংখ্যা নিরানব্বই (৯৯)। সম্পূর্ণ ভূমিহীন বারোটি পরিবার। সতেরোটি পরিবার খাস জমি পেয়েছে। স্কুলে যায় তেইশটি ছেলেমেয়ে। স্কুল থেকে ওরা বই, টিফিন, জামাকাপড়, স্লেট, কিছুই পায় না। সতেরোটি পরিবার পিছু মাসিক আয় ত্রিশ (৩০) টাকা ; বারোটি পরিবার পিছু মাসিক আয় ষাট (৬০) টাকা। একটি পরিবারের মাসিক আয় কুড়ি (২০) টাকা, একটির একশো পঁচিশ (১২৫), একটি পরিবারের দুজনই বেকার, কোনো আয় নেই। যখন পরিবারে মানুষ ছয়জন, এবং পরিবারের আয় মাসে ষাট (৬০) টাকা, তখন এটাই তো স্বাভাবিক যে লোধা শিশু সাত বছর বয়স হলেই ছাগল গরু চরাবে বা অন্য কাজ করবে, স্কুলে সে যাবে না। যদিবা কোনো লোধা শিশু স্কুলে যায়, সাধারণত অন্য জাতির শিক্ষকরা তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন, বিদ্রূপও করেন। কতবার

আমাকে লোধা ঘরের জননীরা বলেছে, আমাদের গ্রামের স্কুলে সাঁওতাল বা লোধা শিক্ষক পাঠাও। উঁচুজাতের মাষ্টাররা আমাকে ছেলেদের ঘেন্না করে। তারা আমাদের ছেলেদের দিয়ে বাগানের কাজ করায়, জল টানায়।

সত্যি বলতে কি লেঙ্গামারা গ্রামে গিয়ে আমি মর্মাহত হয়েছিলাম। সেখানে গরিব বাপ-মা লোধা ছেলেমেয়েদের আর স্কুলে পাঠায় না। কেননা চার বছর যাওয়ার পরেও তাদের ছেলেমেয়েদের বর্ণপরিচয়টাও সঠিকভাবে হয়নি। এটা একটা তিক্ত এবং অপ্রিয় সত্য যে, এই রাজ্যেও, বিশেষ করে আদিম এলাকায়, শিক্ষক যখন আদিবাসী নন, তখন গরিব আদিবাসী ছেলে পড়তে এলে, তিনি ব্যাপারটা পছন্দ করেন না। পশ্চিমবঙ্গে এটাও ঘটনা, যে আদিবাসী এলাকায় দেখা যাবে শিক্ষা ও যোগ্যতাসম্পন্ন আদিবাসী ছেলেমেয়ে বেকার আছেন, প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকরা অন্যজাতির। পশ্চাৎপদ গরিবতম জেলা পুরুলিয়ার বান্দোয়ান ও অন্যান্য আদিবাসী ব্লকে বহু স্কুল শুধু নামেই আছে। শিক্ষকও আসে না, স্কুলও চলে না।

শাঁখারিডাঙ্গা ও মাধবপুর হল লোধা গ্রাম বলতে যা বোঝায়, তার মধ্যে দুটি। সরকারী নিয়মে তো লোধা হলেই সে স্কীম সাহায্য পাবে। কিন্তু বাস্তবে, লোধার কোনো অধিকারই নেই। সুধীর নায়েক আর সুরেন প্রামাণিক নামে দুটি লোধা ছেলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অবধি পড়তে পারে, জামসল ও লখিয়াসলে দুটি নৈশ বিদ্যালয় চালাতে পারে, কিন্তু যেই দুটি স্কুলে শিক্ষক পদ মঞ্জুর হল, সেই অন্যজাতের শিক্ষক বহাল হলেন। বরোচাটি-জামসল গ্রামে সমবেত চেষ্টায় লোধারা মাছ চাষের জন্যে একটি পুকুর কিনতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন, কেননা মালিক লোধাদেরকে বেচবেন না। এই পুকুরটি লোধাদের জল, মাছ জোগাতে পারে। এর চার পাড়ে তাঁরা সবজি আবাদও করতে পারেন। লোধাদের দাবী, সরকার পুকুরটি কিনে দিন, ওরা মৎস্যচাষী সমবায় করে মাছ চাষ করবে। মালিক নারাজ।

পশ্চিমবঙ্গে লোধাদের অবস্থাটা যে কি, তা বোঝা যাবে লোধা হত্যার পিছনে "কেন" এবং "কেমন করে" এ ব্যাপারগুলি তলিয়ে দেখলে। ১৯৮২ সালের জানুয়ারিতে নারায়ণগড় থানার গনুয়া গ্রামে, চোর সন্দেহে ছয়জন লোধাকে হত্যা করা হয়, চারজনকে পঙ্গু করে দেয়া হয়। নিহতদের মধ্যে কয়েকজনকে জীয়ন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

ঊর্ধ্বসীমার বাইরে যে জমি, রাজ্য সরকার কি বৃহৎ জমিমালিকদের সে জমি হস্তান্তরে বাধ্য করতে পেরেছেন? এ প্রশ্নের জবাব মেলা বড়ো কঠিন। তবে কোথাও কোথাও লোধা ও অন্যান্য গরিবরা কিছু কিছু যৎসামান্য ভেস্ট জমি পেয়েছেন। যাঁর জমি, সেই ক্রুদ্ধ জোতদারটি অন্য ভূমিহীন গরিবদের উসকানি দিয়ে ধান কাটার সময়ে লোধাদের উপর লেলিয়ে দিয়েছেন। নয়াগ্রাম থানাতেই ১৯৭৯ সালে

ঘটে লজ্জাকর পাতিনা লোধা হত্যা। ওখানকার পুরনো ইতিহাস ঘাটলে জানা যাবে যে একসময়ে ওখানে ধনী জমিমালিকরা বহু জায়গায় ব্যাপক হারে সাঁওতাল ভাগচাষী উচ্ছেদ করে লোধাদের ভাগে জমি দেন। তাঁরা জানতেন যে সাঁওতালরা সংখ্যায় অনেক, তারা যেমন ঐক্যবদ্ধ তেমন লড়াকু। ভাগচাষী হিসেবে জমিতে স্বত্ব পাবার ব্যাপারটি আইন হয়ে গেলে ওদের সরানো সহজ হবে না। লোধাদের জমি দেবার সুবিধে হল, ওরা নিঃস্ব কাঙাল। জমিতে ভাগস্বত্ব দাবী করবার সাহস ওদের হবে না এবং যৎসামান্য ফসল বা মজুরি দিয়ে ওদের চোখ রাঙিয়ে কাজ করানো যাবে। ফল লোধাদের সঙ্গে সাঁওতালসহ অন্যদের মধ্যে একটা বিদ্বেষের বীজ বোনা গেল। আবার ওই অঞ্চলের চোরাই মালের ক্রেতা ও ব্যবসায়ীরা একদিকে লোধাদের একাংশকে অপরাধকর্মে নিযুক্ত রাখল, অন্যদিকে "লোধা জাতটাই চোর" এমন মনোভাবও জনজীবনে জাগিয়ে দেয়া গেল। ১৯৭৯ সালে পাতিনায় লোধারা চোরাই মাল ক্রেতাদের কাছে আশ্রয় নিতেই ছুটে এসেছিল।

১৯৮২ সালে কেশিয়াড়ি থানার খেজুরকুটি-পারিজাতপুর গ্রামে লোধারা যখন সরকারের কাছে প্রাপ্ত জমির ধান কাটতে যায়, তখন জমির প্রাক্তন মালিকরা গরিব কোরা আদিবাসীদের লোধাদের উপর লেলিয়ে দেয়। ফলে একজন লোধা নিহত হয়, বেশ কিছু জন জখম হয়। ১৯৮২ সালের জুলাই মাসে ঝাড়গ্রাম থানার অন্তর্গত সরো, বাঘঝাঁপা ও চাকুয়া গ্রামে হিংস্র জনতার আক্রমণে ছয়জন লোধা নিহত হয়। এর পিছনে যে কাহিনী জানা যায়, তা চমকপ্রদ। প্রকৃত ব্যাপার ছিল নিকটবর্তী চন্দ্রী গ্রামের ধনী জমিমালিকদের জমি অধিগ্রহণ করে কিছু লোধাকে জমি দান। ওই অঞ্চলের সকল গরিবই কমবেশি ওই গ্রামের ধনীদের ওপর নির্ভরশীল। ওই হত্যাকাণ্ডের প্রধান নায়ক যিনি, তিনি কিছু লোধাকে দিয়ে চুরিডাকাতি করিয়ে মাল কিনতেন। ইনি লোধাদের শিক্ষা দিতে চান, একই সঙ্গে শিক্ষা দিতে চান তাঁর এক পরিত্যক্তা রক্ষিতা প্রৌঢ়াকে, যে নাকি বেজায় গোলমাল করছিল। এঁর বেতনভোগী কিছু লোক জঙ্গলে মেয়েটির উপর অত্যাচার করে। একদিন কেটে যায়। তারপর এঁর নায়কত্বে প্রচার হয় যে লোধারা শুধু চুরি করে ক্ষান্ত নয়, মেয়েটিকে তারাই ধর্ষণ করেছে। ইনিই জিগির তুলে এক হিংস্র জনতা নিয়ে এসে লোধাদের কাটেন। সমগ্র ব্যাপারটি প্রকাশ পায় তাঁরই বেতনভোগী একজনের মুখ থেকে। প্রকাশ পায়নি এক নির্মম সত্যও। জানা যায়, যে হতভাগিনী প্রৌঢ়াটি আদপে ধর্ষিতাই হয়নি। আমি যখন যাই, তখন ঝাড়গ্রামে আপামর জনসাধারণ বলেছিল, লোধারা ধর্ষণ করেছে, এ তারা বিশ্বাস করে না। সরো, বাঘঝাঁপা ও চাকুয়াতে যা দেখেছি, যা শুনেছি তা আর নাইবা বললাম।

একটিবারও কোনো রাজনীতিক দল লোধা হত্যার প্রতিবাদ করেনি। কখনো সততা ও আন্তরিকতায় সাঁওতালদের কেউ বোঝায়নি, যে লোধা তার শত্রু নয়। শত্রু হল চোরাই মালের ব্যবসায়ীরা, ধনী জমিমালিকরা, যারা গরিবে গরিবে লড়িয়ে

দিয়ে ফায়দা ওঠায়। সাঁওতালদের আজ এই রূঢ় সত্য বুঝতে হবে, যে শুধু সাঁওতাল নয়, সমগ্র আদিবাসী সমাজের অস্তিত্বই আজ বিপন্ন। সংখ্যালঘু আদিবাসীদের উপর ক্রুদ্ধ হওয়া মানে অন্যের ঘরে লাভের ফসল তুলে দেয়া। আদিবাসী সমাজে যত অনৈক্য থাকবে, কায়েমি স্বার্থের ততই ভালো হবে। সংখ্যাগুরু সাঁওতাল, ওরাওঁ এবং মুণ্ডা জাতির কর্তব্য, সংখ্যালঘু লোধা, খেড়িয়া, বিরহড়, পাহাড়িয়া, কোরা, মাহালি, এদেরকে ভরসা দিয়ে কাছে এনে আদিবাসী ঐক্য গঠন করা। লোধা যদি সাঁওতাল ঘরে চুরি করে, সাঁওতাল যদি লোধাকে কাটে, তা থেকে যে লাভবান হয়, সে কিন্তু আদিবাসী নয়। আদিবাসী অনৈক্য তার স্বার্থকেই পুষ্ট করে।

লোধা সমস্যার সমাধান কি? লোধারা নিজেরা সে বিষয়ে কি বলছে, তা আমি পরবর্তী অংশে বলব। তবে বহু ব্যয়সাধ্য বৃহৎ পরিকল্পনা দিয়ে সমাধান আসবে না। শুনেছি যে লোধা নিয়ে অনেক চিন্তা করে রাজ্য সরকার নাকি ঝাড়গ্রামের কাছে বৃন্দাবনপুরে একটি বাঁজা, কাঁকুরে, জলহীন জমিতে কয়েকটি লোধা পরিবারকে বসত করাতে চান। ওই রুক্ষ প্রান্তরে নাকি কাজু বাদামের চাষ হবে। এ কথা যদি সত্য হয় তবে সেটা হবে সরকারী অর্থের অপচয়। এমন প্রকল্পের জন্য ধার্য টাকা দিয়ে নিশ্চয় অন্য কাজ করা যায়। কাজু চাষ লাভজনক হতে পারে, কিন্তু যতদিন না গাছ বড় হচ্ছে, ফল দিচ্ছে, ততদিন লোধারা খাবে কি? অল্প টাকার ছোট স্কীমই ছোট ছোট আদিবাসী গোষ্ঠীর পক্ষে ভালো। অজস্র টাকার বৃহৎ প্রকল্প করতে যাওয়া অবাস্তব।

পুরুলিয়াতে সংখ্যালঘু খেড়িয়াশবররা জেলা বিজ্ঞানকেন্দ্রের সহায়তায় ছোট ছোট স্কীম নিজেরা কেমন উদ্যোগে রূপায়িত করছে, তা তো আমি দেখছি। পুরুলিয়া জেলা বিজ্ঞানকেন্দ্র এমন সব প্রকল্প সংখ্যাল্প বিরহড় ও পাহাড়িয়াদের জন্যও তৈরি করেছেন। লোধারা তুলনায় খেড়িয়াদের চেয়ে এগিয়ে আছে। বৃহত্তর জনসমাজের পাশাপাশি শতাধিক কাল বসবাস করছে বলে লোধারা বর্তমান রূঢ় বাস্তবকে মেনে নিতে শিখেছে। লোধা জানে যে আজ আর অরণ্যজননী তাকে বাঁচাবে না, কেননা অরণ্য নেই। সে এ কথাও জানে যে মাছ ধরে, চাষ করে, ছাগল পালন করে সে আজও বেঁচে থাকতে সক্ষম। দুঃখের কথা হল, লোধা যা জানে, সে কথা তার মুখ থেকে কেউ শুনতে চায় না। লোধা যেহেতু আদিবাসী, সেহেতু তাকে করুণার দানের জন্যে হাত পেতেই থাকতে হবে। পণ্ডিতরাই প্রকল্প রচনা করবেন এবং ঠিকাদাররাই কাজগুলি করবে।

এই নৈরাশ্যজনক চিত্র এবং মাঝে মাঝে লোধা হত্যা, এতকাল ধরে এই ছিল লোধা কাহিনী। কিন্তু লোধারা নিজেরাই লোধা কাহিনীটি নতুন করে লিখতে চায়। আজ লোধা জাতির অস্তিত্ব থাকবে, না মুছে যাবে, তা প্রধানত নির্ভর করছে লোধাদের উপর, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী জাতিগুলির শুভবুদ্ধি ও সহযোগিতার উপর।

২.

লোধারা মনে করে তাদের জাতির আদি পিতা ও আদি জননী হলেন মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত শবররাজা কালকেতু ও তাঁর পত্নী ফুল্লরা। ষোড়শ শতকের মহান কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে ব্যাধখণ্ডে কালকেতু কাহিনী গভীর মমতায় লিখেছেন। কিন্তু এটাও বুঝে দেখতে হবে যে এর উপাদান তিনি সেদিনের জঙ্গল ঢাকা রাঢ় দেশের লোকবৃত্ত থেকেই পেয়ে থাকবেন।

লোধাদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীটি সামান্য অন্য রকম। অরণ্যমাতৃকা, উর্বরতাদায়িনী দেবী অরণ্যচণ্ডীর আশীর্বাদে ব্যাধ কালকেতু রাজা হলেন। কিন্তু ধূর্ত ও কৌশলী বহিরাগতদের কূট চক্রান্তে কালকেতু রাজ্য খোয়ালেন, শবররা আবার গরিব হয়ে পড়ল। কিন্তু অরণ্যমাতৃকা শবরদের শরণচ্যুত করলেন না। তাদের জন্য রইল বনের পশুপাখি, পাতা, ফল, ফুল, কাঠ, কন্দ, মূল, মধু, ধুনা, ওষধিলতা, গাছ। যে সকল লৌকিক দেবদেবী গাছপালা ও পশুপাখিকে রক্ষা করেন ও হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হতে শবরদের বাঁচান, তাঁদের পূজা করেন লোধারা। অনেক মন্দিরে দেখা যাবে লোধাই পুরোহিত, এবং সকল জাতির মানুষ দেবতার আশীর্বাদ কামনা করে লোধার হাত দিয়ে পূজা দেয়াচ্ছেন। বম্বে রোডে গুপ্তমণিতে বড়াম মায়ের মন্দিরটি অতি বিখ্যাত। ওই পথের সব যানবাহন দেবীর ভরসা করে পথ চলে। স্থানীয় লোক বিশ্বাস করেন, যে ড্রাইভার গাড়ি, বাস বা লরির গতি কমিয়ে মন্দিরে প্রণামী ছুঁড়ে দিতে ভুলে যাবেন, তিনি দুর্ঘটনায় পড়বেন। লোধারা ব্রাহ্মণদের মানেন না। লোধাশবররা মনে করেন, জগন্নাথ বিগ্রহ একদিন লোধাদের কাছেই পূজা পেতেন। ধূর্ত ব্রাহ্মণ সুকৌশলে শবর পুরোহিতের সুন্দরী যুবতী কন্যার মন জয় করল। তারপর বিগ্রহ চুরি করে অরণ্যশবরীকে বিয়ে করে পালিয়ে গেল। লোধারা আজও ব্রাহ্মণকে প্রণাম করেন না। লোধা জাতি ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব উপেক্ষা করে চলে, সেজন্যও উচ্চ জাতির গ্রামীণ মানুষ লোধাদের বিষয়ে এতটা উগ্র কি না, তা ভাববার কথা।

ব্রাহ্মণরা জগন্নাথকে না হয় "চুরি" করে নিয়ে যায়। একজন মহাক্রোধী লৌকিক দেবতা রাঙাহাড়ি-বিষয়চণ্ডী নাকি স্বেচ্ছায় সাঁওতাল পুরোহিতকে ছেড়ে লোধা পুরোহিতের কাছে চলে আসেন। লোধারা বলেন, এ ঘটনা ঘটেছিল নয়াগ্রাম থানার জামসল গ্রামে। চরকা সাঁওতাল যথেষ্ট যত্নে রাঙাহাড়িকে পূজা করতেন, কিন্তু কোনো কারণে তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে দেবতা বেছে নিলেন রায়া ভক্তা নামক লোধাকে। এ দেবতা যখন ক্ষেপে যান, তখন তিনি "গিয়ান" নামে এক পিশাচের রূপ ধরেন এবং লোধার শরীরে ঢুকে তার কলিজা ফাটিয়ে রক্ত চুষে খেয়ে নেন বলে লোধাদের অনেকের বিশ্বাস। তবে অন্য অর্থে এই রক্তপিপাসু গিয়ান তো লোধা জীবনে এক বাস্তব সত্য। লোধার জীবনের উপর হুমকি তো থাকেই, কখনো গোপনে, কখনো প্রকাশ্যে।

গত বছর কাপাসগোড়িয়া গ্রামের এক যুবক লখিয়াসল গ্রামের এক লোধা যুবতীকে ধর্ষণ করে। লখিয়াসলের লোধারা স্থানীয় রাজনীতিক নেতার কাছে গিয়ে বিচার চাইল। নেতা অপরাধী যুবককে আটশো পঁচিশ টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দিলেন, কেননা সে লোধা মেয়েটিকে বিয়ে করল না। লোধারা এমন বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে পরে রাজনীতিক নেতা ক্ষেপে গেলেন। লোধারা পঞ্চায়েত থেকে আর কাজ পায় না, রেশনে পায় না কেরোসিন। লোধারা সমবেত হয়ে সিদ্ধান্তে এল যে সমগ্র ব্যাপারটির জন্যে একা মেয়েটিকে দোষী করা অন্যায়, সে কথা তারা মেয়ের বাবাকেও জানাল। ব্যাপারটাকে ওই নেতা তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য হুমকি বলে ধরে নিলেন। অতএব ক্রুদ্ধ নেতা একদল সশস্ত্র আদিবাসী নিয়ে লোধাদের ভয় দেখাতে এলেন এবং ওদের পাঁচশো (৫০০) টাকা জরিমানা করলেন। সন্ত্রস্ত মৃত্যুভয়ে ভীত লোধারা এই মানুষ গিয়ানকে তিনশো (৩০০) টাকা দিয়ে শান্ত করল। ফলে ওদের যার যা ছিল, বেচতে হল। এক হতভাগ্য লোধার একমাত্র গর্বের জিনিস এক পুরনো সাইকেল, তাও নামমাত্র টাকায় বাঁধা দিতে হল।

এরপরেও কথা থাকে। কতবার কত লোধা আমাকে বলেছে যে বর্তমান রাজ্যসরকার ক্ষমতায় আসার পর পুলিশী হানা ও নির্যাতন খানিক কমেছে। আগে মার খাবার ও ধরা পড়ার ভয়ে চাষী মজুর লোধা পুরুষরাও জঙ্গলে ঘুমাত। এখন তারা রাতে বাড়িতে থাকতে পারছে। পুলিশের ক্ষেত্রে "ধর লোধাকে, মার লোধাকে' একটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আমি মনে করি না এ চিত্র খুব একটা পালটেছে। ঝাড়গ্রাম মহকুমায় অপ্রীতিকর বা অপরাধমূলক কিছু ঘটলে প্রথমেই সন্দেহ পড়ে লোধার উপরে। একটি নিন্দনীয় ঘটনার কথা বলি। আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর গাড়িটি কে বা কাহারা পথে অবরোধ করেছিল। পরদিনই খবর বেরোল যে এ জন্য তেরজন (১৩) লোধাকে ধরা হয়েছে। ওই পথটি চুরি, ছিনতাই ও সশস্ত্র ডাকাতির নিত্য দর্শক। ব্যাপারটা আইন শৃঙ্খলার অভাব। এটা লোধাদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ নয়, তারা যেমন বলেছে, তেমন লিখছি। অপরাধ কর্মে নিযুক্ত লোধারা চুরি, ডাকাতি করে, তবে তা ছোট মাপের, আজ অবধি তারা তেমন অপরাধ করেনি, যার জন্য ঠাণ্ডা মাথা, পরামর্শ, সংগঠন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি লাগে। লোধা জাতির স্বভাব-বৈশিষ্ট্য হল ওরা লাজুক, ভিতরচাপা, বাইরের জগত বিষয়ে বড় ভীত সন্ত্রস্ত।

যখন সে নিজ সমাজের উন্নতির জন্য কাজ করে, তখনো লোধা নিরাপদ নয়। ১৯৮৩-র ২১শে মার্চ চারটি লোধা ছেলে প্রহ্লাদ ভুক্তার বাড়ি যাচ্ছিল লোধাশবর কল্যাণ সমিতি নিয়ে কথা বলতে। ওদের একজন ছিল মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির খেতমজুর ইউনিয়নের সেক্রেটারি। সে সময়েই ঘটনাক্রমে কাছাকাছি কোনো গ্রামে চুরি হয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশজন লোক এই চারটি ছেলেকে ধরে, তাদেরকে কৃষকসভার

সেক্রেটারির কাছে নিয়ে যায় এবং তাদের বাড়ি তল্লাসী করা হয়। তল্লাসীর ব্যাপারটি লোধাদের কাছে খুবই অপমানজনক মনে হয়। লোধা মেয়েরা তীর ধনুক হাতে প্রতিবাদ করতে বেরিয়ে আসে। তা দেখে কৃষকসভা সেক্রেটারি এবং অন্যেরা পালান। তারপর দুই গ্রামের কৃষকসভার দুই সেক্রেটারি এক মিটিং ডাকেন, (ক) তাঁদের দলভুক্ত লোধাদের পার্টিবিরোধী আচরণের জন্যে অভিযুক্ত করেন; (খ) খেতমজুর ইউনিয়নের লোধা সেক্রেটারিকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেন; (গ) বলেন, যে কোথাও আশেপাশে চুরি হলেই লোধা ঘরে তল্লাসী হবে, সেজন্য কোনো কারণ দর্শানো হবে না।

আজ লোধারা বহুলাংশে ক্ষমতাসীন বৃহত্তম দলের সমর্থক হতে পারে। কিন্তু গ্রামে যাঁরা এই দলের প্রতিনিধি, তেমন অনেক ভদ্রলোক বাবু এখনো সুযোগ পেলেই লোধাকে বুঝিয়ে দেন, লোধা যেন ভুলে না যায় যে তারা অপরাধপ্রবণ জাতি। আজ তারা সরকারী রেকর্ডে "বিমুক্ত জাতি" বলে উল্লেখিত হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে তারা যেমন ব্যবহার পায় তা এমন অবমাননাকর ও অমানবিক, যে সরকারী ঘোষণাটির কোনো মানে হয় না। গিয়ান, লোধার রক্তপিপাসু গিয়ান, সে যে শতরূপে ফেরে।

গ্রামের প্রভাবশালী চোরাইমাল কারবারীরাই হচ্ছেন ভীষণতম গিয়ান। এরা সব সময়ে লোধাদের পিছনে লেগে থাকে। লোধা যদি চুরি করতে নারাজ হয়, এরা ওদের পুলিশ ও গণপ্রহারের ভয় দেখায়। লোধা জেলে গেলে কখনো উকিল দিয়ে, কখনো দুঃস্থ পরিবারকে কিছু সাহায্য করে এরা বুঝিয়ে দেয় যে আপৎকালে আমি ছাড়া তোর কেউ নেই।

শুনেছি যে নয়াগ্রাম থানার পাতিনা, ফুলবনি, চামারবাঁধ এসব গ্রামে চোরাইমাল রিসিভার কিছু আছেন। সিংধুই এবং অন্যান্য গ্রামের লোকেরা মারমুখী জনতার হাত থেকে বাঁচার জন্যে পাতিনাতেই দৌড়েছিল। কিন্তু ১৯৭৯ সালের সেই রক্তাক্ত দিনে (নিহত আঠারো) লোধাদের চোরাইমালের ধনী রিসিভাররা এদেরকে আশ্রয় দেয়নি।

লোধাদের এবং আদিবাসীদের আবাসিক ব্যবস্থা বা হস্টেলেরই বা চেহারা কেমন? ডেবরা থানার চকসাহাপুর হস্টেলে সতেরোটি লোধা ছেলে এবং তিনটি সাঁওতাল ছেলে থাকত। সুপার নিরঞ্জন ভক্তা জানিয়েছিলেন যে ঘরটি 'জীর্ণ', বর্ষাকালে দেয়ালের ফাটলে সাপ ঘোরে। একবার রাতে একটি বালককে সাপে কামড়েছিল। সে বহু প্রার্থনা করেছে, পঞ্চায়েতের লোকজন ও অন্যান্য অফিসাররা বহু পরিদর্শন করেছেন, কোনো সুরাহা হয়নি। অবশ্য গ্রামে গ্রামে আদিবাসী হস্টেলের অবস্থা এমনই, কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে।

তবু, লোধা ও অন্য গরিব প্রাথমিক শিক্ষার্থীর পক্ষে হস্টেল ব্যবস্থা হলেই তবেই

ওরা স্কুলে যেতে পারবে। লোধা শিক্ষার্থীর নিজের ইচ্ছা থাকলেও পড়া চালানো বড় কঠিন। সরকারের ও সমাজের কাছে অবহেলা পেতে পেতে লোধা জাতি নিজের বিষয়েও নিরাশ ও উদাসীন হয়ে পড়েছে। হতাশার অন্ধকারে এ জাতি যেন ডুবে যাচ্ছে। একবার এক লোধা জননী আমাকে বলেছিল, তুমি কি ভরসা দিতে পারো যে আমার ছেলে বুড়ো হবে? তার আগেই কাটা পড়বে না?

আমি জবাব দিতে পারিনি। ১৯৮২ জুলাইয়ে সরো গ্রামে মীরু নামে একটি নিষ্পাপ, উজ্জ্বল তরুণ নিহত হয়। তার শাশুড়ি আমাকে বলল, রোজ সে এসে তার শ্বশুরকে হাসপাতালে নিত ইনজেকশান দেয়াতে। এমন দয়ামায়া যার, সে কেমন করে ধর্ষণের মতো ঘৃণ্য কাজ করতে পারে?

সত্যিই তো নানা সময়ে মীরু কত সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছে। লোধা নরনারী মীরুকে হারিয়ে কেঁদেছে। মীরু এবং আরেকজনের দুই কিশোরী বিধবাকে দেখেছিলাম। সরোর লোধা মেয়েরা সাহসী, তেজী ও স্পষ্টবক্তা। লোধা মেয়েরা দেখতেও ভালো। তারা বলেছিল, বুড়োমানুষকে অত্যাচার করবে কোন্ দুঃখে? লোধা বউরা কি যথেষ্ট আকর্ষণীয় নয়? ওরা এ কথাও বলেছিল, ছেলে স্কুলে পাঠাব কেন? যতদিন বাঁচে ঘরে রাখি, চোখে দেখি। একজন বলল, আমাদের ছেলেরা স্কুলে যায় না, তাতে তুমি কেন কষ্ট পাও? আমাদের ছেলেরা স্কুলে গেলে, সার্টিফিকেট পেলে, এক্সচেঞ্জে নাম লেখালেও তো চাকরি পায় না।

এসব নৈরাশ্যভরা কথাবার্তা থেকে রূঢ় বাস্তবটা জানা যায়। চাকরির ব্যাপারে অধিক পশ্চাৎপদ সংখ্যালঘিষ্ঠ আদিবাসী ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ বিবেচনা নেই, এটি দুঃখজনক। কোনো লোধা তরুণ মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পড়ল, এক্সচেঞ্জেও নাম লেখাল, কিন্তু ঝাড়গ্রাম / বেলদা / খড়্গপুর বা মেদিনীপুর এক্সচেঞ্জ থেকে সাত বছরেও ডাক পেল না। ফলে সে নিজে তো হতোদ্যম ও নিরাশ হল, আর অন্য লোধা ছেলেমেয়েও ওদের দেখে বুঝে গেল যে স্কুলে গেলেও লোধার কপাল ফেরে না। যেহেতু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোধারা খুবই কম, সেহেতু এদের চাকরি হতে পারত। "বর্তিকা / লোধাশবর ও সুন্দরবন" সংখ্যায় আমি শিক্ষাপ্রাপ্ত, এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো দুইশো চৌদ্দ (২১৪) লোধার নাম-ঠিকানা ছেপেছিলাম। এটা খুব বিস্ময়জনক যে, লোধাদেরকে জঙ্গলরক্ষী বা অন্যান্য চতুর্থ শ্রেণীর কাজও দেয়া হয় না। অষ্টমশ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত লোধা ছেলে-মেয়েদের লোধা অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষকের কাজই বা কেন দেওয়া হয় না?

কোনো কোনো লোধা এলাকা আবার বিশেষভাবে অবহেলিত। লালগড় ব্লকের সাত ও আট নম্বর অঞ্চল তার মধ্যে পড়বে। পাঁচটি গ্রামের মধ্যে একা লালু শবর চতুর্থ শ্রেণী অবধি পড়েছে, অন্যেরা নিরক্ষর। রাঙামাটি, তরকি ও করমসল গ্রাম-গুলির কোনটিতে প্রাথমিক স্কুল নেই। প্রতি গ্রামে মাত্র দুটি বা তিনটি পরিবারের

একটি করে বলদ ও একটি করে লাঙল আছে। অন্যেরা জঙ্গলে কাঠ কেটেই দিন চালায়। তবু সরকারের দিক থেকে কত ব্যবস্থা! ব্লক, পঞ্চায়েত, ছোট ছোট পঞ্চায়েত ইউনিট আছে। এগুলির এসব কাজ করার কথা। "লোধা" নামে টাকাও আছে। লোধাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এজন্য দরকার, যে তুলনায় অন্য আদিবাসী জাতি কোথাও বা লোধার চেয়েও গরিব হতে পারে। কিন্তু "অপরাধপ্রবণ" জাতি হিসেবে লোধা যে হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত, অন্য জাতি তেমন নয়। লোধাকে ভালবাসতে হবে, শ্রদ্ধা দেখাতে হবে, তাকে তিলে তিলে বোঝাতে হবে, যে সমাজে বাস করছ তুমিও তার এক অংশ। লোধা জাতিকে এতকাল সামাজিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা একটা নিষ্ঠুর সত্যই বুঝতে দিয়েছে যে লোধারা খরচের খাতায়। তারা মরলেও কারো কিছু এসে যায় না। গণহত্যা মাঝে মাঝে "খবর" হয়। আবার গনুয়া, খেজুরকুটি, নুননুনিগোড়িয়ার মতো কত লোধা হত্যা কাগজে ওঠে না।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ লোধাশবর সমিতি পুনর্জীবনলাভের পর থেকে লোধাদের এক নতুন ভুমিকায় দেখা যাচ্ছে। ভুমিহীন, প্রান্তিক চাষী, খেতমজুর, জঙ্গলের বেগার মজুর, এমন সব লোধারাই নিজেদের উন্নয়নে সচেষ্ট হয়েছে এবং সমিতির পাঁচটি শাখা খুলে ফেলেছে। ওরা ভালোই বোঝে যে সকল লোধা চাকরি বা চাষের জমি পাবে না। ওরা নিজেরা যা লিখে জানিয়েছে, আমি সেই কথাগুলিই তুলে দিচ্ছি।

(১) যেহেতু অনেক লোধা ছাগল পালে ও হাটে মাংস বা পাঁঠা বেচে, সেহেতু ব্লকে লোধাদের ছাগল দেবার যে স্কীম আছে, সেই মতে এইসব লোধাদেরকে ছাগল সরবরাহ করার ভার দেওয়া হোক। লোধা নীরোগ ও সবল ছাগলই বেচবে, কেন না সে জানে যে অন্যথা করলে প্রাপক তাকে ছেড়ে দেবে না।

(২) অনেক লোধা মাছ চাষ করে ও বেচে জীবন চালায়। লোধাদের বাঁজা পাথুরে জমি দেওয়ার বদলে পুকুর কেটে দিলে তারা মাছ চাষ করে বাঁচতে পারে।

লোধা খুব বোঝে, তার সাধ্য কি, কতটুকু সে করতে পারবে। যদি সুযোগ পায় তবে তা করে সে দেখিয়ে দেবে যে লোধা কাজ করতে পারে। স্বাভাবিক, প্রকৃতিজ জঙ্গল যত কাটা পড়ছে, যত ইউক্যালিপটাস বন সৃজিত হচ্ছে, শিকার, ফল-কন্দ-মূল-পাতা-বীজ-ধুনা-ওষধি গাছ আহরণ করে জীবনযাপনের ব্যাপারটা ততই হারিয়ে যাচ্ছে। লোধা মেয়েরা ইউক্যালিপটাসকে তুলনা করে শহরের নাইলন পরা মেমসায়েবমার্কা বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে, যারা গ্রামজীবনে বেমানান। যে গাছ গরিবকে ফল, পাতা, বীজ, কিছুই দেয় না, সে গাছ ওরা চায় না। লোধা-খেড়িয়ার একদিনের অরণ্যজীবী জীবন আজ স্বপ্নকথা মাত্র। বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই যেভাবে হোক, বেঁচে থাকার একটা পথ খুঁজতে লোধারা আজ মরিয়া।

নিরক্ষরতা এক অভিশাপ। ওরা নৈশবিদ্যালয় চালাচ্ছে। অপরাধকে জীবিকা করে তোলা ভুল। সে কথাই ওরা বোঝাচ্ছে।

কি চমৎকার, সাবলীল ওদের লেখা। প্রহ্লাদ ভুক্তা, যুগল কোটাল, প্রশান্ত আড়ি, চুনীরানী কোটাল, শঙ্কর কোটাল, তরুণ কোটাল, মন্মথ শবর, সুদাম বাগ, এমন অনেকেই চমৎকার লেখে। "বর্তিকা"য় প্রকাশিত চুনীরানীর আত্মকথা এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। তেমনি কৃতজ্ঞ "বর্তিকা" কঠোর পরিশ্রমী ললিতামোহন মাহাতর কাছে, যাঁর "অপরিচয়ের অন্ধকারে লোধা উপজাতি" এবং প্রহ্লাদ ভুক্তার অসম্পূর্ণ আত্মকথা লোধা জীবন সম্পর্কে বহু কথা জানিয়েছে।

লোধারা তাদের সমস্যা বিষয়ে আজ কি ভাবছে, তাও জানা দরকার। ওরা লেখে, "আমরা নিহত, পঙ্গু ও অন্ধ হতে আর রাজী নই, নিরন্তর সন্ত্রাসন ও ও উৎপীড়ন বন্ধ হোক। চিরকাল সমগ্র জাতিকে অপরাধপ্রবণ মনে করা হবে, এ আর চলবে না।" তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গবাসী সাধারণত মনে করেন, লোধা মাত্রই অপরাধপ্রবণ, শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চিন্তা করার কোন ক্ষমতাই তার নেই। আমি বরাবর বলছি যে লোধারা তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন, ভালোবাসবার মতো জাত, ওরাও প্রাণ ঢেলে ভালবাসা দিতে জানে। যেখানে পায়, সেখানে দেয়। আদিবাসী মাত্রেই মূলত যেসব গুণে বিশিষ্ট, সারল্য, শত বঞ্চনা সত্ত্বেও ভালোবাসবার ও বিশ্বাস করবার অপার ক্ষমতা,—সেসব গুণই লোধারও রয়েছে।

আমি মনে করি না অনেক টাকা লগ্নী করে বৃহৎ প্রকল্প করলে লোধার কোনো উন্নয়ন হবে। ওদের সবচেয়ে আগে দরকার ভালবাসা ও বিশ্বাস। তবে সরকারী কর্মচারীদেরকে তো "যাও, লোধাকে ভালবাসো" বলে হুকুম দিয়ে সে কাজ হবে না। তবে এটুকু তাঁরা পারেন, লোধাকে বোঝাতে পারেন, যে লোধাকে তাঁরা বিশ্বাস করেন। কেমন করে সে কাজ করবেন? তাকে দায়িত্ব দিন, উন্নয়নের জন্য পুকুর সে নিজে কাটুক, পথ তৈরী করুক, ঘর বেঁধে নিক, গাছ লাগাক। পুরুলিয়া দেখে এসেছি বলে আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছে যে এ কাজ করা খুবই সম্ভব। পুরুলিয়ার খেড়িয়া-শবররা (এদের বিষয়েও ললিতমোহন মাহাত "বর্তিকা"তে দীর্ঘ তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ লিখেছেন) লোধাদের মতই হতভাগ্য। জঙ্গল বিভাগ ও থানা এদেরকে সমানে তাড়ায়, ধরে, নির্যাতন করে, জেলে ঢোকায় ও ফেলে রাখে। তবে খেড়িয়া হত্যা সেখানে খুব হয় না। পুরুলিয়ার জনসমাজও অনেক সুস্থ মনোভাবসম্পন্ন। পুরুলিয়ার সাঁওতালরা নিজেরাও অবহেলিত, এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ খেড়িয়া, বিরহড়, পাহাড়িয়াদের প্রতি মমতাসম্পন্ন। জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র অফিসার অমলেন্দু রায় আক্ষরিক অর্থে বিজ্ঞানকে গ্রামীণ গরিবের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। এমনটি ভারতে কোথাও হয়নি। এই দুরন্ত খরার মধ্যেও তিনি খেড়িয়াদের দিয়ে গাড়াসাগমা গ্রামে কাঁচা কুয়া কাটিয়েছেন, তারা সবজি চাষ করছে। আমি তো দেখে এলাম যে মাত্র দশ / বারো ফুট কাটলেই জল উঠছে। রায় খেড়িয়া ও বিরহড়দের জন্যে

চমৎকার সব স্বল্পটাকাসাধ্য ছোট ছোট স্কীম করছেন। তাঁর লক্ষ্য হল, যার জন্য স্কীম, সে যেন তার মজুরি বাবদ সব টাকাটা পায় ও উন্নয়নের কাজ খেড়িয়ারা যেন নিজেরা করে।

পুরুলিয়াতে দেখা যাচ্ছে যে মাত্র একজন কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসার, দরদ ও বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে এগিয়েছেন বলে এমন সব বাস্তবসাধ্য স্কীম হয়েছে। মেদিনীপুরে লোধাদের পাশে এমন কোন অফিসার নেই, যিনি তাদের সঙ্গে কথা বলে স্কীম করবেন, কাজটা তাকে দিয়ে করাবেন। আবার লোধারা নিজেরাই গ্রামকে গ্রাম সমীক্ষা করে চমৎকার সব ছোট ছোট স্কীম করছে। একটু উৎসাহ, একটু সাহায্য, একটু নির্দেশ পেলে ওরা নিজেরাই এসব স্কীমকে রূপ দিতে পারে। ফল ও সবজি চাষ, মাছ ধরা, কুয়া কেটে ধান ও অন্য ফসল চাষ, ছাগল ভেড়া মুরগি পালন, এ ওরা বোঝে, করতেও পারে, যদি করতে দেওয়া হয়।

কিন্তু মেদিনীপুরে তো সেটি হবে না। প্রকল্প হবে বৃহৎ (দূর, লোধা কি বোঝে, কি জানে?)। ঠিকাদার থাকতেই হবে (আর কাকে ভরসা করা চলে?)। লোধারা হাত পেতেই থাকবে। তাদের কিসে ভালো হবে সে কথা তাদের কাছে শোনা হবে না (লোধাদের কি মন বলে বস্তু আছে? নৃতত্ত্ববিদ লোধা বিজ্ঞানীরা ও পণ্ডিতরা কি বলেন?)। আমরা যা করব, ওদেরকে তা মেনে নিতে হবে। এই যে একটা গোটা মানবজাতিকে নিরন্তর পাত্তা না দেয়া, যে জাতটা যেমন বুদ্ধিমান তেমন নির্যাতিত, এর পিছনে আছে এক সংখ্যালঘিষ্ঠ আদিবাসী জাতির বিষয়ে অসীম তাচ্ছিল্য। লোধা জাতির একটাই অপরাধ। তারা কয়েক হাজার, কয়েক লক্ষ নয়। কয়েক লক্ষ হলে এমন তাচ্ছিল্য দেখাতে কোনো সরকার সাহস করত না। যে আদিবাসী জাতিতে কয়েক লক্ষ ভোটদাতা, তাকে অবহেলা করবে কোন্ সরকার? শেষ অবধি লোধা, খেড়িয়া, বিরহড়, পাহাড়িয়া, এদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র উপায় হল ঐক্যবদ্ধ আদিবাসী সমাজ, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিগুলি এদের বাঁচাবে। সাঁওতাল, ওরাওঁ এবং মুণ্ডারাই সে কাজ করতে পারেন। যেদিন তাঁরা বুঝবেন, যে আদিবাসী সত্তাই সামগ্রিকভাবে বিপন্ন, সেদিন তাঁরা ঐক্যের পথে এগোবেন বলেই বিশ্বাস রাখি। আমি জানি যে লোধাদের আজ বড়ই দরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সাঁওতাল ও মুণ্ডার সাহায্য।

সংযোজন

এই লেখাগুলি প্রকাশের পরে (ক) পশ্চিমবঙ্গে লোধা উন্নয়নে কাগজে কিছু কাজ এগিয়েছে, বাস্তবে ব্লক ও পঞ্চায়েত কিভাবে তা রূপায়ণ করছে তা দেখার অপেক্ষা রাখে। ঠিকাদারী প্রথাতেই কাজ হচ্ছে, তবে হয়তো তাদের "ঠিকাদার" বলা হচ্ছে না। লাভের গুড় আজও পিঁপড়াই খাচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। (খ) ১৯৮৩

সেপ্টেম্বর থেকে চুনীরানী কোটাল সহ আরো কয়েকজন লোধা সমাজকর্মী নিযুক্ত হয়েছেন, যদিও লোধা সেলে অন্তত একশো লোধা সমাজকর্মী এখনি দরকার। (গ) চক-সাহাপুরের হস্টেলটির নতুন ঘর হয়েছে। (ঘ) চুনীরানী কোটাল বি. এ. পাশ করেছেন। লোধাশবর সমাজে ইনি দ্বিতীয় গ্রাজুয়েট, মেয়েদের মধ্যে প্রথম গ্রাজুয়েট। প্রহ্লাদ ভুক্তা প্রথম লোধা গ্রাজুয়েট। (ঙ) চক-সাহাপুরে সাঁওতাল গঙ্গারাম হেমব্রম ও লোধা বঙ্কিম ভক্তার যুক্ত নেতৃত্বে গঠিত সমিতি অন্য আদিবাসী, তপশীলী, হিন্দু, সকলকে নিয়ে গ্রামকল্যাণ কার্য করছেন।

মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ : লেখক ও শমীক ঘোষ।

ইসলাম, জাতপাত ও প্রগতি

রফিউদ্দিন

আমার নাম রফিউদ্দিন না হয়ে যদি গৌরব দত্ত হত, আমি ব্যক্তিটি অপরিবর্তিত রূপে একটিমাত্র আমি সত্তাই যে ধারণ করে চলতাম, একথা বলা যায়। তার্কিক বলবেন, এ উক্তির যথার্থতা নেই। কেননা ওই দুই নামের চরিত্রে ভিন্নতা আছে। পারিপার্শ্বিক নীতি নিয়মের পার্থক্য আছে। আমি বলব, ওরা সমার্থকপ্রায়। তাই গৌরব দত্ত রফিউদ্দিন হলেও পরিচয়ের ইতরবিশেষ ঘটার কথা নয়, যা দিয়ে মনুষ্য চেতনা ব্যাহত হতে পারে।

এই 'মনুষ্য চেতনা' কথাটি থেকেই যাবতীয় কথার সূত্রপাত। গফুরের গরু মহেশ না হয়ে মামুদ হলে কিংবা আমার বাড়ির খাঁটি দেশজ কুকুরটার নাম টম না হয়ে লালু বা হাজের হলে কিছুমাত্র বলার থাকে না। গরু নেহাতই গরু থেকে যায়, কুকুর নেহাতই কুকুর থাকে। অন্যদের থেকে আলাদা করে চেনা ছাড়া ওইসব নামে ওদের অন্যকিছু এসে যায় না। প্রাণীকুলে নির্দিষ্ট একটি প্রজাতি হিসেবেই ওরা বিবেচিত হয়। বৃহদর্থে যা নাকি একটা সম্প্রদায়। যেখানে 'ধর্ম' নামক বস্তুটি একেবারে অনুপস্থিত। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা হবার নয়। আমরা নামের ভিতর থেকে ব্যক্তি-পার্থক্য ছাড়াও আরো অনেক পার্থক্যই খুঁজে ফেলি। যেমন রফিউদ্দিন সেই ব্যক্তি যে একজন মুসলমান। গৌরব দত্ত বর্ণহিন্দু। দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক যেন তেল-জলের। আবার উভয়েরই স্ব স্ব ক্ষেত্রে জড়িয়ে আছে বংশগত কৌলিন্যের প্রশ্ন। আছে সমাজ-সংস্কৃতির বহু দিক।

এইখান থেকেই বিপত্তির সূচনা। আমরা ব্যক্তির পরিচয়কে সমাজ-সম্প্রদায়ের পরিচয় দিয়ে এবং তাকে ধর্ম দিয়েই চিহ্নিত করতে শিখেছি। এই শেখা মানুষকে অতিমাত্রায় সম্প্রদায়গত সীমাবদ্ধতায় ঠেলে দিয়েছে। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই ধর্মের উদারনৈতিক বিশ্লেষণগুলিকে মনের এক কোনায় বসিয়ে রেখে বড় অংশেই আমরা বহু অন্ধ সংস্কার বিশ্বাসকে লালন করি। ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি উন্নাসিক হয়ে উঠি। স্ব-মাহাত্ম্য প্রচারের প্রলোভনে মানবিকতার অপমান ঘটিয়ে চলি প্রতিমুহূর্তে। উঁচু নিচু জাতপাতের বিচারে মনুষ্যধর্মের বিবেকী সত্তার গলা টিপে ধরি। আমাদের ধর্মপ্রবণ অন্তরাত্মা একটুও তাতে কাঁপে না। বরং তৃপ্ত হয়। জাত-গর্বের পুলক জাগে মনে।

তাহলে জাত বা জাতি কি? ইংরাজী Race বা Nation দুটোর কোনোটি দিয়েই আমাদের ব্যবহারিক অর্থ মিলবে না। আমরা একে ভিন্ন চরিত্রের বুঝি। যার মধ্যে শারীরিক কিংবা সাংস্কৃতিক প্রভিন্নতা নেই। ভৌগোলিক ব্যবধানও নেই। ১৬ শতকে পর্তুগীজরা এদেশে এসে এদেশের সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে casta বা

casto নামে অভিহিত করেছিলেন। যার অর্থ 'শুদ্ধ'। casta থেকে caste এসেছে। জাতির আধুনিক প্রতিশব্দ। বর্তমানে জাতিবিন্যাস সেই শুদ্ধতার নিরিখেই। জাতপাত শুদ্ধতারই আচার বিচার। যা আমরা প্রাপ্ত হই জন্মসূত্রে। জন্মই নির্দেশ করে উঁচু কিংবা নীচু জাতের পরিচয়। তা ভঙ্গুর নয়, খণ্ডনীয় নয়। অহঙ্কারে কিংবা লজ্জায় তাকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ধারণ করা।

বিজ্ঞান বলছে, পৃথিবীতে মনুষ্যপ্রাণের উদ্ভব ক্রমাভিব্যক্তির ফল। প্রাক্-ইতিহাসের বহু যুগ ধরে বিবর্তিত হয়েছে অ্যানথ্রোপয়েড এপ্। শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটেছে গোষ্ঠীভুক্ত বিশেষ কোনো দলের। গাঠনিক পরিবর্তন এসেছে দেহে। ঝুঁকে পড়া শরীর ক্রমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে মাটির ওপর। তারপর বিবর্তনের ধারায় স্ব-বৈশিষ্ট্যে পৃথক হয়ে প্রবেশ করেছে ভিন্নতর জীবনে। তারপর একটু একটু করে বিচ্ছিন্নভাবে আগুন জ্বালতে শিখেছে, কথা বলতে শিখেছে, কৃষি-কাজ শিখেছে, বাসস্থান গড়তে শিখেছে, সমাজবদ্ধ হতে শিখেছে। অরণ্যসভ্যতায় বিকশিত হয়েছে মানুষরূপে।

ইসলাম বলছে, সর্বোৎকৃষ্ট জীবসৃষ্টির ইচ্ছা করেছিলেন আল্লাহ। প্রিয় ফেরেশতাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত আদমকে সৃষ্টির। আদমের উরুর অস্থি থেকে সৃষ্ট হয়েছিলেন নারী। হাওয়া। অতঃপর ফেরেশতার প্রতি নির্দেশ হল সৃষ্ট যুগলকে সিজ্দা করার। মৃত্তিকায় যাদের গঠন, তাদের সিজ্দা করতে করতে তীব্র অসম্মতি জানালেন ফেরেশতা। আল্লাহর রোষে পড়ে ত্যাজ্য হলেন। শয়তান বলে চিহ্নিত করা হল তাকে। শুরু হল আল্লাহর বিরোধিতা। আদম-হাওয়াকে কুমন্ত্রণা। তারই প্রলোভনে আদম-হাওয়া অমান্য করলেন আল্লাহর নির্দেশ। নিষিদ্ধ বৃক্ষ-ফল ভক্ষণ করলেন। অবাধ্যতার অপরাধে বেহেশ্ত্ হতে আল্লাহ তাদের স্থানান্তরিত করলেন পৃথিবীতে। মনুষ্যপ্রাণের সূত্রপাত ঘটলো এইভাবে।

খৃষ্টীয় আদম-ঈভ ইসলামের কথারই অনুরণন। অর্থাৎ ঈশ্বরকে অবমাননার অপরাধে স্বর্গ হতে বিদায়। পৃথিবীতে অবতরণ।

উপনিষদ বলছে, ব্রহ্মার ইচ্ছা হতে পৃথিবী এবং পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার। তিনিই সবকিছুর উৎপত্তিস্থল। তিনিই জগতের যোনি অর্থাৎ কারণ। তাঁর থেকেই সমস্ত জাত হয়। বিলীন হয় তাঁতেই।

বিজ্ঞানের সঙ্গে শাস্ত্রীয় মতের বিরোধের মধ্যেও সাযুজ্য লক্ষ করা যাবে। লক্ষ করা যাবে, এক বহুপূর্ব নির্দিষ্ট প্রজন্মের উত্তরসূরী আজকের মানুষেরা। যখন ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ভিতরে সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতা আসেনি, অসাম্য জ্ঞান আসেনি, ভেদবুদ্ধির হানাহানি আসেনি। তবু এক মহাশক্তির অস্তিত্ব অনুভব করেছিলো অরণ্যচারী মানুষ। তার পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির সঙ্গে সেই অস্তিত্বের নিবিড় যোগকে উপলব্ধি করে নত হয়েছিলো সে। ধর্মবোধ জেগেছিলো। প্রণয়ন করেছিলো

ধর্মের আচরণবিধি। জীবের জগতের নিয়ন্ত্রকরূপে তাঁকে প্রশস্তির নিয়ম রচনা করলো মানুষ। আগুনের সভ্যতার উন্মেষে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি যত বিস্তার লাভ করেছে, মানুষ খুঁজতে চেয়েছে ঈশ্বরকে। খুঁজতে চেয়েছে জীবনদর্শন। মতপার্থক্যের সূচনা হয়েছে। তারপর সময়ের গতিময়তায় মানুষের গমনাগমনের পথ হয়েছে বিস্তৃত। নিকট থেকে দূরের পানে ছড়িয়ে ছড়িয়ে তারা গড়ে নিয়েছে পৃথক সংঘবদ্ধ গ্রাম, পৃথক সমাজ, পৃথক সম্প্রদায়।

এদেশীয় পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছেন, 'মানুষ ধর্মের নাম করেই নিজেদের কৃত্রিম গণ্ডির বাইরের মানুষকে ঘৃণা করবার নিত্য অধিকার দাবী করেছে। …কৃপণ যেমন করে আপনার টাকার থলি লুকিয়ে রাখে তেমনি করে আজও আমরা আমাদের ভগবানকে আপনার সম্প্রদায়ের লোহার সিন্দুকে তালা বন্ধ করে রেখেছি বলে আরাম বোধ করি এবং মনে করি, যারা আমাদের দলের নামটুকু ধারণ না করেছে তারা ঈশ্বরের ত্যাজ্যপুত্ররূপে কল্যাণের অধিকারী হতে বঞ্চিত।' এই দলভিত্তিক বিভেদ প্রক্রিয়া ভারতীয় সমাজে বহুকালের, বহুমুখী। হিন্দু বনাম হিন্দু, হিন্দু বনাম মুসলিম, মুসলিম বনাম মুসলিম। একে অন্যকে তথাকথিত কৌলিন্যের বিচারে অন্ত্যজ শ্রেণীর ভেবেছে, ঘৃণা করেছে, দৈহিকভাবে অপবিত্র জ্ঞান করেছে। সময়ের প্রাযুক্তিক ক্রমপরিবর্তনে ভেসে গিয়েও এই প্রাচীন সংস্কারের স্বরূপ সে স্কন্ধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি আজো। পারতে যে চেয়েছে, এমন সদিচ্ছার কথাও জোর দিয়ে বলা যাবে না। বরং স্থূল জাত্যাভিমান এখন এতটাই সূক্ষ্ম, প্রচ্ছন্ন হয়ে গভীর সত্তায় বসবাস শুরু করেছে যে তাকে বুঝে নিয়ে নিরাপদ দূরত্ব তৈরীর প্রচেষ্টাও আজ অসম্ভবপ্রায়। একে ধর্ম দিয়েও ব্যাখ্যা করা যায় না। আমাদের চিন্তা-চেতনার সংকোচনের মধ্যে আমাদের ঈশ্বর, আমাদের ধর্মবোধ সংকুচিত হয়ে ওঠে।

'ধর্ম' তবে কি? ধর্ম কোনো জীবের, জড়ের বা পার্থিব যে কোনো কিছুরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। নিজস্ব প্রকৃতি। Religion দিয়ে ধর্মকে ঠিক বোঝা যায় না। Religion সম্পূর্ণ ঈশ্বর সম্পর্কিত। ধর্ম ঈশ্বর সম্পর্কিত নাও হতে পারে। যেমন পদার্থের ধর্ম, জীবের ধর্ম। তা প্রকৃতিদত্ত। যেমন লোহার ধর্ম চুম্বকত্ব। কিন্তু মানুষের ধর্ম বলতে আমরা এক ভিন্নতর এবং উন্নতর জীবনদর্শন বুঝি। যা নিতান্তই মানুষের, আর কারো নয়। যা নিতান্তই প্রকৃতিদত্ত নয়, প্রয়াসলব্ধ; তার স্বরূপে। পরিচয়ে মানব বলেই তা হবে মানবিক। তাতেই তার বিকাশ, তার পূর্ণতা।

গ্রামসমাজে একটা কথা বহুলপ্রচলিত। ঈশ্বর 'মান' এবং 'হুঁস' দিয়ে সৃষ্টি করেছেন মানুষ। মান অর্থ সম্মান এবং হুঁস অর্থ জ্ঞান। আমরা জ্ঞানার্জনে প্রয়াস পাই এবং আচরণে অসম্মান করি জ্ঞানকেই। আমাদের ধর্ম ঈশ্বরকেন্দ্রিক। আমরা জানি, তা মানুষের কল্যাণের সহায়ক হবে, মানুষকে মানুষের সম্মানের

মধ্যেই। অথচ মানবাত্মার অসম্মানেই আমরা প্রতিষ্ঠিত করি আমাদের মর্যাদা। দৃঢ়তার সঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছেন, 'দার্শনিক যুক্তির কূটকচাল ও ক্রিয়াকলাপে অনুষ্ঠানাদির স্বপক্ষে যুক্তিপ্রয়োগ—এ দুই-ই সমান অর্থলেশহীন'। বলেছেন, 'আমাদের তীর্থস্থান হল রন্ধনশালা, আমাদের ভগবান হল রন্ধনশালার তৈজসপত্র। আমাদের ধর্মের মূলে সারাক্ষণ এই বুলি, আমাকে ছুঁয়ো না, আমি অতি পবিত্র'।

এদেশে এই পবিত্রতার পরিমাপ প্রক্রিয়া বহু পূর্ব সময়ের। এদেশের অতীত বিদেশী গোষ্ঠীর উপর্যুপরি আগমনের। এবং যখনই যে গোষ্ঠীর আগমন ঘটেছে, আপামর জনসাধারণের কাছে জাতি হিসাবে পরম সম্মানিত আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিমের গন্ধ নিয়ে যারাই এসেছে এদেশে, মর্যাদার শীর্ষাসনটি তারাই পেয়েছে। হিন্দু সাধারণের কাছে যেমন দ্বিজ আর্যসন্তানেরা, মুসলিম সাধারণের কাছে তেমনি আরব, পারসিক, আফগান বা মুঘল বংশোদ্ভূতরা। এই মর্যাদার প্রশ্নটি কালক্রমে বিস্তৃত হতে হতেই উৎপন্ন করেছে উঁচু নিচু জাতের প্রশ্ন। যে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা, জাতিবিন্যাস একদা সমাজব্যবস্থার প্রয়োজনীয় অঙ্গ ছিল, ধর্মমতের সঙ্গে মিশে গিয়ে তা বহু সমস্যার সূচনা করলো। এক সুশৃংখল সমাজমণ্ডলী ভেঙে গিয়ে জন্ম নিল পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার আবর্ত। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম এদেশেই উদ্ভূত, এদেশীয় জীবনসংস্কৃতি ও দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। মূল হিন্দুধর্মের বিদ্রোহী হয়েও জৈনধর্ম হিন্দুধর্মেরই শাখারূপে জাতিভেদকে কতকটা স্বীকার করে নিয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম জাতিভেদ স্বীকার করেনি। চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক স্বাধীনতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু শেষে এদেশ ছেড়েই চলে গেছে সে। খ্রীষ্ট ধর্ম এদেশে এসে স্থায়ী হয়েছে। ধীরে ধীরে নিজেদের মধ্যে গড়ে নিয়েছিল জাতিভেদ। এদেশের মুসলমান সমাজব্যবস্থাও এর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়নি।

আর্য-আগমন বহু পূর্ব দ্রাবিড় সভ্যতার উপর। যেসময় এদেশে যাযাবর এবং অরণ্যবাসী মানুষের আধিক্য। আর্যরা দ্রাবিড় বা অন্যান্য অনার্য শ্রেণীর চেয়ে নিজেদের সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করত। তারই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় জাতিভেদ গড়ে উঠে সেই প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে। তার প্রভাব পড়ে রাজনীতিতে, সমাজে। কর্ম-ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা কালক্রমে হারিয়ে ফেলে তার গুরুত্ব। দৈনন্দিন জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মনের রাজত্বে ছোঁয়াছুঁয়ির বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। তার পরিণতি অস্পৃশ্যতার প্রবল দৌরাত্ম্যে। বলা যায়, এদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার মূলে তৎকালীন হিন্দুসমাজের উগ্র জাতি ও গোত্রভেদ প্রথা। সামাজিক বিভিন্নক্ষেত্রে বর্ণগত উচ্চ-নীচের প্রভেদ-বিদ্বেষ কঠোর ছিল এতটাই যে তথাকথিত নীচু শ্রেণীর মনে ইসলামের সামাজিক সমতা আর সৌভ্রাত্রের ঘোষণা প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করল। হিন্দুধর্মত্যাগীদের দিয়ে পুষ্ট হতে থাকল মুসলমান সমাজ। মুসলমান ফকিরদের অলৌকিক ক্ষমতায় মুগ্ধ বিস্মিত বহু মানুষও ইসলামে দীক্ষা নেয়। শ্রীহট্টে শাহজালালের প্রভাবে সে অঞ্চলের বহু-অধিবাসী যে মুসলমান

হয়েছিল, ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্তে তার উল্লেখ মেলে। অর্থাৎ ভাঙাগড়ার প্রবল প্লাবন এলো। এই তীব্র ভাঙন রোধে উচ্চবর্ণ হিন্দুরা অবশেষে ঘোষণা করেন, ধর্মান্তরিত উচ্চবংশীয় হিন্দু পুনরায় হিন্দুমতে ফিরে এলে পুরানো সম্মান-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়া হবে। প্রণয়ণ করা হয় এই বিধি, "ব্রহ্মতেজের আগুন অধস্তন ছয় পুরুষ পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত থাকে"।[১]

উল্লেখের বিষয় এই, নিম্নশ্রেণীর ধর্মত্যাগীদের ফিরিয়ে নেবার উদ্যোগ প্রায় চোখেই পড়ে না। কাশ্মীরের কথাই ধরা যাক। সেখানে দীর্ঘদিন ধর্মান্তর চলতে থাকায় বৃহৎ সংখ্যক অধিবাসীই মুসলিম হয়ে পড়ে। ১৯ শতকের মাঝামাঝি এ রাজ্যের হিন্দু রাজা লক্ষ করলেন যে ওইসব ধর্মান্তরিতদের অনেকেই হিন্দু সমাজে ফিরে আসতে আগ্রহী, দলবদ্ধভাবে। তিনি কাশীতে প্রতিনিধি পাঠিয়ে পণ্ডিতদের কাছে এ সম্পর্কে বিশদ জানতে চাইলেন। পণ্ডিতেরা তাদের অসম্মতির কথা জানিয়ে দেন।[২] (হাল আমলে কোথাও কোথাও ফেরাবার উদ্যোগ দেখা গেলেও নতুন এক সমস্যা দেখা দিয়েছে। শ্রেণীবিন্যাসের ঠিক কোথায় এবার ফিরে-আসা মানুষদের স্থান হবে? উঁচুতে না পূর্বাবস্থায়?) ধারণা করা যায়, কালক্রমে এদেশীয় মুসলিম-দের সম্পর্কে উচ্চবর্ণ হিন্দুরা এই ধারণা পোষণ করতে থাকে, এরাও নিম্নবর্ণের হিন্দুবৎ অচ্ছুত। উচ্চবর্ণ ধর্মত্যাগীদের স্বধর্মে ফেরাবার উদ্যোগে প্রমাণিত এই, মুসলিম শাসকদের আনুকূল্য লাভের আশায় কিংবা অন্যান্য যে কোনো কারণেই হোক, ইসলাম গ্রহণ হিন্দু উঁচু শ্রেণীতেও ঘটেছিল। পুনরায় কতজন পূর্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করে, তা এখানে বিচার্য নয়। আমরা দুটি অবস্থাকেই বড় করতে দেখতে যাচ্ছি। এক : এদেশীয় মুসলিম মানেই প্রাক্তন নিম্নবর্ণ হিন্দু—যারা ছিল অস্পৃশ্য। অতএব এইসব মুসলিমরাও অস্পৃশ্য, অপবিত্র—এই ধারণার উৎপত্তি। দুই : নব্য-মুসলিম মনে সদ্য ফেলে আসা অবহেলার স্মৃতি বেঁচে থাকে স্পষ্টতই। সাম্যদর্শের পাশাপাশি এখানেও উঁচু নিচু পার্থক্য নির্ণয়ের সূচনা হয়। ধুম পড়ে যায় বিদেশীয়দের সঙ্গে জন্মের যোগসূত্র আবিষ্কারের। হিন্দু সমাজে আর্য-রক্তের যোগ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা যেরকম। যা দিয়ে কেউ প্রতিপন্ন হবে অভিজাত কিংবা অনভিজাত বলে।

কিন্তু 'আভিজাত্য গর্ব এবং বর্ণাশ্রম সংক্রান্ত গোড়ামি সত্ত্বেও একটি কথা স্বীকার না করে উপায় নেই—আমরা বর্ণসংকর জাতি।...আমাদের ধমনীতে নানা জাতের রক্তের সংমিশ্রণ।...বিভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন আর্যের দল এদেশে এসে দ্রাবিড়দের সঙ্গে মিশে গেছে। হাজার হাজার বছর ধরে যাযাবর জাতি ও উপজাতি এদেশে এসেছে—মীডিয়, ইরাণীয়, গ্রীক, বাকট্রিয়, পার্থিয়ান, শক, কুশান, তুর্কি, মোঙ্গোলীয় বা মুঘল। তারপর তারা বিলুপ্ত হয়েছে। পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে রেখে গেছে ক্রমশঃ তরলায়িত কিছু বিদেশী রক্ত।' বলেছেন জহরলাল নেহরু। রবীন্দ্রনাথ তাইই বলেছেন 'শক হূন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন'। আবার

বিদেশীয়দের কারো কারো বংশগত সম্পর্কও লক্ষ্যণীয়। যেমন ভারতীয় আর্য ও ইরাণীয়রা একই বংশ হতে উদ্ভূত। একই জাতির দুই ভিন্ন ধারা। সংমিশ্রণ এদেশীয়র সঙ্গেও। এদেশীয় হিন্দুর সঙ্গে মুসলিমের। দিল্লির সুলতান ফিরোজশাহ কিংবা ঘিয়াসউদ্দিন তুঘলক ছিলেন হিন্দু রমনীর পুত্র।

এতদসত্ত্বেও আমরা জাতিভেদের ত্রিমুখী প্রবাহ স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হতে দেখছি। হিন্দুসমাজে জাতপাত রয়ে যায় পূর্বাবস্থাতেই। তা এতখানি কঠোর, এতখানি হীনমন্য করে তুলেছে অচ্ছুৎকে—দেখতে পাচ্ছি, মুরারী নামের জনৈক অস্পৃশ্য এসেছে চৈতন্যদর্শনে। নিজেকে পতিত শ্রেণীর প্রমাণের জন্য দাঁতে তৃণ নিয়ে এসেছে সে। শ্রীচৈতন্য কাছে আসছেন দেখে চিৎকার করে বলছে, 'প্রভু ছোঁবেন না, আমি পাতকী, আমার দেহ আপনার পূতস্পর্শ পাওয়ার যোগ্য নয়'।[৩]

এদেশীয় মুসলিম মানেই নিম্নবর্ণ হিন্দু-জাত। অতএব অচ্ছুৎবৎ। অতএব এইবার দেখা গেছে হিন্দু-মুসলিম ভেদের তীব্ররূপ। প্রথমে তা দেশজ মুসলিমের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরে পরে সামগ্রিকতায় প্রকাশ পেতে থাকলো। জে. ই. কার্পেন্টারের বর্ণনায় জানা যাচ্ছে, বাংলার সুলতান একদা প্রীতিবশে নিজের পানপাত্র থেকে প্রিয়পাত্র সুবুদ্ধি রায়ের গলায় জল ঢেলে দিয়েছেন। জানাজানি হল এ ঘটনা। প্রচার হল, ভ্রষ্ট হয়েছেন সুবুদ্ধি রায়, জাত গিয়েছে তাঁর। কাশীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অতঃপর তাঁকে ফুটন্ত ঘি গলাধঃকরণের মাধ্যমে শুদ্ধ হবার নির্দেশ দিলেন। বিপদাপন্ন সুবুদ্ধি রায় অবশেষে শরণাপন্ন হন শ্রীচৈতন্যের। বর্ণভেদের তৃতীয় প্রবাহ মুসলিম এবং মুসলিমে। অভিজাত এবং অনভিজাত শ্রেণীর পার্থক্য। তা উগ্র অস্পৃশ্যতায় না পৌঁছালেও বিবাহ বা অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে প্রকটরূপে বিচার্য হতে দেখা দেয়। দৈনন্দিন জীবনযাপনে কুলীন-অকুলীন শ্রেণীজ্ঞান পাশাপাশি পালিত হয়ে আসে সূক্ষ্ম অস্তিত্বে। কীরূপে তার প্রকাশ? শতবর্ষ পূর্বে। ১৮৮২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী। গভর্নর জেনারেল লর্ড রিপন। উইলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বে কমিশন গঠন করলেন শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়ে। মুসলমানদের মাতৃভাষার প্রশ্নটি দেখা দিল কমিশনে। লিখিতভাবে নওয়াব আব্দুল লতিফ বললেন: নিম্নশ্রেণীর মুসলমান, পরিচয়ে যারা 'আতরাফ', যারা জাতিগতভাবে হিন্দুবর্গ হতে পৃথক নয়, তাদের মাতৃভাষা বাংলা। 'আশরাফ' অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর মুসলমানের মাতৃভাষা উর্দু। উল্লেখের বিষয়, নওয়াব আব্দুল লতিফ নিজে ছিলেন একজন বাংলাভাষী। 'আশরাফ' শ্রেণীতে উত্তরণের প্রয়াসে তৎকালীন সময়ে তাঁর মতো অনেককেই উর্দু ভাষার চর্চাতে মনোযোগী হতে দেখা গেছে। এরও আগে আমরা এদেশীয় মুসলিমদের আরবী ও ফারসীভাষীদের পানে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি।[৪] এর নাম কৌলিন্যমোহ। আব্দুল লতিফের ঘোষণায় আমরা সেই কৌলিন্যবোধ, উঁচু-নীচু প্রভেদজ্ঞানের প্রবাহকেই চিনতে পারছি। যে সময় মাতৃভাষা হিসাবে বাংলাকে স্বীকার করতে পর্যন্ত কুণ্ঠা জাগতো বাঙালী

মুসলমানদের। এই শতকের গোড়ার দিককার ইতিহাসেও সেই বিতর্ক চলেছে। আজও যে তার অস্তিত্ব টিকে আছে, একথা বলা বাহুল্য। ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্বের আদর্শ আমাদের সগর্ব উল্লাসের কারণ হলেও মুসলিম হিসাবে বাঙালী আজো উর্দুভাষীর সমতুল্য যে নয়, ব্যবহারিক জীবনে তা স্পষ্ট। আবার একই ভাষাভাষীর মধ্যে জোলা, জেলে বা কলু শ্রেণীকে হীনদৃষ্টিতে দেখা হয়ে থাকে। কোনো কোনো শ্রেণীর অন্নগ্রহণেও অনীহা লক্ষ করা যায় তথাকথিত উঁচু বংশজাত মুসলিমের। ধর্মাচরণে মতপার্থক্যের বিষয় তো আছেই।

হয়তো বা এ অবস্থা আমাদের অধিকাংশেরই চাওয়া নয়। কিন্তু মুশকিল এই, আমাদের অসাম্য চেতনা মনের এমন গভীরতম স্তরে বিরাজ করে যে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণাই প্রায় আসে না। আধুনিক বিজ্ঞানমনস্কতা দিয়ে আমরা যখন সবকিছুই বিচার করতে চাই, আমাদের অবচেতন মনের কোনোখানে সে নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে লুকিয়ে থাকে। বিশেষ অবস্থাতে তা বিপত্তির সূচক হিসাবে নড়েচড়েও ওঠে। আমরা প্রগতির নেশায় এতটাই ব্যতিব্যস্ত থাকি, আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির নেশায় এতটাই ব্যাকুল হয়ে উঠি যে আমাদের নিজেদের ভিতর পানে আর তাকানো হয়ে ওঠে না। অথচ ভেদবুদ্ধির আচরণবিধি বিভিন্ন জাতিসম্প্রদায়ের মধ্যে কত তিক্ততার কারণ হয়ে ওঠে, কত মারণক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং কতটা আধুনিকতা প্রগতির অন্তরায় সৃষ্টি করে—তা আমরা জানি। জানবার পরও অতীব বেদনার সঙ্গে হঠাৎই যখন আবিষ্কার করতে হয় আমি মুসলমান বা অমুক নীচু জাতের হিন্দু বা অমুক কুলীন গোত্রীয়, আমাদের মনুষ্যমনের আধুনিক অহংবোধ ধুলোয় মিশে গেলেও আমরা খেয়াল করি না। কেননা বিজ্ঞানকে প্রগতিকে আমরা যতখানি বহিরঙ্গে গ্রহণ করেছি, অন্তরঙ্গে তা করিনি। এবং করিনি বলেই শুচিতার প্রাচীন ধারণা জাতপাত অস্পৃশ্যতার মূলোৎপাটন বিষয়ে বিশেষ ভাবিত হয়েছি বলা যাবে না।

এই না হবারও একটা প্রেক্ষাপট আছে। রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে বিশ্বভারতীর 'নিজাম বক্তৃতায়' আব্দুল ওদুদ বলেছেন, 'ধর্মাদর্শের কোনো বিশেষ রূপই তার চরম রূপ নয়। আদর্শের বিকাশ আছে, তার রূপেরও বিকাশ আছে; কিন্তু ধর্মাদর্শ সাধারণতঃ কঠিন দেহ, কোনো ধর্মাদর্শ যদি একবার কোন সামাজিক রূপ পায় তবে তার রূপান্তর সহজসাধ্য নয়।' আমরা ধর্মাদর্শকে যেমন সামাজিক রূপ দিয়েছি, সামাজিক রূপকেও ধর্মাদর্শ বলে স্থাপন করেছি। ইতর জাতির অন্ন উচ্চজাতি গ্রহণ করবে না—স্মৃতিশাস্ত্রের এ নির্দেশ হিন্দুসমাজে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। আবার ইতর জাতিকে অস্পৃশ্যতা দিয়ে ঘৃণা করার প্রথাও এখানে ধর্মাদর্শ বলে বিবেচিত হয়েছে। অনৈসলামিক ব্যক্তি, যারা আল্লার রোষে পতিত, তার সঙ্গে এমনকি বন্ধুত্ব পর্যন্ত করবে না—শরীয়তের এ নির্দেশ মুসলিম সমাজে আদৃত। আবার ধর্মীয় মতপার্থক্যের কারণে এখানে ইসলামভুক্ত ভিন্ন মতের

মানুষও অনৈসলামিক বলে বিবেচনা পায়। আসলে ধর্মমোহই (ধর্ম-বিকারও হতে পারে) এদেশে মানুষের অন্তর্নিহিত সৃষ্টিধর্মের ব্যর্থতার প্রতিরূপ।

আমাদের আদর্শজ্ঞান এবং আমাদের প্রায়োগিক আচরণ এইখানেই অসম হয়ে ওঠে। হিন্দুমনের আবহমান কালের বর্ণভেদ, জাতপাতের ব্যবস্থাকে ভাঙতে চেয়েছিলেন যে শ্রীচৈতন্য তিনিও আপন সত্তায় জাতপাত-অস্পৃশ্যতার ধ্বংস ঘটাতে পারেননি। নিষ্ঠার সঙ্গে অব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণে বিরত থেকেছেন তিনি। জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্তিকেও শ্রীচৈতন্য মেনেছেন বলে জানা যায়। রামানন্দ রায়কে পরম মর্যাদা দিয়েও তাঁকে শূদ্র বলতে আপত্তি করেননি। নিরন্তর হরিকীর্তনে ব্যাপৃত যে হরিদাস, পরিচয়ে ছিলেন যবন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশের অনুমতিও তাঁর মেলেনি। চণ্ডালের ভক্তি হলে সে আর চণ্ডাল থাকে না—বলতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। অথচ জনৈকা ভগবতী দাসী একদা ভক্তিভরে প্রণাম করেছিলেন তাঁকে। 'গোবিন্দ গোবিন্দ' বলে অস্থির হয়ে ওঠেন শ্রীরামকৃষ্ণ। স্পর্শের স্থান ধুয়ে ফেলেন গঙ্গাজলে।[৫] ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক হয়েও রামমোহন ভিনজাতের মানুষের সঙ্গে একত্রে আহার পর্যন্ত করতেন না। ধারণ করতেন ব্রাহ্মণের পবিত্রসূত্র উপবীতও।

অর্থাৎ আমাদের ঐতিহ্যলালিত স্বরূপে আমরা সর্বদাই সচেতনে জাতি-বৈষম্যের চর্চা করি—এমন না হোক অচেতন অভ্যাসেও তার চর্চা ঘটে থাকে। এবং মানুষ যদি এর শৃঙ্খলমুক্ত না হয় তবে সেই মানুষকে নিয়ে যে রাষ্ট্র, যে সমাজ, যে রাজনীতি—তা বৈষম্যময় হয়ে উঠতে কোথাও কোনো বাধা থাকে না। আর এই মুক্তি কোনো দিনক্ষণ বেঁধে আয়োজন করে প্রাপ্ত হবার নয়। জীবনের প্রয়োজনে *জীবন থেকে তার উন্মেষ ঘটতে হবে। যাতে সিন্ধুর পরিচয়ে যে হিন্দুর পরিচয়—তা সমস্ত সংকীর্ণ স্রোত পরিত্যাগ করে সিন্ধুর উদারতা ধারণ করে। যাতে সাম্য-শান্তির প্রতিষ্ঠায় যে ইসলামের যাত্রারম্ভ, তা সপ্রেম শান্তির মধ্যেই নিহিত থাকে।*

ঘটনাক্রমে আমিই প্রাণকেন্দ্র এমন কতক ঘটনার, যখন আমার মনুষ্যত্ব তীব্র মোচড় খেয়েছে আমার মুসলমানত্বের গভীরে। এক বিখ্যাত ধর্মশালায় দরখাস্ত পূরণের পর আমার নামগত পরিচয়ের কারণে একবার প্রায় অর্ধচন্দ্র খেয়ে আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। আমার চোখের সামনেই দরখাস্ত পত্রটি ছিঁড়ে কুটিকুটি করে বাইরের নোংরা নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিলো সেদিন। আমি শুধু ভেবেছিলাম, মানুষের ধর্মের পায়ে এ কোন্ শেকল পরিয়ে নির্যাতন চলছে! আমি যাদের বন্ধু বা ঘনিষ্ঠজন বলে বিবেচিত, সেইসব একাধিক ব্রাহ্মণগৃহে আসা যাওয়ার মাঝে আমাকে একাধিকবার ঘোরতর হতচকিত বিস্ময়ে ভেবে নিতে হয়েছে, আমি মুসলমান। গঙ্গাজলেরও সামনাসামনি হয়েছি। এবং বিস্ময়ের সঙ্গেই দেখেছি, সেখানে 'প্রগতির' কী বিপুল আয়োজন! 'আধুনিকতার' নৈবেদ্য সাজানো। এক বিখ্যাত মুসাফির-খানায় আমার বাঙালী-মুসলমানত্বের দোষে এক চরম উন্নাসিক অব্যবস্থারও শিকার হতে হয়েছে। শুনতে হয়েছে জনাকয়েকের বিদ্রূপের হাসিও। বোধহয় বলা

যেতে পারে, ইসলামের ধারাবাহিকতা হিন্দুর মতো সুপ্রাচীন হলে মুসলিম মন হিন্দুমনের অবিচ্ছেদ্য শ্রেণীভেদজ্ঞানেরই দোসর হয়ে উঠতো।

জাতপাত-অস্পৃশ্যতার এই সত্তা মজ্জাগত। এর স্বরূপ বহুলাংশেই সুপ্ত। ঠিক এই সময়ের প্রচলিত এক ধারণা দিয়েই বোঝানো যাবে এ কথা। ইদানিং বিদ্বজ্জনে বলেন, সামাজিক সমস্যা নিরূপণে, সম্প্রদায়ের সমালোচনায় মুসলিম সম্পর্কে মুসলিমকে এবং হিন্দু সম্পর্কে কোনো হিন্দুকেই মুখ খুলতে হবে। নতুবা কিছু তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে, 'বিধর্মী'র বিষোদ্গার' মনে হতে পারে। কিন্তু তা স্তুতিভাষণ বলে আপত্তির নয়, বরং সমাদরের। এ ধারণা আমাদের সভ্যতর জীবন প্রক্রিয়ায় এতদিনে নির্মূল হলেই ভালো হত, কিন্তু হয়নি। উল্টে আমরা তাকে বহুগুণে জীবিত রেখে জাতপাত বিষয়কে নীরব স্বীকৃতি দিয়ে চলেছি। চলেছি বলেই আজকের সমাজজীবনে আলোচনার ক্ষেত্রকে সীমায়িত করেছি হিন্দুত্ব বা মুসলমানত্বের নিরিখে। হিন্দুর মন্দত্ব অহিন্দুর উপলব্ধিতে, মুসলিমের মন্দত্ব অমুসলিমের উপলব্ধিতে প্রকাশ পাওয়া তাই সঙ্গত নয়। পরস্পরের আত্মীয়তাবোধের পথে, মানবতা প্রতিষ্ঠার পথে এ এক মস্ত বাধা।

এই বাধা কি অনতিক্রম্য? মানুষের পরিচয় কি তবে জাতি-গোত্র-ধর্ম-সম্প্রদায়ের বাইরে এসে দাঁড়াতে পারবে না?

বিভিন্ন ধর্মীয় তত্ত্বের বিশ্লেষণে আমরা মানুষের সাম্য-জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার কথা জেনেছি। জেনেছি গীতায়, জেনেছি কোরানে। আমাদের তত্ত্বজ্ঞানী মনকে এই জানা সমৃদ্ধ করেছে। গৌরব দিয়েছে। বাস্তব আচরণের সহায়ক হয়ে ওঠেনি। সমস্তই কেবল জ্ঞানের কথা হয়ে উঠেছে, বোধের কথা নয়। কেবল ধর্মালোচনার ক্ষেত্রে এই তত্ত্বমাহাত্ম্য পুলকিত করে আমাদের, আমরা অহংপুষ্ট হই ঔদার্য বিষয়ে। বাস্তব দুরবস্থার মোকাবিলায় স্মরণ নিই সংবিধানের। কিন্তু প্রতিদিনের জীবন-জীবিকার প্রশ্নেও আমরা বাঁচিয়ে রাখি জাত পরিচয়। শিক্ষার্জন থেকে জীবিকার্জন পর্যন্ত তাই আমাদের ধর্ম বর্ণ পরিচয়ের রীতি। এ রীতি নিয়মের প্রয়োজন-অপ্রয়োজন এখানে আলোচ্য নয়। আলোচ্য এই, আমাদের মনের দেয়ালে জাত-বর্ণের অনুরণন তাতে সর্বদাই বাজে। প্রতিপালনের অবকাশ মেলে। আমাদের শিক্ষা, আমাদের সংস্কৃতির সবরকম আয়োজনের মধ্যে এই বিভেদ, অসাম্য বহাল তবিয়তে রাজত্ব করলেও আমরা সজ্ঞানে তার দাসত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত থাকি। আমাদের ব্যক্তিসত্তা এইখানে আবদ্ধ বলেই আমাদের মনুষ্যত্ব চেতনায় জ্ঞানের চর্চা ঘটে, বোধের চর্চা নয়। আমরা জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতার কুফল বিষয়ে বহু বহু সভা করলেও আপন চেতনায় তার মৃত্যু ডাকি নে, সংগোপনে পোষ্য করে রাখি। এবং এই অধর্মের গায়ে স্বকৃত ধর্মের পোষাক পরিয়ে উল্লাস করি। তা প্রকাশ্যে হোক বা অপ্রকাশ্যে হোক। সচেতনে হোক বা অবচেতনে হোক।

বলতে দ্বিধা থাকা উচিত নয়, এ অবস্থার শীর্ষভাগ দায় দেশের ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত শ্রেণীর। অন্ন-বস্ত্র-স্বজন-সংসারের হাল সামলাতে যাদের সময় ফুরিয়ে যায়, সরলমনা সেই আপামর জনসাধারণকে তাঁরা নেপথ্য থেকে প্রতিনিয়ত নামিয়ে আনছেন অন্ধকার সংকীর্ণতায়। বিচ্ছেদবাদের জটিল আবর্তে। কখনো তীব্র আঘাত হেনে, কখনো প্রলুব্ধ করে; সারল্যের সুযোগে। যথার্থ বলেছেন আব্দুল ওদুদ। 'এক হিসাবে ভারতের যুগ যুগান্তরের ইতিহাস ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ইতিহাস।...এ ব্যবস্থা ভারতে যে এমন চিরস্থায়ী হবার উপক্রম করেছে, মনে হয়, তার মূলে দেশের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের উৎকট রক্ষণশীলতাই পরিবেশটনের সঙ্গে যোগ যেখানে বিকৃত।' মাত্র দিন কয়েক আগে বিশিষ্ট এক সমাজসেবী সংস্থার বার্ষিক সভা বসেছে। জনৈক মুসলিম বক্তা, পেশায় হাইস্কুলের শিক্ষক, বক্তৃতায় আক্ষেপ করে বললেন, মুসলমান হলেই কি সব সমান হয়ে যাবে? যে নাকি 'চৌদুলি', মুসলমানের মধ্যে সবচেয়ে নীচু জাত, হিন্দু বাগদীর সমান সেও আজ নেতা হয়ে বসছে। মানী আর মান পাবে কি করে?' তিনি বোঝাচ্ছিলেন গ্রামের রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে কীভাবে। বক্তৃতা শেষে উপস্থিত শ্রোতারা করতালির ঝড় তুললেন। এঁদের সকলেই শিক্ষিত। হিন্দু অথবা মুসলিম। সকলেই প্রতিষ্ঠিত। প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী থেকে শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, রাজনীতিক, সমাজসেবী, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী। এঁদেরই নিয়ন্ত্রণে জাত-ধর্ম ভিত্তিক বিচ্ছেদবাদের লাগাম। আমরা তাই দেখতে পেয়েছি, সংস্কৃত কলেজে হিন্দুর সকল বর্ণের ছাত্রদের ভর্তির প্রশ্নে প্রবল বিরোধী হলেন শিক্ষিত রক্ষণশীল শ্রেণী। ইচ্ছা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর কর্তৃপক্ষকে প্রস্তাব দিতে পারেননি সংস্কৃত কলেজের দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত করার। অবশেষে কায়স্থর চেয়ে নিম্নবর্ণের ছাত্র সেখানে পাঠের অধিকার পেতে পারেনি।[৬]

ম্যাক্সমুলার বলেছিলেন, '...যেখানেই ঈশ্বরবিশ্বাস সেখানেই মানুষের মধ্যে দিব্যচেতনার প্রভাব। আমাকে যদি এ কথা অবিশ্বাস করতে হয়, আমার সহজাত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যদি আমাকে মানতে হয় যে ঈশ্বর কেবল খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের ...তবে আমি নিজেকে খ্রীষ্টান বলতে পারবো না।'[৭] প্রকৃতই আমরা সংকীর্ণতায় বসে উদারতার স্বপ্ন দেখি। মাতৃজঠর থেকে আমরা ছিঁড়ে বেরিয়ে পৃথিবীর আলো দেখবার মতন আমাদের তাই সজ্ঞানে স্বশিক্ষায় আত্মমুক্তি দরকার। না হলে ঈশ্বরচিন্তা এবং ধর্মবোধও ক্ষুদ্র গণ্ডি ভাঙতে পারবে না। জানিনা কবে রবীন্দ্র-নাথের ভাষায় বলতে পারবো, 'ওরে সংকীর্ণ ঘরের অধিবাসী, ঘরের দরজা ভেঙে-চুরে ফেলে দাও। আমরা উৎসবের দেবতাকে দর্শন করে মনুষ্যত্বের জয়তিলক এঁকে নেব, নতুন ধর্ম পরিধান করব।' অন্যথায় মানবতার অসম্মানের মধ্যে অন্ধকার এঁদো গলিতে আমাদের সমস্ত আধুনিক ধ্যান-ধারণা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে॥

১ কে. এম. আশরফ : হিন্দুস্তানের জনজীবন ও জীবনচর্যা

২ জহরলাল নেহেরু : ভারত সন্ধানে

৩ মালিক মহম্মদ জায়সীর এই বিবরণের উল্লেখ করেছেন কে. এম. আশরফ : হিন্দুস্তানের জনজীবন ও জীবনচর্যা

৪ রশীদ আল্ ফারুকী : মুসলিম মানস : সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া

৫ জয়নারায়ণ সেন, দেশ : ১৬ এপ্রিল ১৯৮৮, পৃ ৫৩-৫৪

৬ বদরুদ্দিন উমর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ

৭ এ উক্তির উল্লেখ করেছেন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন : ধর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

দলিত রাজনীতি প্রসঙ্গে

বাসব সরকার

ভারতে দলিত রাজনীতি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে তার সূচনা হয়েছে। মহারাষ্ট্রে "দলিত প্যান্থার" নামের সংগঠন গড়ে ওঠার পর থেকেই রাজনীতির পরিভাষায় "দলিত" শব্দটি চালু হয়। সমাজের অবহেলিত অংশের কথা জোরালোভাবে তুলে ধরাটাই তার লক্ষ্য ছিল। মহারাষ্ট্রের রাজনীতির জটিল ধারায় দলিতদের ভূমিকা বর্তমানে কোন পর্যায়ে রয়েছে বলা শক্ত। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতির একটি ধারারূপে দলিতদের বক্তব্য অন্যান্য রাজ্যেও কিছুটা ছড়িয়েছে। জানা গেছে গত বছর পঞ্জাবের নির্বাচনে দলিত নামের একটি সংগঠন অংশ গ্রহণ করে। অকালিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাদের সাফল্য না এলেও, অন্ততঃ একুশটি নির্বাচনী কেন্দ্রে তারা কংগ্রেস প্রার্থীদের পরাজয় সুনিশ্চিত করেছে।

হিন্দু ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও দলিত রাজনীতি অদূর ভবিষ্যতে মাথাচাড়া দেওয়া মোটেই কষ্টকল্পনা নয়। কারণ যে পরিস্থিতিতে দলিতরা প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলির বাইরে নিজেদের স্বতন্ত্র সংগঠন গড়ে তোলা অপরিহার্য মনে করেছে, পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যে নিজেদের স্বতন্ত্রতা প্রতিষ্ঠা ও আদায়ের জন্য নির্বাচনে অংশ নিয়েছে, সেই ধরণের পরিস্থিতি অন্য হিন্দীভাষী রাজ্যেও বিরল নয়। সুতরাং দলিত নামের কোন কোন সংস্থা যদি কোন কোন রাজ্যে দেখা দেয়, প্রবহমান রাজনৈতিক ধারায় তারা যদি নতুন কোন মাত্রা যোগ করার মতো শক্তি সঞ্চার করতে পারে, সেক্ষেত্রে দলিত রাজনীতি অন্যত্র দেখা দেওয়া বিচিত্র নয়।

লক্ষণীয় যে পশ্চিম বাংলা, আসাম কিম্বা উড়িষ্যায়, প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভারতে দলিত রাজনীতির তেমন কোন অনুপ্রবেশ ঘটেনি। এই উপমহাদেশের আঞ্চলিক বৈচিত্র্য তার অন্যতম কারণ। পশ্চিম বাংলা, ত্রিপুরা ও কেরলে সাধারণভাবে বাম রাজনীতি, বিশেষতঃ কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐতিহ্য দলিত ধরণের কোন সংগঠন গড়ে ওঠার অন্তরায়। আসামে ছাত্র ও যুবদের মূলতঃ নেটিভিস্ট (nativist) আন্দোলন দলিত মানসিকতাকে ব্যাপক হতে দেয়নি। উড়িষ্যায় দলিত আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি থাকলেও পশ্চিম বাংলা ও অন্ধ্রের প্রভাব তার সাংগঠনিক বিকাশে বাধা দিয়েছে। আর অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, কেরল ও কর্ণাটকে রাজ্য রাজনীতির জটিলতায় দলিতদের স্বতন্ত্র শক্তি হিসাবে গড়ে ওঠার বাস্তব পরিবেশ দানা বাঁধতে পারেনি। অন্ধ্র, তামিলনাড়ু এবং কেরলে কমিউনিস্টদের এককালীন প্রাধান্যের রেশ রাজনীতিতে দলিত প্রভাব বিস্তারে আনুকূল্য করেনি। কর্ণাটকের রাজনৈতিক

ঐতিহ্য দলিতদের প্রভাব বিস্তারের পরিপন্থী হয়েছে। কিন্তু দলিত বলতে ব্যাপকার্থে যাদের বোঝানো হয়, সমাজের সেই অংশের যথেষ্ট দুর্গতি থাকা সত্ত্বেও এইসব রাজ্যে তথাকথিত দলিত রাজনীতি সুবিধা করতে পারেনি।

প্রশ্ন হলো, দলিত কে বা কারা? এক কথায় বলা যায় সমাজের নিম্নবর্গের শ্রেণীচেতনায় উদাসীন কিন্তু স্বতন্ত্রতা সম্পর্কে সজাগ সংগঠিত জঙ্গী অংশের নাম দলিত। ১৯৮১ সুমারিতে ভারতের মোট জনসংখ্যা ৭৫ কোটির মধ্যে প্রায় ৩৫ কোটি যে মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী বলে চিহ্নিত হয়েছে, দলিতরা হলো তারই একান্তভাবে গোষ্ঠী সচেতন, সংঘবদ্ধ একটি অংশ।

ভারতীয় অর্থনীতির বর্তমান কাঠামোয় তাদের অবস্থান সবার নীচে। যে স্তরে মানুষ "দিন আনে দিন খায়", সেই স্তরে পৌঁছবার সুযোগ ও যোগ্যতা থেকেও তারা বঞ্চিত। কৃষিতে তারা খেতমজুর বা তারো নীচের স্তরের মানুষ, যাদের জীবনে বুভুক্ষা ছাড়া আর কিছুর নিশ্চয়তা নেই। কোন কোন অঞ্চলে দাস শ্রমিকরূপেও তাদের দেখা যায়। এহেন মানুষদের মধ্যে যারা কোন মতে বৃহত্তর সমাজের কিছু পরিচয় পেয়েছে, তা সে কর্ম বা শিক্ষা যে কোন সূত্রেই হোক না কেন, মূলতঃ তাদের উদ্যম আর উদ্যোগেই দলিতদের স্বাতন্ত্র্য চেতনার গোড়াপত্তন হয়েছে। গান্ধী যুগে তাদেরই একাংশ হরিজনরূপে চিহ্নিত ছিল। আজো সরকারী পরিসংখ্যানে তারা তপশীলভুক্ত জাতি বা উপজাতি বলে উল্লিখিত হয়। যদিও তপশীলী সমাজের সব অংশ দলিত পর্যায়ে পড়ে না।

তিরিশের দশক থেকে আম্বেদকরের নেতৃত্বে সমাজের এই অংশ যখন ভারতীয় রাজনীতিতে নিজের প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছিল, তখন গান্ধীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ইংরাজদের বিভেদের রাজনীতি সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্য, গান্ধী আন্দোলনের মূল ধারার সঙ্গে তাদের গ্রথিত করার প্রয়াস পেয়েছিল। কিন্তু সামাজিক সংস্কার আর রাজনৈতিক সমতালাভের সম্ভাবনা তুলে ধরে গান্ধী এই অংশকে সামাজিক স্থিতাবস্থা রক্ষার কাজে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তর কালেও সেই ধারা অব্যাহত আছে। সমাজের অন্যান্য অংশের মতো এদের মধ্যেও নানা স্তর গড়ে উঠেছে। যেখানে যারা ক্ষমতার যতো কাছাকাছি যেতে পেরেছে, সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে তাদের আগ্রহ ততোই বেড়েছে। আবার দেশের রাজনৈতিক বিকাশের টানাপোড়েনে যারাই ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে তারা বর্ণব্যবস্থার অন্তর্হিত বৈষম্যকে দূর করার জন্য সামাজিক সহনশীলতার বদলে শ্রেণীসংগ্রাম শুরু করার কথা বলেছে। জগজীবন রাম ছিলেন সেই ধরণের একজন রাজনীতিক। হরিজনদের বাৎসরিক সমাবেশে সন্ত রুইদাসের ছবির পাশে ভক্তদের পূজো পেতে যেমন তাঁর বাধেনি, ক্ষমতায় থাকা কালে হরিজনদের চলতি ব্যবস্থার সঙ্গে আপোষ করে চলাকে যিনি প্রায় ব্রতরূপে প্রচার করতেন, ক্ষমতাচ্যুত জগজীবন রামের শ্রেণীসংগ্রাম শুরু করার হুমকি তার পাশাপাশি নিতান্তই শূন্যগর্ভ শোনাতো।

সাধারণভাবে হরিজন বা তপশিলী ও আদিবাসী নেতাদের চিন্তা-চেতনার মান ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সাফল্যের মাপকাঠির বেশি উপরে উঠতে পারেনি। সমস্ত বুর্জোয়া দলগুলি সম্পর্কে একথা কমবেশি প্রযোজ্য। দেশে বামপন্থী রাজনীতির প্রচার ও প্রসার নানা আন্দোলনের সূত্রে ঘটেছিল বলেই সেখানে সামাজিক স্থিতাবস্থা ভাঙার কথাই বড়ো হয়ে ওঠে। কিন্তু এই উপমহাদেশে সামাজিক অর্থনৈতিক বিকাশের বৈষম্য, বামপন্থী রাজনীতির বিস্তারে বাধা সৃষ্টি করায় সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সমাজের এই অবহেলিত অংশের বেশির ভাগই বামপন্থী রাজনীতির বাইরে থেকে গেছে। ফলে শ্রেণীচেতনার বিকাশ এই অংশের মধ্যে নিতান্ত খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, সমাজের অন্য অংশগুলি সামাজিক বাস্তবতার অভিঘাতে যখন নিজের থেকেই সচেতন হয়ে বামপন্থার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে, তখন এই অংশ নিদারুণ পশ্চাৎপদতায় তার কোন হদিশ করতে পারেনি। এটি হলো দলিত সমস্যার একটি দিক।

দলিত সমস্যার আরেকটি দিক যা গত কয়েক বছরে দেশের নানা স্থানে প্রকট হয়ে উঠেছে, যার চরম প্রতীকী প্রকাশ হলো আরওয়ালের বীভৎস হত্যাকাণ্ড, তার সূচনা স্বাধীনতা-উত্তরকালে। আপোষের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরে সমাজ-জীবনের গভীর যেসব সমস্যাগুলিকে তখনকার মতো চাপা দিয়ে রেখেছিল, এই বীভৎসা তারই অনিবার্য প্রকাশ।

ভারতীয় জনজীবনের সনাতনী ধারায় ধর্ম ও বর্ণের যেসব সংস্কার বদ্ধমূল হয়েছিল গান্ধী নেতৃত্বে কংগ্রেস সেইসব কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ না করে আপাতঃ বোঝাপড়ার এক পরিমণ্ডলে ক্ষমতা দখল করতে চায়। ভারতের শাসক শ্রেণীর স্বার্থে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পরিবর্তে দেশবিভাগ ও শ্রেণী সমঝোতার মূল্যে রাষ্ট্র-ক্ষমতায় গদীয়ান হওয়াটাই তার লক্ষ্য ছিল। দেশের বেশির ভাগ মানুষের মনে স্বাধীনতার অর্থ জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত, জাতীয় রাজধানী আর দেশী মন্ত্রী ও আমলা ছাড়া অন্য কিছু যে হতে পারে তার আভাসও দেওয়া হয়নি। মানুষ জাতীয় নেতৃত্বকে বিশ্বাস করেছিল এই ভেবে, এই ভরসা থেকে যে স্বাধীনতা আন্দো-লনের নানা পর্বে ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা এবং তিরিশের দশক থেকে বহুল প্রচারিত কর্মসূচী ও পরিকল্পিত বিকাশের পথ গ্রহণ করলে তাদের সমস্যার সবটুকু না হলেও অনেকখানি সমাধান হবে। স্বাধীনতা-উত্তর বছরগুলিতে সেই প্রত্যাশা ক্রমেই নির্মূল হতে থাকে। তবুও চেতনার মানে তারতম্য সেই হতাশাকে সহজে দেশব্যাপী বিক্ষোভে পরিণত হতে দেয়নি।

গ্রামীণ ভারতে স্বাধীনতা-উত্তরকালীন পরিবর্তনের ধাক্কা যখন তৃতীয় পরিকল্পনার শুরু থেকেই সংকটের চেহারা নেয়, ১৯৬৩ সালে লোকসভায় বিখ্যাত দারিদ্র সম্পর্কিত বিতর্কে নেহরু যখন স্বীকার করেন দেশে শিল্পায়ন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও ধনীরা আরো ধনী এবং গরিবরা আরো গরিব হচ্ছে, প্রায়

তখন থেকেই "দলিত" সংগ্রামের পটভূমি রচিত হয়। ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে দেশের কোন অংশে সবুজ বিপ্লব আর অন্যত্র কৃষি উৎপাদন ও বণ্টনের সমস্যা কৃষক সংগ্রামের এক বিস্তৃত প্রেক্ষিত গড়ে তোলে। "দলিত" চেতনার সেটাই ছিল গোড়াপত্তন।

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের কৃষক আন্দোলন স্বরাজ চেতনার সঙ্গে কৃষক সমস্যার প্রত্যক্ষ সম্পর্কের দিকটির প্রতি কংগ্রেস নেতৃত্বকে সচেতন করেছিল। তখন জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে এই সমস্যার সমাধানকে যুক্ত করতেও তাঁরা দ্বিধা করেননি। বস্তুতঃ ফৈজপুর কংগ্রেসে সভাপতিরূপে নেহরুর বক্তৃতায় সমাজতন্ত্রের যেসব কথা শোনা গিয়েছিল, তার পটভূমিতে শিল্পায়ন, জমিদারী প্রথা বিলোপ, কৃষককে জমির মালিক করার প্রতিশ্রুতি খুবই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। পঞ্চাশের দশকে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর বক্তৃতায় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গড়ার সংকল্প বারবার উচ্চারিত হতে থাকায় এমন বিশ্বাস গড়ে ওঠা স্বাভাবিক ছিল যে দেশে কায়েমী স্বার্থের অবসান ঘটবে। কিন্তু অসম্পূর্ণ ভূমি-সংস্কার, বিপুল ক্ষতিপূরণের ভিত্তিতে জমিদারী প্রথা বিলোপ, সরকারে ন্যস্ত জমি বণ্টনের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে ধনী ও মধ্য চাষীর স্তর সৃষ্টি, ভোট ব্যাঙ্ক রূপে তাদের উপর শাসক দলের নির্ভরতা গ্রামীণ ভারতে যে পরিবেশ গড়ে তোলে, সেখানে ছোট চাষী, বর্গা চাষী, ভূমিহীন ও খেতমজুরদের মধ্যে আশাহত বিক্ষোভ বাড়াতে থাকে। তার সঙ্গে যুক্ত হয় বর্ণ ও ধর্মের সমস্যা।

গান্ধী সমাজের অচ্ছুৎ জনগোষ্ঠীকে হরিজন নাম দিয়ে মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু সংস্কার করে, তাদের বৃহত্তর হিন্দু সমাজের অংশ হিসাবে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। তিরিশের দশকের মাঝামাঝি থেকেই মুসলিম লীগের স্বাতন্ত্র্যবাদী আন্দোলনের মুখে বর্ণহিন্দু সমাজও রাজনৈতিক প্রয়োজনে গান্ধীর নীতি মেনেছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগে সেই প্রয়োজনের অবসান ঘটে। তারপর স্বাধীন ভারতে জনগণের সুপ্ত প্রত্যাশার বিস্ফোরণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জমিতে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকায় ধনী ও মধ্য চাষীর সঙ্গে ছোট ও বর্গাচাষী এবং ভূমিহীন ও খেতমজুরের দ্বন্দ্ব বাধতে থাকে। গ্রামীণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অচিরে সেই দ্বন্দ্ব বর্ণ ও জাতিভেদের সমস্যারূপে আত্মপ্রকাশ করে। দলিত রাজনীতি হলো তারই আধুনিক রূপ।

ভারতীয় রাজনীতিতে বর্ণ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়নি। বরং আদিবাসী, হরিজন প্রভৃতি অনুন্নত স্তরের মানুষ অনেক প্রত্যাশা নিয়ে দীর্ঘকালীন বঞ্চনার পর যখন নিছক আত্মরক্ষার তাগিদে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করেছে তখনই গ্রামীণ কায়েমী স্বার্থ বর্ণ ব্যবস্থাকে হাতিয়ার করে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। জাতপাতের রাজনীতি এই ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে গড়ে ওঠায় এই সংকট থেকে পরিত্রাণের কোন সহজ পথ আর খোলা নেই। সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের ব্যর্থতার কথাও

প্রসঙ্গতঃ অস্বীকার করা যায় না। তিরিশের দশকের মাঝামাঝি যাঁরা দেশে কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলায় এবং সারা ভারত কিসান সভা প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যেমন বিহারের স্বামী সহজানন্দ, বর্ণ ব্যবস্থার বিলোপ ঘটানোর জন্য কৃষক সমাজের মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তোলার দিকে তাঁরা নজর দেননি। স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যাপক গণসংগ্রামের রূপ নিলে, শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক অনুধাবনের মাধ্যমে যে শ্রেণীচেতনা গড়ে উঠতে পারতো, এদেশে সেটাও অপরিণত, দুর্বল থেকে গেছে।

মানুষের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য যে শ্রেণীচেতনার বিকাশ ঘটায় না, তার জন্য দরকার সংগ্রাম ও সচেতন প্রয়াস, আজকের সমস্যা সেই মৌল সত্যকে তুলে ধরেছে। ভারতের মতো বিরাট, জনবহুল ও বৈচিত্র্যময় দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রসার পাশাপাশি চলার যে প্রয়োজনীয়তা ছিল, আপোষে ক্ষমতা হস্তান্তরের রাজনীতি তাকে বাস্তবায়িত হতে দেয়নি। তাই মেহনতী মানুষের ব্যাপক ঐক্যের ভিত্তিতে সামাজিক প্রগতির লড়াই দেশব্যাপী কোন জোয়ার সৃষ্টি করতে পারছে না। এই ব্যর্থতার ঐতিহাসিক কারণ যাই থাক, কমিউনিস্ট ও বামপন্থী আন্দোলন তার দায়ভাগ অস্বীকার করতে পারে না।

সেই অবস্থার সুযোগ নিয়ে, বস্তুতঃ গণতান্ত্রিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করার জন্যই কায়েমী স্বার্থের নানা প্রতিভূরা সমাজের অনুন্নত অংশের চেতনার নিম্ন মানকে কাজে লাগিয়ে মেহনতী মানুষের ব্যাপক ঐক্যকে ব্যাহত করছে। দলিত রাজনীতি হলো তারই প্রকাশ। আসলে এদেশে যে ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়ে গেছে, যার প্রথম ধাপ হিসাবে যে গণতান্ত্রিক অগ্রগতি ঘটানো দরকার তার গোড়াপত্তন হতে পারে শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রীতে। সেখানে দলিত রাজনীতি কৃষক সমাজের একটি সচেতন অংশকে সেই মৈত্রীর পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে তৎপর। সন্দেহ নেই যে কৃষক সম্প্রদায়ের একান্ত নিজস্ব কোন সমস্যা যদি থেকে থাকে, তাহলে তার সমাধান তাদের নিজেদেরই খুঁজে বের করতে হবে। সেটা হবে সামূহিক সামাজিক অগ্রগতির একটি দিক মাত্র। কিন্তু যেসব সমস্যার সমাধানের সঙ্গে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ জড়িত, সমাজের ব্যাপক পরিসরে যার মোকাবিলা করা না গেলে কোন কার্যকর সমাধান অসম্ভব, সমাজের এই পিছিয়ে পড়া অংশকে স্বাতন্ত্র্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তার সমাধান করা যাবে না।

ভারতের কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন যেমন সমগ্র ভারতীয় অর্থনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে গ্রথিত তেমনি কৃষক সমাজের পরিবর্তনও সামাজিক রূপান্তরের সঙ্গে জড়িত। দলিত রাজনীতি মানুষের সঙ্গত বিক্ষোভের সুযোগ নিয়ে সেই লক্ষ্য থেকে কৃষক সমাজকে সরিয়ে রাখতে চায়। বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে অত্যন্ত জরুরী লড়াই সম্পর্কে সেই একই কথা খাটে। প্রগতিশীল মানুষ, গণতান্ত্রিক আন্দোলন যেমন এই সমস্যাকে উপেক্ষা করতে পারে না, তেমনই অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এই ব্যাপক পর্যায়ের পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত করতে না পারলে তার কোন

স্থায়ী সমাধানও সম্ভব নয়। সমস্ত বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষের সমবেত উদ্যোগেই তার সমাধানের পথ প্রশস্ত হতে পারে।

হরিজন, আদিবাসী, গিরিজন ও নানা অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষদের সমাজের অপেক্ষাকৃত অগ্রণী অংশের সমপর্যায়ে উন্নীত করার জন্য যে ধরণের বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যেমন আসন সংরক্ষণ, তেমনই যাতে সংরক্ষণ নীতি কোন কায়েমী স্বার্থের জন্ম না দেয় কিংবা শাসক শ্রেণীকে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিরুদ্ধে এই সম্প্রদায়কে ব্যবহার করার সুযোগ না দেয়, সমাজের বৃহত্তর স্বার্থেই সেদিকে নজর রাখতে হবে। দলিত রাজনীতি সমস্যার গভীরতা বোঝার জন্য প্রাসঙ্গিক হলেও তার অন্তর্নিহিত বিভেদের শক্তি সম্পর্কে সতর্ক না থাকলে গ্রাম ও শহরের বিরোধ, আসলে কায়েমী স্বার্থের বিরোধী শক্তিগুলিকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে। সমকালীন ভারতে সেই সম্ভাবনাও যথেষ্ট রয়েছে। শারদ যোশী প্রমুখদের কৃষক স্বার্থরক্ষার আন্দোলনে তার স্বরূপ ধরা পড়ে।

ভারতে সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রী এবং সমস্ত মেহনতী মানুষের ঐক্যের কোন বিকল্প নেই। সেই ঐক্য দরকার কায়েমী স্বার্থ, দেশী ও বিদেশী পুঁজি, বিকাশমান ব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত চক্রান্ত মোকাবিলা করার জন্য। দলিত রাজনীতি সেই ঐক্যকে আঘাত করে বলেই পরোক্ষে কায়েমী স্বার্থের পোষকতা করে।

বর্ণ, বর্গ, মার্কসবাদ : মুক্তির পথ নবদলিত বিপ্লব ?

এ. কে. রায়

ভারতবর্ষের মাটিতে মার্কসবাদের যথার্থ প্রয়োগ সম্বন্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টি তথা সমাজবিজ্ঞানী নানাপ্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনটাই সফল হতে পারেনি। এর ফলে শাসক শ্রেণীর অনেক দুর্বলতা এবং অন্তর্বিরোধ থাকা সত্ত্বেও বিকল্প হিসেবে কম্যুনিস্টরা সামনে আসতে পারেনি বরঞ্চ যেন আরও পিছিয়ে যাচ্ছে। আজ কেন্দ্রে কংগ্রেসের বিকল্প জনতা কিংবা জনমোর্চা কম্যুনিস্টরা নয় যদিও বিশ বৎসর আগে লোকেরা তাই ভাবতো। মার্কসবাদী রাজনীতির সফলতা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং রাজসত্তার সাথে তার সম্বন্ধের সঠিক মূল্যায়নের উপর নির্ভর তাই সন্দেহ হয় এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই কিছু বড় ফাঁক থেকে যাচ্ছে যেটা তার অসফলতার কারণ। ভারতীয় সমাজে একই সঙ্গে তিনপ্রকার অর্থব্যবস্থা দেখা যায় : সামন্তী পুঁজিবাদী এবং ঔপনিবেশিক। তারা কোথাও আলাদাভাবে, কোথাও একে অপরের সাথে জড়িয়ে আছে। অন্ধের হস্তিদর্শনের মত ভারতীয় সমাজের চিত্রণ সব সময়েই একাঙ্গী থেকে গেছে কারণ তিনপ্রকার শোষণ ব্যবস্থা একসাথে ধারণ করে রাখবার বিশেষ কাঠামো এদেশের বর্ণব্যবস্থাকে কখনই এদেশের কম্যুনিস্টরা যথাযথ গুরুত্ব দিতে পারে নি।

ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী কালো কিংবা সাদা, ছোট কিংবা বড় এদেশের রাজনীতির উপর তার প্রভাব কম যেটা নিয়ে কম্যুনিস্টরা আজ পঞ্চাশ বৎসর ধরে অন্তহীন এবং অর্থহীন বিতর্ক চালিয়ে যাচ্ছেন। এদেশের রাজনীতিতে যেটা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে সেটা হচ্ছে বর্ণব্যবস্থার উপর ভিত্তি করা এখানের সমাজ এবং তার উপর উপর থেকে চুইয়ে পড়া পুঁজিবাদের প্রভাব যেটা বিভেদের প্রাচীরকে আরও পোক্ত করে দেশকে সামাজিক এবং আঞ্চলিক দুইদিক দিয়েই অসমান বিকাশের বিভিন্ন খণ্ডে ভাগ করে দিয়েছে। এখানে অগ্রসরবর্গ ঔপনিবেশিক, অনগ্রসর বর্গ সাম্প্রদায়িক—এর মাঝখানে মার্কসবাদের স্থান কোথায়? উপর থেকে থোপা পুঁজিবাদের বিকৃত প্রভাব সমাজে পরিবর্তনকারী শ্রেণীসংগ্রাম সৃষ্টি করে না, বিঘটনকারী সাম্প্রদায়িক সমস্যা সৃষ্টি করে যার রূপ আমরা পাঞ্জাব থেকে আসাম, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী দেখতে পাচ্ছি।

ইউরোপে প্রথমে ধর্মীয় সংস্কার এসেছিল, তার পর শিল্পবিপ্লব এবং শেষে রাজনৈতিক পরিবর্তন। মার্টিন লুথর, স্টিভেনসন এবং তারপর রুশো ভলটেয়র, মার্কস গণতন্ত্র, জনবাদ, সমাজবাদ ইত্যাদির চিন্তন ক্রমশঃ এইভাবেই পরিস্ফুট হয়েছিল। কিন্তু ভারতে ইতিহাস এরকম ক্রমবদ্ধরূপে বিকশিত হতে পারেনি।

আজকে এর পুনরাবৃত্তি সম্ভবও নয়। এর প্রথম কারণ ঐতিহাসিক। যে যুগে ইউরোপে যুক্তিবাদ এবং বিজ্ঞানের প্রসার হয়েছিল তারও ঐ সময়ে উপনিবেশ ছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এখানের অন্ধবিশ্বাস এবং রক্ষণশীলতার সাথে আপোস করেই রাজত্ব করতে চেয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদীরা শাসন করতে এসেছিল, সংস্কার করতে নয়। তা সত্ত্বেও সংস্কারের প্রচেষ্টা হয়েছিল। রামমোহন, বিবেকানন্দ, ফুলে, সৈয়দ আহমদ, দয়ানন্দ প্রমুখ এসেছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রচার এক সীমা পর্যন্ত এসেই থেমে গিয়েছিল। সমাজের কিছু উপরের অংশ রঙ বদলালো, কিন্তু সমাজকে গভীরভাবে আলোড়িত করতে পারলো না। এক সামন্তী এবং ঔপনিবেশিক শোষণের সঙ্গে আপোস করে এক মেরুদণ্ডহীন পুঁজিবাদের বিকাশ শুরু হল, যা কোন সামাজিক বিপ্লবের বাহন হতে পারলো না। কম্যুনিস্ট ঘোষণাপত্রে মার্কস পুঁজিবাদের এক বিপ্লবী ইতিবাচক ভূমিকার ব্যাপারে লিখেছিলেন যেটা অতীতের সমস্ত সামন্তী অন্ধবিশ্বাস তথা কূপমণ্ডূকতাকে ভেঙ্গে মানবপ্রতিভার বিকাশের এক মহত্বপূর্ণ মার্গকে যুক্ত করেছিল। কিন্তু ভারতে এরকম কিছুই হয়নি। বরঞ্চ এখানে সমস্ত সামন্তী পরম্পরা এবং সংস্কারের সাথেই উপর থেকে পুঁজিবাদী বিকাশ শুরু হল। এক সামন্তী শরীর পুঁজিবাদী পোষাক পরেন। কেউ লালটুপি পরে নিজেকে সমাজবাদী এমনকি মার্কসবাদী বলেও ঘোষণা করলো। কিছু সব জায়গায় দ্বৈত চরিত্র থেকে গেল। আজ তাই আমরা এমন রাষ্ট্রবাদী পাই যিনি সবকিছুই বিদেশী পছন্দ করেন, এমন সমাজবাদী পাই যিনি জাতপাত মানেন, এমন মার্কসবাদী পাই যিনি পণ লেনদেন করেন। ঘরে পুজা করেন, বাহিরে নাস্তিক। চাই মহিলা রাজনীতি করে কিন্তু নিজের স্ত্রী নয়। বহুদিন আগে যেটা নিয়ে ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা হ্যারি পলিট কলকাতায় ঠাট্টা করেছিলেন। সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের এই বিরোধ আজ বিকট হয়ে সমস্ত স্বাভাবিক বিকাশের বাধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিচার এবং আচার, কথা এবং কাজ, আদর্শ এবং উদ্দেশ্যর মধ্যে ফাঁক আজ সমস্ত রাজনীতিকেই নীতিহীন করে দিয়েছে। আমাদের ধর্ম-নিরপেক্ষতাও আজ ঈশ্বরের রাজনীতির উপর আশ্রিত যার বিষবৃক্ষ আমরা মুর্শিদাবাদের কাটরা মসজিদ থেকে অযোধ্যার রামজন্মভূমি—বাবরি মসজিদের বিরোধের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।

ভারতের সমাজের স্বাভাবিক বিকাশ না হওয়ার দ্বিতীয় কারণ এখানকার বর্ণ-ব্যবস্থা যার কোন তুলনা পৃথিবীর কোন সমাজে নাই। এটা মনে রাখার যোগ্য যে বর্ণব্যবস্থা শুধু কোন সামন্তী সংস্কার কিংবা বৃত্তিগত বাঁটোয়ারা নয় বরঞ্চ এক ধর্মীয় মান্যতার সাথে সমাজের মধ্যে শ্রমবিভাজন যেটা শারীরিক এবং উৎপাদক শ্রমকে সবসময় হেয় দৃষ্টিতে দেখেছে। সমাজের বর্ণব্যবস্থায় কোন মানুষের স্থান আজও শারীরিক শ্রমের প্রতি তার মনোভাবের প্রতীক। বর্ণসোপানকে কেন্দ্র করে ভারতের সামন্তী ব্যবস্থা পৃথিবীর সবথেকে কুশল সামন্তী শোষণব্যবস্থা ছিল। মনুসংহিতার

সামাজিক মান্যতা এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের উপর দাঁড়িয়ে এ ব্যবস্থা ঐ সময় শুরু হয়েছিল যখন পৃথিবীতে অন্য জায়গা দাসব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে পার হচ্ছিল, এবং এ ব্যবস্থা আজও টিকে আছে যখন পৃথিবীর এক বড় অংশে সমাজবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ভারতের মধ্যেও দুই রাজ্যে মার্কসবাদীরা শাসন করছে। আজ থেকে কয়েক হাজার বৎসর আগে লেখা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে এক বিরাট পুরুষের কল্পনা আছে। যার মাথা থেকে ব্রাহ্মণ, ভুজ থেকে ক্ষত্রিয়, পেট থেকে বৈশ্য এবং পা থেকে শূদ্রের জন্ম হয়েছিল। এটা বর্ণ এবং বর্গের সম্বন্ধ স্পষ্ট করে। ভাগ্য নিহিত হয়ে আছে। তাকে শুধু স্বীকার করতে হবে। সমস্ত সংরক্ষণ এবং বড় বড় আদর্শের কথার পরেও আজও সমাজের মধ্যে এই চিত্র পাই যেখানে উচ্চপদে উচ্চবর্ণের ভরসার এমন কি কম্যুনিস্টপার্টির মধ্যেও। সেনাপুলিশে ক্ষত্রিয়। জগজীবন রাম রক্ষামন্ত্রী হতে পারে কিন্তু রাজপুত ব্রিগেডের মত চামার ব্রিগেড হতে পারে না। ব্যবসা বাণিজ্যে বৈশ্যরা আছে। আর সব থেকে নীচে চতুর্থবর্গের কর্মচারী কিংবা খেতমজদুর হরিজন আদিবাসীরা। এটা শুধু হিন্দুধর্মের মধ্যেই নয়। মাটির এমনি গুণ এটা মুসলমান, খ্রীস্টান, শিখ সমাজের মধ্যেও পাই যেখানেও সংরক্ষণের জন্য দাবি আছে। ডাঃ আম্বেদকর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেও সমাজে মাহারদের স্থান বদলাতে পারেননি। কোলিয়ারী, কলকারখানাতেও একই চিত্র। খনির মধ্যে কয়লা কাটার কঠিন কাজে হরিজন আদিবাসী, কিন্তু অফিসের বাবু কিংবা কোলিয়ারীর ম্যানেজার আজও উচ্চবর্ণের। অ্যান্থ্রোপলজিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া (Anthropological Survey of India—ASI) রিপোর্টে আছে, জমি আজও উচ্চ-বর্ণের হাতে কিন্তু চাষ করে বর্ণসোপানে যারা নীচে তারা। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় চিত্রটা কিছুটা পালটাচ্ছিল এবং শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল সমাজে। কিন্তু স্বাধীনতার পরে বিদেশী পুঁজির এবং কম্পুটার সংস্কৃতি আবার পরজীবী সমাজের সাম্রাজ্যকে মজবুত করে দিয়েছে। বোফর্স এবং ও এন. জি. সি.-এর কমিশনের দুর্নীতি নিয়ে যে আলোচনা চলছে সেটা উন্মুক্ত অর্থনীতির একটা ছোট দিক। সবথেকে বড় দুর্নীতি এটা শ্রম এবং উদ্যোগের সংস্কৃতি থেকে সরিয়ে সমস্ত সমাজকেই পরাশ্রয়ী মেরুদণ্ডহীন তথা চরিত্রহীন করে দিয়েছে।

ভারতে তাই কোন সমাজবিপ্লবের অভাবে বর্ণব্যবস্থাকে ভেঙে বর্গব্যবস্থা হয়নি। বর্ণব্যবস্থাই কিছু উপরের পরিবর্তনের সাথে আজকের বর্গব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্গ এবং বর্ণ সমার্থবোধক। শুধু তাই নয় বর্ণের নামে অত্যাচার দমন বর্গের নামে অত্যাচার দমনের থেকে অনেকগুণ বেশী। বোম্বাই-এর লক্ষ কাপড়ের কলের মজদুরের লম্বা লড়াইয়ে কারুর প্রাণহানি হয়নি কিন্তু এর থেকে অনেক কম লড়াইয়ে পাশের থানে এলাকাতে অনেক আদিবাসীর প্রাণ গিয়েছে কিংবা আজকের বিহারের জাহানাবাদে। আশ্চর্য নাই যখন পণ্ডিত নেহেরু চীন গিয়েছিলেন মাও জে দঙ প্রথমেই জানতে চেয়েছিলেন কি করে তিনি ভারতে জটিল বর্ণ এবং

জাতিসমস্যার সমাধান করছেন যেটা সপ্তম লোকসভাতে মণ্ডল কমিশনের উপর ভাষণে শ্রীবলিরাম ভগৎ জানান যিনি ঐ সময় নেহেরুর সাথে ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদীরা গর্ব করে থাকেন যে ভারতবর্ষের এ রাজ্যে জাতপাতের প্রভাব রাজনীতিতে নাই। কথাটা সত্যি নয়। পশ্চিমবাঙ্গলাতেও কোন ব্রাহ্মণ জমিতে লাঙল দেন না এবং কোন হরিজন কোন রাজনৈতিক পার্টির নেতা নয়। যে যাদুর বলে রাজত্ব করবার সমস্ত প্রতিভা শুধু উচ্চবর্ণেই সীমাবদ্ধ সে যাদু পশ্চিমবাঙ্গলাতেও কাজ করছে। শুধু পার্থক্য একটাই, এখন সবাই কিছু নরম হয়ে সীমার মধ্যে চলে আর উচ্চবর্ণের বিষদাঁত পার্টিসনের কারণ ভাঙ্গা যেটা একটা অদৃশ্য সমাজবিপ্লবের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে। তাহলেও এই আংশিক সমাজবিপ্লব যে কারণেই হোক বামপন্থী রাজনীতিকে সাহায্য করেছে কিন্তু এটা পাশের বিহার এবং উড়িষ্যাতে ছড়াতে পারেনি কারণ দেশ বিভাগ শুধু পশ্চিমবঙ্গকেই প্রভাবিত করেছিল অন্যদের নয়। এইরকম কেরলেও পারিপার্শ্বিক অর্থনৈতিক চাপেই সামন্তী তথা সামাজিক কূপমণ্ডুকতা নষ্ট হয়েছে সেটা বামপন্থী রাজনীতির বিকাশের পক্ষে সাহায্য করেছে যেটা পাশের রক্ষণশীল কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ুতে সম্ভব হয়নি। বরঞ্চ সেখানে সমাজবিপ্লব জাতপাতের লড়াই-এর মধ্যে দিয়ে চলেছে যেটা দ্রাবিড় কিংবা আঞ্চলিক রাজনীতিকে সাহায্য করেছে। পাঞ্জাবের বিভাজনের ফল ধর্মীয় মৌলবাদীরা উঠিয়েছে। তাই সামাজিক বিপ্লব রাজনৈতিক শক্তির সবথেকে বড় উৎস। যারা তার নেতৃত্ব দিবে তারা রাজনীতিরও নেতা হবে। যে সামাজিক বিপ্লবের স্পষ্ট কোন নেতা নাই সেখানে বামপন্থী রাজনীতি স্বাভাবিক রূপেই বিকশিত হবে যেটা এ সত্যকে সামনে নিয়ে আসে যে বামপন্থীরা যদি সামাজিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে হাত বাড়ায় সেটা এ রাজনীতিকে কত দ্রুত ভারতের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। অর্থাৎ মার্কসবাদের স্বাভাবিক উদ্গমের মাটি পূর্ণাঙ্গ সমাজবিপ্লবের দ্বারাই তৈরী হতে পারে।

আজকের রাজনীতিতে এ সমস্যার প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে এটা উল্লেখযোগ্য যে পুরনো সামন্তী অবধারণার বর্ণব্যবস্থা সময়ের কঠিন ঘর্ষণে আজ ক্ষয়ের মুখে কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নতুন কাঠামোতে এটা যেন নতুন রূপ নিয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে সামনে এসেছে। অন্তভঃ এই ভোটের রাজনীতিতে। এই 80 বৎসর স্বাধীনতার পরে মানুষ যেন আরও জাতিসচেতন হয়ে জাতি পরিচিতি আবিষ্কার করতে লেগেছে। ১৯৫৩ সালের কাকা কালেলকরের ব্যাকওয়ার্ড কমিশনে ২৩৯৯ জাতির নাম ছিল। ১৯৮০ সালে মণ্ডল কমিশনে জাতির সংখ্যা কমার বদলে বেড়ে 8000-এর বেশী হয়ে গিয়েছে। আবার ব্যাকওয়ার্ডের মধ্যে ব্যাকওয়ার্ড তৈরী হচ্ছে। সংরক্ষণের মধ্যে সংরক্ষণের। কেউ জানে না এ বিভাজনের শেষ কোথায়। অর্থাৎ নিচে থেকে সামাজিক বিপ্লব না হলে উপর থেকে কোন সংস্কার এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিভেদের প্রাচীরকে আরও শক্তিশালী করবে এবং আজ করছেও। রাজনীতিতে আজ ব্যাকওয়ার্ড এবং

ফরোওয়ার্ড বাম এবং দক্ষিণের থেকে বেশী অর্থবহ। সমাজে জাতপাতের প্রত্যাবর্তন শ্রমের মর্যাদা যাও একটু প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল তাকে পিছে ঠেলে দিয়েছে। আমাদের দেশে অনেক কিছুর বিভাজন আছে। কিন্তু সবথেকে বড় বিভাজন রাজনীতির সাথে কাজনীতির। রাজশক্তির সাথে শ্রমশক্তির। এখানে যারা রাজ করে তারা কাজ করে না, যারা কাজ করে তারা রাজ করে না। এটা মজদুর কিসান, অফিসার, মালিক সবার ক্ষেত্রেই সত্যি। আজকের রাজনীতির মূল অন্তর্দ্বন্দ্বই এসে দাঁড়িয়েছে উৎপাদক এবং অনুৎপাদক বর্গের মধ্যে এবং এই অনুৎপাদক বর্গের রাজনীতিই সমাজে মস্তান, মাফিয়া, আতঙ্কবাদী, সমাজবিরোধীদের নগ্নভাবে নেতৃত্বে নিয়ে এসেছে। আজ শ্রমজীবী রাজনীতিও পরজীবী বর্ণের হাতে যেটা রাজনীতিতে পরাশ্রয়ী পুঁজিবাদের আশ্রয়ে নতুনভাবে শক্তিশালী উচ্চবর্ণের প্রভাবের ফল। লেনিনের কথায় কারখানার শ্রেষ্ঠ কর্মীই সেখানকার ইউনিয়নের নেতা হতে পারে। যে কর্মে নিষ্ঠ সেই কম্যুনিষ্ট। কিন্তু আজ মার্কসবাদীদের দ্বারা পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গেও কাজ করতে বলাই এক "প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত" কিংবা কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ। তাই লক্ষ ক্যাডার থাকা সত্ত্বেও কাজের লক্ষ্যে কোন প্রগতি নাই মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু চাইলেও। আজ শুধু তেলে নয় সর্বক্ষেত্রেই দুনম্বরী তত্ত্বের আধিপত্য। দুনম্বরের পুঁজিপতিরা ফোকটের পরগায় আজ ফিকির (Ficci) উপরও প্রভাব জমিয়ে নিয়েছে। পুঁজিবাদ, সমাজবাদ কিন্তু সবার উপরে আজ 'ফাঁকিবাদ' যেটা পুঁজিবাদী নব্য বর্ণব্যবস্থার দান। সংসদীয় কম্যুনিস্ট পার্টির বর্ণের দরজা পার হতে পারেনি। অসবর্ণ বিবাহ কম, খেটে যাওয়ার মানসিকতা আরও কম। কিন্তু বিপ্লবী নকশালরাও এর প্রভাব কাটাতে পারেনি। তাই উচ্চবর্ণের নকশাল মাছ অনেক চেষ্টার পরেও দলিত বর্ণের ঠাণ্ডা জলের মধ্যে বেশীদিন থাকতে পারেনি বেরিয়ে এসে শহরে ধরা পড়েছে। একজন নেতা তো ধরা পড়লো স্টেশনের কাছে চা খেতে গিয়ে। বিপ্লব অপেক্ষা করতে পারে কিন্তু চা নয়। লেনিন পেশাদার বিপ্লবীর কথা বলেছিলেন। কিন্তু চিরন্তন পরজীবী সমাজের কথা তাঁর জানা ছিল না। আর পরজীবী পুঁজিবাদ বিদেশের মদতে কিছুদিন টিকে থাকলেও পরজীবী মার্কসবাদ একদিনও নয়। তাই এক বড় সামাজিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে বর্ণব্যবস্থাকে ভেঙে শ্রমের মর্যাদাকে যদি রাজনীতির কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত না করা যায় তবে মার্কসবাদের শিকড় এদেশের মাটিতে কখনই বসতে পারে না। আর আজকে এই সামাজিক বিপ্লবের নেতৃত্ব বুর্জোয়া শ্রেণী দিতে পারে না এটা মার্কসবাদীদের নেতৃত্বে উৎপাদকবর্গকে করতে হবে। কম্যুনিস্ট জনবাদী কিংবা নবজনবাদী বিপ্লবের কথা বলেন যেটা পুঁজিবাদী এবং সমাজবাদী বিপ্লবের যোগফল। কিন্তু ভারতবর্ষের বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে এটা এক সামাজিক এবং সমাজবাদী বিপ্লবের যোগফল হবে যাকে আমরা নবদলিত বিপ্লব সংজ্ঞা দিতে পারি যেটা এদেশে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এক রূপ হবে।

অস্পৃশ্যতা ও রাজনীতি

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

শুচি-অশুচির ভাব সব সমাজে সর্বকালেই আছে। কিন্তু হিন্দুসমাজে শুচি-অশুচি বোধ অতিশয় প্রবল ও ব্যাপক। অস্পৃশ্যতার অমানবিকতা এরই পরিণাম। উচ্চজাতির মানুষ, এমনকি ব্রাহ্মণও অবস্থাবিশেষে শুধু অশুচি নয়, অস্পৃশ্যও হতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ উচ্চজাতির লোক শুচি। অস্পৃশ্যরা বিশেষ কোন উপলক্ষে কদাচিৎ শুচি বলে গণ্য হতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ তাকে অশুচি বলেই ধরা হয়। শুচি-অশুচি বোধ হিন্দুদের বাহ্যিক ধর্মাচরণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই অস্পৃশ্যতার গ্লানি হিন্দুধর্মীয় আচরণ থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়। শুচি ও অশুচি, মান্য ও হেয় বিভিন্ন জনগোষ্ঠী নিয়ে বিশাল হিন্দুসমাজ গঠিত। সামাজিক দিক থেকে যে অশুচি ও হেয় ধর্মাচরণের ক্ষেত্রেও সে হীন ও নীচ, হিন্দুসমাজ বরাবর এই নীতি মেনে চলেছে।

হিন্দুসমাজের মূল সংগঠন জাতিব্যবস্থা। জাতিব্যবস্থার ভিত্তিতে গঠিত সমাজ সমবায়মূলক। জাতিব্যবস্থায় উচ্চনীচভেদ তীব্র। কিন্তু জাতিভিত্তিক সমাজ নির্বাহের ব্যাপারে মান্য ও হেয় উভয়েরই ভূমিকা ছিল এবং সামাজিক ধনে উচ্চনীচ সকল জাতিরই কমবেশী অধিকার স্বীকৃত। অস্পৃশ্যকেও তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা চলত না, করলে তা অধর্ম বলে গণ্য হত। মান্য ও হেয় জাতিসমূহ অন্নসূত্রে এবং সামাজিক ব্যবহার ও ধর্মাচরণের সূত্রে পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্কে বাঁধা থাকত। অবমাননা সত্ত্বেও অস্পৃশ্যরা যে জাতিব্যবস্থা মেনে চলত এটা তার অন্যতম প্রধান কারণ। নির্মলকুমার বসু এই সিদ্ধান্ত করেছেন।

এর আর একটা কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে। জাতিব্যবস্থার মূল কাঠামো থাকবন্দী, নীচে ওপরে (বা অপরে নীচে) ধাপে ধাপে বাঁধা। ধাপ বেয়ে নীচের জাতি ওপরে উঠতে পারত। জাতিব্যবস্থায় মানুষের পরিচয় নির্ধারিত হয় বৃত্তি দিয়ে। যার বৃত্তি হীন ও অশুচি জাতি পরিচয়ে সে নীচ। বৃত্তির শুচিতা অধিকতর হলে সংশ্লিষ্ট জাতির মর্যাদাও বেশী হয়। বৃত্তির শুচিতা বা অশুচিতার পরিমাণ অনুযায়ী জাতিবিশেষের সঙ্গে অপরাপর জাতির সম্পর্ক ধার্য হয়। কোন জাতি বা জাতির অংশবিশেষ যদি আদি বৃত্তি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে নূতন বৃত্তি অবলম্বন করতে পারে তবে তার সঙ্গে অন্যান্য জাতির সম্পর্কও বদলে যায়। এটাই তার নূতন সামাজিক পরিচয়ের সূচনা। নূতন বৃত্তি যদি আদি জাতিবৃত্তির তুলনায় অধিকতর শুচি হয় তা হলে নূতন বৃত্তিধারী জাতি বা জাতিখণ্ড উচ্চতর মর্যাদা লাভের যোগ্য হয়ে ওঠে। যাদের বৃত্তি পরিবর্তন সম্পূর্ণ হল না বা নূতন বৃত্তির শুচিতা আগের তুলনায় খুব বেশী নয় তারা স্বজাতির মধ্যে উচ্চতর মর্যাদা লাভ করতে পারে।

নূতন বৃত্তিতে বৈষয়িক উন্নতির সম্ভাবনা থাকলে সংশ্লিষ্ট জাতি বা জাতিখণ্ড জাতিব্যবস্থার ধাপ বেয়ে অনেকটা উঁচুতে উঠতে পারে। অগ্রগামী জাতি বা জাতিখণ্ড নূতন বৃত্তিতে বসে আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনীতিক প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন করতে পারলে উচ্চনীচ সকল জাতিই তখন তাকে সমীহ না করে পারে না। এই অবস্থায় উচ্চজাতির রীতি অনুযায়ী আচার আচরণ সংস্কার করে আনুষ্ঠানিক শুচিতা জ্ঞাপন করতে পারলে অগ্রগামী জাতি বা জাতিখণ্ড উচ্চতর জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে। অজলচল জাতি, এমনকি জাতিব্যবস্থা বহির্ভূত কোম জনগোষ্ঠীও এইভাবে জলাচরণীয় জাতি এবং আরও ওপরে ক্ষত্রিয় বলেও স্বীকৃতি পেয়েছে। বাঙলা বিহার সীমান্তবর্তী মানভূমি অঞ্চলের ভূমিজ কোম জনগোষ্ঠীর ভূম্যধিকারীগণ এবং তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের ক্ষত্রিয়ত্বলাভ উপর্যুক্ত প্রক্রিয়ার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

হিন্দুসমাজে শুচিতার প্রশ্ন খুব বড় বলে নিম্নতর জাতিসমূহ, এমনকি অস্পৃশ্যদের মধ্যেও বৃত্তি ও আচার-আচরণের তারতম্য অনুসারে উচ্চনীচ ভেদ দেখা যায়। বাঙলায় অস্পৃশ্য জাতিগুলির মধ্যে হাড়ির স্থান সবার নীচে। জাতিবিশেষের মধ্যে অভ্যন্তরিক উচ্চনীচ ভেদ সৃষ্টি হয়। জাতিবিশেষের একাংশ বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও শুচিতায় উন্নততর হলে শ্রেষ্ঠতাভিমানবশতঃ স্বজাতির মধ্যে উচ্চতর মর্যাদাবিশিষ্ট জাতিখণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছে। হাড়ি জাতি ধাঙড় বলে পরিচিত। হাড়িদের একটা অংশ ধাঙড় বৃত্তি ত্যাগ করেছে। পাইক বরকন্দাজের চাকরী, পাল্কি বহন এবং বিবাহাদি অনুষ্ঠানে ঢোল, সানাই বাজান এদের বৃত্তি। হাড়িদের এই জাতিখণ্ডের নাম কেওরা পাইক। হাড়ি জাতির মধ্যে কেওরা পাইকের স্থান সর্বোচ্চ। হাড়িমধ্যে সর্বনিম্ন পদ মেথর নামক জাতিখণ্ডের। ময়লা সাফ করা বৃত্তি বলে মেথররা হাড়িসমাজে সবচেয়ে অশুচি বলে গণ্য। কেওরা পাইকরা মেথরদের সঙ্গে ক্রিয়াকর্মে কোন সম্পর্ক রাখে না। ভুঁইমালী জাতির ছোট ভগিয়া জাতিখণ্ডও বৃত্তিতে ধাঙড়। কিন্তু ছোট ভগিয়া ভুঁইমালীরা মেথরদের হীন বলে মনে করে। ছোট ভগিয়াদের বক্তব্য এই যে মেথরদের শুচিতাবোধ নাই। তারা কাজকর্ম শেষে স্নান করে পরিষ্কার হয়ে তবে বাড়িতে ঢোকে। কিন্তু মেথররা কাজ থেকে বাড়ি ফেরবার আগে স্নান করে না। অতএব ছোট ভগিয়া ভুঁইমালীর চোখে মেথর অশুচি। আসলে ছোট ভগিয়া ভুঁইমালীর অবস্থা একটু ভাল। কর্ম শেষ হলে স্নান করে উঠে পরবার মতো বাড়তি কাপড় জোটাবার সঙ্গতি তাদের আছে, মেথরদের তা নেই। দেখা যাচ্ছে বস্তুগত উন্নতি হলে এবং শুচিতা বৃদ্ধি পেলে নিম্নতর জাতির লোকে জাতিব্যবস্থার মধ্যে এবং জাতিপ্রথার রীতি অনুসারে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতিলাভ করতে পারে। বস্তুগত উন্নতি ও জাতিগত মর্যাদার মধ্যে অসঙ্গতি নিরসনের এইসব উপায় ছিল বলে নিম্নতর জাতির লোক ক্ষমতাবান হলেও জাতিব্যবস্থার নিয়ম লঙ্ঘন করবার চেষ্টা করেনি।

বৃটিশ আমলে জাতিব্যবস্থার আর্থিক ও সামাজিক ভিত্তি ভেঙে গেল। ফলে জাতিব্যবস্থার ধর্মীয় ও আদর্শগত তত্ত্বের সঙ্গে আর্থিক ও সামাজিক ব্যবহারের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়। হীনজাতির পক্ষে এর পরিণাম হল মারাত্মক। সমাজের কাছে তাদের প্রাপ্য বলে কিছু রইল না, কিন্তু অশুচি বলে উচ্চজাতির কাছে ঘৃণিত থেকে গেল। অস্পৃশ্যতা বরাবরই পীড়ন ও শোষণের উপায়। বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে অস্পৃশ্যদের যে বন্ধন ছিল তা ঘুচে যাবার ফলে তারা সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ল। অস্পৃশ্যদের ওপর শোষণ ও পীড়ন বীভৎস হয়ে উঠল। গ্রামাঞ্চলে অস্পৃশ্যরা সম্পন্ন কৃষিজীবি উচ্চতর জাতির ওপর নির্ভরশীল। অস্পৃশ্যদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে এরা সর্বপ্রযত্নে অমানুষিক অত্যাচার শুরু করে। অস্পৃশ্যরা গায়েগতরে খেটে পেট চালায়। খেতমজুরীই প্রধান অবলম্বন। এদের অধিকাংশই ভূমিহীন। অল্পস্বল্প নিজস্ব জমি কিছু লোকের আছে। কিন্তু তাতে অন্নসংস্থান হয় না। তাদেরও উচ্চজাতির বড় চাষীর জমিতে বা বাড়ীতে খাটাখাটনি করতে হয়। একে মজুরী সম্বল, তায় ঘৃণিত অস্পৃশ্য। উচ্চতর জাতির পীড়ন পেষণ সহ্য না করে এদের উপায় নাই। এদের জীবনযাত্রা অপরিসীম দারিদ্র্য ও দৈন্যক্লিষ্ট।

জাতিব্যবস্থার আর্থিক ও সামাজিক ভিত্তি নষ্ট হবার ফলে আর এক ধরনের ব্যাপার ঘটে। সমাজ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে নোঙ্গরবিহীন বিভিন্ন জাতি স্বতন্ত্রভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার উপায় সন্ধান করতে থাকে। আত্মোন্নতির প্রয়াসে প্রথম পদক্ষেপ জাতিভিত্তিক সংগঠন তৈরী তারপর আত্মোন্নতির জন্য জাতিভিত্তিক আন্দোলন। উন্নতির পথে নানান বাধা ছিল, বিশেষতঃ নিম্নতর জাতিসমূহের ক্ষেত্রে। নিম্নতর জাতিসমূহ চিরকালই দরিদ্র এবং পশ্চাৎপদ। অপরদিকে উচ্চজাতিসমূহের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনীতিক শ্রেষ্ঠতা ও তজ্জনিত প্রাধান্য। উন্নতিকামী নিম্নতর জাতিসমূহের মনে এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে তাদের আবহমানকালব্যাপী অনগ্রসরতার জন্য দায়ী উচ্চজাতিকৃত বঞ্চনা ও পীড়ন এবং বর্তমানে উচ্চজাতির প্রাধান্যই তাদের উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা। নিম্নতর জাতির প্রতি উচ্চতর জাতির ঘৃণা, অবজ্ঞা ও উপেক্ষার ফলে সে বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়েছিল। উচ্চজাতির প্রতি নিম্নতর জাতিসমূহের ক্রোধ ও বিদ্বেষ এই বিশ্বাসের অভিব্যক্তি। মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুর ব্রাহ্মণবিরোধী আন্দোলন বা বাঙলার নমঃশূদ্র আন্দোলন পর্যালোচনা করলে নিম্নতর জাতিসমূহের ক্রোধ ও বিদ্বেষের তীব্রতা বোঝা যাবে। উচ্চজাতির প্রাধান্য খর্ব করে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্য নিম্নতর জাতিসমূহের নেতারা উচ্চতর জাতির সঙ্গে রাজনীতিক প্রতিযোগিতার অবতীর্ণ হয়। বৃটিশের অধীনে অধস্তন পর্যায়ে উচ্চজাতির প্রাধান্য তখন এমনই প্রবল যে বৃহত্তর শক্তির সহায়তা ভিন্ন নিম্নতর জাতির উন্নতি ও প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতিতে কিঞ্চিৎমাত্র সফলতালাভও সম্ভব হত না। এটা বুঝে

নিম্নতর জাতিসমূহের নেতৃবৃন্দ বৃটিশ সরকারের দ্বারস্থ হলেন। তাঁরা চাইলেন অধস্তন পর্যায়ে লভ্য সুযোগ-সুবিধা নিম্নতর জাতিসমূহকে পর্যাপ্ত পরিমাণে দেওয়া হোক। তা হলে তারা প্রতিযোগিতায় প্রবল হয়ে উঠবে। বৃটিশ সরকারের কাছে এটা পড়ে পাওয়া চোদ্দআনা। উচ্চজাতির মধ্যে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ঝোঁক বাড়ছিল। জাতীয়তাবাদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার নিম্নতর জাতিসমূহের প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতিতে প্রচুর উৎসাহ দিতে লাগলেন।

জাতিভিত্তিক আন্দোলনের প্রথম দিকে উদ্যোগী ছিল উচ্চজাতি ও অন্ত্যজ পর্যায়ের মধ্যবর্তী জাতিসমূহ। বাঙ্গলায় এই পর্যায়ের জাতি সদ্গোপ, মাহিষ্য প্রভৃতি। কিছুদিন পরে অস্পৃশ্য জাতিগুলিও জাতিভিত্তিক আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। বিভিন্ন অস্পৃশ্য জাতির মধ্যে কিছু লোক ইংরাজী লেখাপড়া শিখে স্বজাতির নেতাপদে অধিষ্ঠিত হলেন। অস্পৃশ্যসহ নিম্নতর জাতিসমূহের শিক্ষিত ব্যক্তিরা সরকারী চাকরী, ওকালতি, শিক্ষকতা, প্রভৃতি আধুনিক বৃত্তি অবলম্বন করতে লাগলেন। স্বজাতির বৃত্তি তাঁরা নেননি। আগেকার দিন হলে নিম্নতর জাতির নূতন বৃত্তিধারী অংশ ধাপ খেয়ে ওপরের দিকে উঠে নূতন জাতি বা জাতিখণ্ড পত্তন করবার চেষ্টা করত। কিন্তু একদিকে ক্ষয়িষ্ণু জাতিব্যবস্থা এবং অপরদিকে প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতির কারণে জাতিব্যবস্থা অনুযায়ী উচ্চতর মর্যাদালাভের আগ্রহ তাঁদের ছিল না। প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতি করতে হলে স্বজাতির মধ্যেই থাকতে হবে কেননা স্বজাতির সমর্থনই প্রতিযোগিতার রাজনীতিতে শক্তির একমাত্র উৎস।

প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতিতে মধ্যবর্তী পর্যায়ের জাতিগুলি খুব লাভবান হয়েছিল। অস্পৃশ্যদের ক্ষেত্রে তা হয়নি। মধ্যবর্তী পর্যায়ের বেশ কয়েকটি জাতির জমি-জিরাত সহায়-সম্বল ভালই ছিল। উপরন্তু আধুনিক পেশায় উচ্চজাতির পরেই তাদের স্থান। জাতিভিত্তিক আন্দোলনে মধ্যবর্তী পর্যায়ের জাতিগুলিই ছিল পুরোবর্তী। মধ্যবর্তী জাতিসমূহের আন্দোলন সময় সময় বেশ জোরদার হয়ে উঠেছে। কিন্তু এর মধ্যে কিছু দোষ জন্মেছিল। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে জাতিভিত্তিক আন্দোলনের নেতারা স্বজাতি উপলক্ষে ব্যক্তিগত বা সংকীর্ণ দলগত ক্ষমতালাভে প্রয়াসী। মধ্যবর্তী পর্যায়ের জাতিসমূহের কাছে জাতি আন্দোলন বাড়তি সুযোগ-সুবিধালাভের উপায় স্বরূপ। আন্দোলন সফল হলে ভাল, বিফল হলে তার পরিণাম মারাত্মক হবার সম্ভাবনা ছিল না। অস্পৃশ্যদের কাছে জাতি আন্দোলন জীবনমরণের প্রশ্ন। অপরাপর গোষ্ঠী আন্দোলনের নেতাদের মতো অস্পৃশ্য জাতিসমূহের নেতারাও ব্যক্তিগত ক্ষমতাভিলাষী হয়ে উঠেছিলেন। দু'চারজন যথা—বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকার ও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল তো ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। রাজনীতিক ঘটনাচক্রে সংরক্ষণ প্রথা চালু হয়। সংরক্ষণ প্রথার কল্যাণে অস্পৃশ্যদের একাংশ কিছু সুযোগ-সুবিধা পেল। ক্রমে সুবিধাভোগীর সংখ্যা বেড়েছে। এতে করে অস্পৃশ্যদের একাংশ প্রতিষ্ঠালাভ

করল বটে, কিন্তু বৃহত্তর অস্পৃশ্যসমাজের ললাটলিখনে কোন হেরফের হল না। স্বাধীনতালাভের পর চল্লিশ বছর চলে গেছে, আজও অস্পৃশ্যদের বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা অপ্রতিহত। স্বাধীনতার পরে ভারতের বৈষয়িক উন্নতি হয়েছে, অনস্বীকার্য। কিন্তু এ সমৃদ্ধি সার্বত্রিক উন্নতি নয়, এটা ক্ষমতাবান সংখ্যালঘিষ্ঠের জন্য সুখাস্বাদনের আয়োজনমাত্র। সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত ও পীড়িত না করে এদের পক্ষে সুখলাভ সম্ভব নয়। স্বভাবতই সমাজের দুর্বলতম অংশ অস্পৃশ্যদের ওপর চাপ পড়েছে সবচেয়ে বেশী। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতি আন্দোলনের প্রভাবে সকল নিম্নতর জাতির মধ্যে স্বাধিকার চেতনা বেড়েছে। দেশ স্বাধীন হবার পরে অস্পৃশ্যতা রোধের জন্য আইন জারী হয়েছে। সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রসার ঘটেছে। এইসব কারণে অস্পৃশ্যদের মনে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এখন তীব্রতর। কিন্তু সমাজ বা রাষ্ট্র অস্পৃশ্যদের বঞ্চনা বা তাদের ওপর অত্যাচার রোধের কোনও উপায় করতে পারছে না।

বৃটিশ আমলে জাতি রাজনীতির উপাদান হয়ে উঠেছিল। স্বাধীন ভারতে বাহ্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নির্বাচনী রাজনীতিতে জাতি ক্রমশ গুরুতর ও বিপজ্জনক বিষয় হয়ে উঠছে। জাতি উপলক্ষ করে নিকৃষ্ট রাজনীতিক প্রতিযোগিতা চলছে। সব রাজনীতিক দলই জাতিভিত্তিক রাজনীতির পোষকতা করে এবং নির্বাচনের সময় এক লপ্তে এক একটা জাতির ভোট নিজের দিকে টানবার চেষ্টা করে। নির্বাচনের সময় সংবাদপত্রগুলো কোন্ জাতি কোন্ দলের দিকে এবার কি কারণে ঝুঁকতে পারে এই ধরনের লেখা রাজনৈতিক বিশ্লেষণ নাম দিয়ে প্রকাশ করে। নির্বাচনী রাজনীতিতে সুযোগ বুঝে বিভিন্ন জাতি ভোটসংখ্যা অনুপাতে রাজনীতিক দলগুলোর সঙ্গে দর কষাকষি করে স্বার্থসিদ্ধির উপায় খোঁজে।

আধুনিক ভারতে জাতিব্যবস্থার যুক্তিতে নিম্নজাতি উচ্চজাতির অনুগত থাকবে না, এটা পরিষ্কার। উচ্চতর জাতির লোকেরা এখন নিম্নতর জাতির মানুষকে জোরজুলুম করে কব্জায় রাখার চেষ্টা করছে। নিম্নজাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ধৃষ্টতা এবং ঔদ্ধত্য বিবেচনা করে উচ্চতর জাতির লোক নিম্নজাতির স্বাধিকার লাভের প্রয়াস বানচাল করতে বদ্ধপরিকর। ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে এই আশংকায় উচ্চতর জাতিসমূহ ক্রোধে অন্ধ হয়ে উঠেছে। এদের আক্রোশ রাক্ষসসুলভ : নির্বিচার লুণ্ঠন, গৃহদাহ, ধর্ষণ ও হত্যা। গ্রামাঞ্চলে হরিজনদের ওপর নিপীড়ন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অস্পৃশ্যরাও সুযোগ পেলে প্রতিশোধ নিচ্ছে। জাতিব্যবস্থা না থাক, জাতির ভূত আমাদের স্কন্ধে অধিষ্ঠান করে আছে। সহজে নামবে বলে মনে হয় না।

নির্মলকুমার বসু মনে করতেন বংশানুক্রমিক বৃত্তির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বিভিন্ন জাতির লোক যোগ্যতাঅনুসারে নানা প্রকার বৃত্তিতে ছড়িয়ে পড়লে পরিণামে জাতির পরিচয় মুছে যাবে। কথাটা যুক্তিযুক্ত, আংশিকভাবে এইরকম হয়েছে।

শহর বাজারে এর লক্ষণ কিছু কিছু দেখা যায়। কিন্তু শিক্ষা ও বৃত্তিগত সুযোগ-সুবিধা সকলের প্রাপ্য ও লভ্য না হলে এটা সর্বজনীন হবে না। অস্পৃশ্যরা সুযোগ খুব কমই পায়। সরকারী খাতায়পত্রে অস্পৃশ্যদের জন্য যেসব সুযোগ সুবিধার কথা বলা আছে সাধারণতঃ সেসব অস্পৃশ্যদের মধ্যে প্রাগ্রসর লোকেরাই পেয়ে থাকে। অস্পৃশ্যদের মধ্যে যারা তুলনায় সম্পন্ন বা রাজনীতিতে পোক্ত সরকারী সুযোগ-সুবিধা তারাই আত্মসাৎ করে। সাধারণে বঞ্চিত হয়—আগে হ'ত উচ্চতর জাতির দ্বারা, এখন তার সঙ্গে নিম্নতর জাতির ক্ষমতাভিলাষী অংশ জুটে গেছে। গ্রামাঞ্চলে এমনকি শহরেও অস্পৃশ্যরা নিদারুণ দৈন্য ও অবমাননায় পিষ্ট হচ্ছে। যে পাথর তাদের বুকে চেপে আছে তা ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ান তাদের পক্ষে কঠিন। অসম্ভব বলেই মনে হয়, অন্ততঃ বর্তমান পরিস্থিতিতে।

নিম্নতর জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিরোধ প্রয়াস শ্রেণী গঠনের পূর্বাভাস, এ কথা কেউ কেউ বলছেন। তত্ত্বগতভাবে এই কথা কারও কারও কাছে ঠিক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এই প্রস্তাব আপাততঃ বিবেচ্য নয়। নিম্নতর জাতিসমূহের প্রতিরোধ প্রয়াসেই ফাঁক আছে। নিম্নতর জাতিসমূহ বিশেষতঃ অস্পৃশ্যরা অতিশয় দুর্বল এবং সম্পূর্ণ অরক্ষিত। ক্ষমতালিপ্সু নেতৃবৃন্দের কাছে এদের দুরবস্থা রাজনীতির পুঁজিপাটা বিশেষ। নেতারা স্বার্থবুদ্ধিতে ক্ষমতার অংশলাভে তৎপর হলে তা ঠেকাবার সাধ্য এদের নাই। পূর্বাপর নেতাদের আচরণ দেখলে এইরকম অঘটনের সম্ভাবনা অমূলক মনে হবে না। অস্পৃশ্য হিসেবে কিঞ্চিৎ দাক্ষিণ্যলাভ বা নির্বাচনী রাজনীতিতে হীন কৌশল দ্বারা নেতৃবৃন্দের ক্ষমতাভোগ বৃহত্তর অস্পৃশ্যসমাজের পক্ষে মুক্তির উপায় হতে পারে না। সকলের জন্য মানুষের মর্যাদা চাই। সমগ্র অস্পৃশ্যসমাজের আত্মশক্তির উদ্বোধন ভিন্ন তা সম্ভব নয়। এর জন্য ধৈর্য সহকারে দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের প্রয়োজন। কবে কিভাবে সে সংগ্রাম আরম্ভ হবে তা জানি না। প্রস্তুতির কোনও ইঙ্গিত এখনও নেই।

[শিক্ষা নিকেতন পত্রিকা (নব পর্যায়), তৃতীয় বর্ষ, ১৯৮৭ সংখ্যায় অস্পৃশ্যতা বিষয়ে সমস্যামূলক বিশেষ প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধাবলীর সম্পাদকীয় নিবন্ধ পরিবর্ধিত করে বর্তমান প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।]

দেশবাসী আর আদিবাসী

কমলেন্দু ধর

আমরা দেশবাসী নই, আমরা আদিবাসী। বা বলতে পারেন, যারা দেশবাসী নয়, তারাই আদিবাসী। কথাগুলি আমার নয়। মধ্যপ্রদেশের খেঁরোওয়ার আদিবাসীদের একজন—শোয়ানের। না, কোনো প্রান্তিক চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে এ কথাগুলি তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসেনি। দেশের ডানবামদক্ষিণমধ্য সর্বস্তরের দেশবাসী যখন দেশের স্থায়ী সাম্প্রদায়িকতা আর চকিত বিচ্ছিন্নতায় উদ্বিগ্ন, তখনও আদিবাসীরা ভয়ার্ত-অরণ্যভূমি-নির্ভর অথবা পরাধীন শ্রমদাস-যন্ত্রণায় আদিম জীবন যাপনে অভ্যস্ত। স্বাধীনতা গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদ সমাজতন্ত্র সংবিধান জরুরি অবস্থা বহুজাতিক সংস্থা মডেল-স্কুল বিজ্ঞানপ্রযুক্তি বা একবিংশ শতাব্দী—শব্দগুলি এখনো তাদের কাছে গিয়ে পেঁছয়নি। দৈনিক সংবাদপত্র আর দিনভর ক্রিকেটের ব্যঞ্জনা নিয়ে যে গরিষ্ঠ দেশবাসীর ব্যস্ততা, তাঁরা সময়ে অসময়ে কখনো সখনো শব্দগুলির অর্থ আর তার গুণগত বিভাজনপর্ব নিয়ে যখন তর্কের তুফান তোলেন, তখন ওঁরা এই শব্দতরঙ্গের বাইরে মাইলের পর মাইল দুর্গম পথ হেঁটে চলেছেন সামান্য পানীয় জলের জন্য। বাকি সামান্য কিছু দেশবাসী যাঁরা শব্দগুলির দ্যোতনা বোঝেন এবং অপরকে বোঝাতে প্রয়াস চালান—তাঁরাও সেই প্রান্তসীমার মানুষগুলির থেকে এখনও বিস্তৃত ব্যবধানে তাঁদের কর্মপ্রবাহে ব্যস্ত। তাই "দেশবাসী আর আদিবাসী" শব্দ দুটির মধ্যে যে ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে এক আলোকিত খেঁরোওয়ার যুবকের মধ্যে, তা হল: ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশের বেশি মানুষ কেন এখনও দেশবাসী না হয়ে আদিবাসী হয়ে রইল তারই মর্মান্তিক প্রেক্ষাপট আর উপলব্ধি। এই প্রেক্ষাপট আর উপলব্ধির চেতনাই এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

আলোচনাটি আমরা পাঁচটি পর্বে ভাগ করে নেব। প্রথমত আমরা জেনে নেব, কবে কিভাবে দেশবাসী আর আদিবাসী বিভাজনপর্বটি প্রশাসনে স্বীকৃত হল, এবং তাদের আবাসভূমি। দ্বিতীয় ভাগে স্বাধীনতাপূর্ব একটি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্রে আমরা তুলে ধরব এই মানুষদের জীবন-জীবিকাকে। তৃতীয় অধ্যায়ে আমাদের আলোচনার বিষয় স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে দেশবাসীর তথা দেশীয় প্রশাসনের এঁদের নিয়ে বৈচিত্র্যময় কর্মযজ্ঞ। চতুর্থ পর্বে আমরা দেখাবার চেষ্টা করব—কিভাবে দেশ তথা দেশবাসী এগিয়ে চলেছে এবং এই নিম্নবর্গীয়রা নিঃস্ব হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান ভারতরাষ্ট্রে এদের সামাজিক অবস্থানের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাঠকরা পাবেন। সবশেষে এই আলোচনার প্রেক্ষায় উপসংহারের বদলে কয়েকটি কথা বলতে চাই—যার বিস্তৃত পর্যালোচনায় এখানে আমরা যাব না। একটি বিষয় প্রথমেই পরিষ্কার করে নেবার প্রয়োজন আছে, তা হল 'তফশীল জাতি / উপজাতি', 'হরিজন', 'অচ্ছুত',

'অন্যান্য অনুন্নত জাতি'—সব অর্থে সমগোত্রীয় নয় জেনেও প্রথম পর্বে আদিবাসী কথাটি একটু বিস্তারিত করে সচেতনভাবে ব্যবহার করেছি—সমগ্র অনুন্নত শ্রেণীর প্রতিভূ হিসাবে। কারণ, শুধু আদিবাসী নয়, এই সমগ্র বিভিন্ন-নামাঙ্কিত বিভাজনটি শুধু অবৈজ্ঞানিকই নয়, অমানবিকও বটে। স্বাধীনতার ৪০ বছর পরে যদিও আমরা তা-ই বহন করে চলেছি। এবং দ্বিতীয় পর্ব থেকে এই সমগ্র পশ্চাৎপদ শ্রেণীকে 'মানুষ' বলে উল্লেখ করেছি ঃ অর্থনৈতিক-সামাজিক দিক থেকে অনগ্রসর মানুষ।

১

একটি দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠী থেকে ক্রমপর্যায়ে কিছু-কিছু মানুষকে বেছে নিয়ে, বিচ্ছিন্ন করে কখন কারা আদিবাসী তকমায় চিহ্নিত করে দিল, তাই প্রথমে আমাদের জেনে নেওয়া দরকার। ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতবর্ষে নানান ধারার জ্ঞানচর্চার যে নতুন কাঠামোটি গড়ে ওঠে, তা মূলত সাম্রাজ্যবাদী-শাসন-নীতি-আশ্রয়ী। ঔপনিবেশিক দেশগুলির বহমান জনজীবনের সকল প্রবাহের প্রচলিত সামাজিক আদানপ্রদান আচার-অনুষ্ঠান রীতি-নীতি প্রথা-ধর্ম সম্পর্কে জেনে নেবার প্রয়োজন খুবই জরুরি হয়ে পড়ে—সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ চালাবার তাগিদে। এসব জানা থাকলে অহেতুক বিরোধকে এড়িয়ে শাসিত দেশের জনজীবনে সরাসরি হস্তক্ষেপ করা যায়, এবং বিভিন্ন ধারার সামাজিক বিক্ষোভকেও কৌশলে দমন করা সম্ভব হয়।

এদেশের সংস্কৃতিমূলক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত সাম্রাজ্যবাদীদের আশ্রয়ে আর প্রশ্রয়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্বে বাঙলার রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির চেষ্টায় এবং স্যার উইলিয়াম জোনসের প্রেরণায় ভারতবর্ষেও নৃতত্ত্ববিজ্ঞানচর্চা শুরু হয়। ১৮৮৬ সালে বোমবাইতে অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সোসাইটি স্থাপিত হয়। এর পরই আমরা দেখতে পাই করনেল ড্যালটন, স্যার ডেনজিল ইবেটসন, স্যার হারবার্ট রিজলে এদেশের সকল স্তরের মানুষের সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু অনুসন্ধান শুরু করেন। এই অনুসন্ধানের ফসল করনেল ড্যালটনের "ডেসক্রিপটিভ এথনলজি অব বেঙ্গল", হারবার্ট রিজলের "ট্রাইবস অ্যানড কাস্‌ট্‌স্‌ অব বেঙ্গল"। তারপর মধ্যভারত, দক্ষিণভারত আর আসামের বিভিন্ন জাতি আর উপজাতিদের নিয়ে একের পর এক বই প্রকাশিত হতে থাকে। এখানে সবিশেষ উল্লেখ্য যে, ১৮৭২ সালে প্রাথমিক-ভাবে ভারতবর্ষের জনগণনা শেষ হয়। এবং ১৮৮১ থেকে প্রতি দশ বছর অন্তর নিয়মিত জনগণনার কাজ চলতে থাকে। এই সময়ই সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে দেশের কিছু-কিছু মানুষকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিচ্ছিন্ন করে আদিবাসী ছাপ মেরে তফশীলভুক্ত করা হয়। এর আগে এইসব মানুষকেই বিভিন্ন সময়ে 'জংলি মানুষ', 'বন্য মানুষ', 'আদিম অধিবাসী', 'অনুন্নত জাতি' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। বস্তুত এক কৃত্রিম জনবিন্যাসের তত্ত্বই দেশের মানুষের একাংশের সরকারি পরিচয় দেয় আদিবাসী তথা 'অনুন্নত জাতি' বলে। ১৯০১ সালে সেনসাস কমিশনার

নিযুক্ত হয়ে স্যার হারবার্ট রিজলে যে রিপোর্টটি পেশ করেন তার শেষে এথনোগ্রাফিক অ্যাপেনডিকস জুড়ে দেন—তা-ই "দ্য পীপল অব ইনডিয়া" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯০৮-এ। এই গ্রন্থে স্থান পায় ভারতবর্ষের অধিবাসীদের জাতি-তত্ত্ব, আর তাদের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ সম্বন্ধে রিজলের সংগৃহীত তথ্য, এবং তাঁর নিজস্ব মতামত। এর ফলে, ভারতবর্ষের অধিবাসীদের এক বড়ো অংশ তফশীল জাতি / উপজাতি বলে প্রশাসনে আর জনমানসে পরিচিতি এবং প্রতিষ্ঠা পায়। অবশ্য সরকারি ভাষ্যে এই তফশীলভুক্ত গোষ্ঠীর বাইরেও কিছু-কিছু 'অন্যান্য অনুন্নত জাতি' আছে বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। স্বাধীন ভারতবর্ষেও তাঁরা পরিচয়ের এই স্বমহিমাতেই বিরাজ করেন। এবং স্বাধীনতার ৪০ বছর পরেও তাঁরা দেশবাসী নয়, আদিবাসী হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে আছেন।

আদিবাসী তত্ত্বের অপপ্রয়োগ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা এখানে করব না। এই অবৈজ্ঞানিক কর্মধারা সম্পর্কে শুধু একটিমাত্র উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। উদ্ধৃতিটি ড. ভেরিয়ার এলউইনের :

'Our science has been debased in the interest of false racial theories....Anthropology is regarded with some suspicion in India. There are several reasons for this. The attempt of certain scholars and politicians to divide the aboriginal tribes from the Hindu community at the time of census created the impression that science could be diverted to political and communal ends.'[১]

এই সূত্রে আমাদের বক্তব্য : 'হিন্দু কমিউনিটি' থেকে নয়, দেশের জনগোষ্ঠী থেকে কিছু-কিছু মানুষকে বেছে নিয়ে এজাতীয় তকমা দেওয়ার প্রহসনকে তুলে ধরা এবং তাকে অস্বীকার করা। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে নানা মানুষের সংমিশ্রণ ঘটেছে এদেশে, এখনও ঘটছে। ঐতিহাসিক যুগে উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথগুলি দিয়ে মধ্য এশিয়া থেকে নানা মানুষের নতুন-নতুন প্রবাহ এসে মিশেছে ভারতীয় জনসমুদ্রে। উত্তর-পূর্ব থেকেও এ সংমিশ্রণের ধারা থেকেছে অব্যাহত। সুতরাং ভারতবর্ষের বর্তমান জনগোষ্ঠীকে কোনো প্রধান মানবগোষ্ঠীর উৎপত্তি বা আবির্ভাব বলে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। তারা আভ্যন্তরীণ আর বহিরাগত একটির পর একটি গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে ক্রমাগ্রসরমান। তাই একথা খুব সহজেই বলা যায়, শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীতে কোনো অমিশ্র জাতি বা গোষ্ঠী আদৌ নেই। প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী হেডনের মতকে অনুসরণ করে বলা যায়, 'A race type exists only in our minds.'। ফলত, ঔপনিবেশিক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানচর্চার ধারাকে অনুসরণ করতে হলে তফশীলভুক্ত আর অন্যান্য পশ্চাৎপদ মানুষগুলিকে বেওয়ারিশ আর অজ্ঞাত দুনিয়ার মানুষ হিসাবে কষ্টসাধ্য ভাবনা ভাবতে হয়।

২

দেশবাসীরা যে-সমস্ত অঞ্চলের সৌন্দর্যছটায় বারংবার আবেগতাড়িত হন, সেই পাহাড়-পর্বত-নদী-সমুদ্র-ঘেরা স্বপ্নময় অনুন্নত স্থানগুলি জুড়েই অধিকাংশ আদিবাসীদের বাস। অবশ্য এই স্থানগুলির এক বড়ো অংশই আধুনিক সভ্যতা আর প্রগতির মূলধন প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। আর এই সম্পদের উপর নির্ভর করেই দেশ এগিয়ে চলে, দেশবাসীরা সম্পন্ন হয়, বুদ্ধিজীবীরা (আদিবাসীদের) 'আদিকল্পে' বিভোর হন—ঠিক তখনই তারা আরো বেশি করে দেশবাসী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, অনুন্নত হয়, নিঃস্ব হয়। পশ্চিমবঙ্গের সীমানা থেকে আরম্ভ করে একটি উচ্চভূমির অঞ্চল বিন্ধ্য কৈমুর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। এর পশ্চিমে মালব মালভূমি। মধ্যভারতের মালভূমি মালবের উত্তরে আরাবল্লী থেকে পূর্বভারতের রাজমহল পর্যন্ত বিস্তৃত। মধ্যভারতের এই মালভূমির পূর্বের অংশ ছোটনাগপুর মালভূমি। ছোটনাগপুরের মালভূমি দক্ষিণ-পূর্ব উড়িষ্যার মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলের সাথে যুক্ত হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের এই উচ্চভূমি, উত্তরে মধ্যভারতের এবং দক্ষিণে ছোটনাগপুরের মালভূমিকে যুক্ত করেছে। এই বিস্তৃত উচ্চভূমির পূর্বে মহানদীর উপত্যকা থেকে বেরিয়ে পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণী পূর্ব উপকূল বরাবর প্রসারিত হয়ে নীলগিরি পর্বতে পশ্চিমঘাট পর্বতশ্রেণীর সাথে মিলেছে। নীলগিরির দক্ষিণে আন্নামালাই, পুলনি প্রভৃতি পর্বত। এই বিস্তৃত অংশেই প্রধানত আদিবাসী মানুষদের অবস্থান। এর বাইরেও বছরের পর বছর পর্যায়ক্রমে উচ্ছেদ হয়ে দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বেশ কিছু আদিবাসী।

স্বাধীনতার পূর্বে আদিবাসীদের সম্পর্কে উল্লেখিত কাঠামোকে অস্বীকার করার কোনো প্রবণতা বা প্রচেষ্টা বিশেষভাবে না পেলেও কয়েকটি উজ্জ্বল নাম আমরা পাই যাঁরা এই নিঃস্ব মানুষদের নিয়ে ভেবেছেন, এদেরকে নিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন, জীবনের নতুন স্বপ্ন দেখিয়েছেন। অন্তত এদের দাসত্বের জীবন-বন্ধনকে ছিন্ন করে মানুষ হিসাবে বাঁচবার অধিকার নিয়ে আন্দোলন করেছেন। সর্বাগ্রে উজ্জ্বল নামটি হল জ্যোতিবা ফুলে, যদিও তাঁর "সত্যসাধক" আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েনি। এর পর গান্ধীজী, আম্বেদকর, পেরিয়ার ই. ভি. রামস্বামী ও অন্যান্য ব্যক্তির নাম এসে পড়ে। জ্যোতিবা ফুলে নিপীড়িতদের চেতনার রূপান্তর ঘটাতে আজীবন লড়াই করে গেছেন ব্রাহ্মণ্য গোষ্ঠীর মতাদর্শের বিরুদ্ধে। স্থির লক্ষ্যে অবিচল থেকে তিনি জাতপাতে দীর্ণ হিন্দু সামাজিক বিন্যাসের সমস্ত রকম অন্যায়, অসত্য আর ভণ্ডামির বিরুদ্ধে আপোসহীন আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। জ্যোতিবা ফুলে একদিকে যেমন আর্যতত্ত্বের নোংরা অনাচার উদ্‌ঘাটনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, অন্যদিকে সবার সমানাধিকার, হিন্দু মুসলমান-খ্রিস্টানদের সমতার দাবি, নীচু বর্ণের শিক্ষা, নারীপুরুষের সমানাধিকার তথা পুরনো সামাজিক বিন্যাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। জ্যোতিবা ফুলের জীবনীলেখক কীয়ার "লোকহিতবাদী"

থেকে দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের রাজত্বের চিত্র এভাবে তুলে ধরেছেন: 'কৃষকরা এমনকি খরা বা দুর্ভিক্ষের সময়েও প্রাপ্য খাজনা দিতে অসমর্থ হলে তিনি তাদের ছেলেমেয়েদের গরম কড়াই থেকে ফুটন্ত তেলে ঢালতেন, তাদের ন্যুব্জ পিঠের ওপর চাবুক মারার অনুশীলন চলত, তাদের মাথা গুঁজে দেওয়া হত দমবন্ধকরা ধোঁয়ার মধ্যে তাদের নাভিদেশে আর কানে বারুদ ছড়িয়ে দেওয়া হত।' এই কৃষকরা অধিকাংশই হল সেই মানুষ যারা নীচু জাতের।

আর এদের উন্নতির জন্য 'গান্ধীজীর কার্যকলাপ যে কত ছিল সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলারই দরকার করে না'—মন্তব্যটি "গান্ধী-গবেষণা" গ্রন্থের লেখক প্রবীণ পান্নালাল দাশগুপ্তের। গান্ধীভাষ্যে আদিবাসী অচ্ছুৎ অনুন্নত গোষ্ঠীর একটা নতুন পরিচয় ঘটে "হরিজন" বলে। যদিও পণ্ডিত নরসিং মেহতা "হরিজন" শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন, তবুও গান্ধী ভাষ্যের কল্যাণেই "হরিজন" শব্দটি আমাদের অনেক কাছাকাছি চলে আসে। গান্ধীজীর বিস্তৃত 'অনশন সত্যাগ্রহ'-এর দুটি মূল্যবান পর্ব ব্যয়িত হয় এই অনুন্নত তথা হরিজনদের উন্নয়নকল্পে। একবার ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, আরেকটি ১৯৩৩ সালের মে মাসে বিখ্যাত ২১ দিনের অনশন সত্যাগ্রহ। গান্ধীজীর কল্পিত "রামরাজত্বে" একদিন এই-সমস্ত মানুষের "কল্যাণ" হবেই বলে তিনি মনে করতেন। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন, সমাজটা যেমনই থাকুক, মানুষ যদি ভালো হয় তবে সব সমাজ দিয়েই মানুষের চলতে পারে। এই সূত্রেই তিনি সমাজটা না পালটে আদিবাসী তথা হরিজনদের কল্যাণে দেশবাসীকে, কংগ্রেসকে আত্মনিয়োগ করতে বারংবার আবেদন করেছেন, বলেছেন, "হৃদয় পরিবর্তন" করে তাদের কল্যাণে লেগে পড়তে। সত্যিই তো—কারো আহ্বানে সমস্ত মানুষের হৃদয়-পরিবর্তন হয়ে গেলে সমাজটা পালটাবার আর দরকার কী? গান্ধীজীর মতো সবাই যদি 'ম্যায় ভাঙ্গী হুঁ' বলে হৃদয়-পরিবর্তন করে ফেলেন, তাহলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়! তাই মহাত্মাসুলভ ভঙ্গিমায় মহাত্মা গান্ধীই অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেও সগর্বে বলতে পারেন: (ক) আমি বেদ, উপনিষদ, পুরাণ এবং সমস্ত হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে—এবং সে কারণে অবতারবাদে আর পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি, (খ) আমি বর্ণাশ্রমধর্মে বিশ্বাস করি, এবং তা পুরোপুরি বৈদিক অর্থে, আজকের প্রচলিত আর স্থূল অর্থে নয়, (গ) আমি মূর্তিপূজায় অবিশ্বাস করি না।[২]

এই গান্ধীজী যখন রাজনৈতিক প্রভাবের মধ্যগগনে গনগন করছেন, তখন দেশের এই মানুষদের অবস্থা কেমন ছিল? গান্ধীজীর অন্যতম প্রধান শিষ্য বা আদর্শবাহকের দাবিদার মোরারজী দেশাইয়ের ভাষ্যেই আমরা তা ধরছি। ১৯৩৯ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর, বোমবাই প্রদেশের তৎকালীন স্বরাষ্ট্র-ও রাজস্ব-মন্ত্রী মোরারজী দেশাই আইনসভায় 'প্রজাস্বত্ব আইনের' উপর ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন—'খান্দেশ জেলার ভীল অঞ্চলে বা থানা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েক বছর আগেও এই

মানুষগুলিই (বিভিন্ন আদিবাসীরা) ছিল সমস্ত জমির মালিক। কিন্তু খারাপ সময়ে দুর্ভিক্ষে বা দুষ্প্রাপ্যতার দিনগুলিতে, অভাবের তাড়নায়, সামান্যতম মূল্যের বিনিময়েই জমিগুলি তাদের হাত থেকে 'সাহুকরদের' দখলে চলে গেল। এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে—যেখানে কয়েক একর জমি মাত্র পাঁচ পাউনড খাদ্যশস্যের বিনিময়ে হাতছাড়া হয়ে গেছে—'কোনো-কোনো ক্ষেত্রে একর-পিছু পাঁচ টাকা বা এক টাকা, এমনকি আট আনাতেও।' আরেকটি চিত্রও আমরা পাই। বোমবাই প্রদেশের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বি. জি. খের ১৯৪০ সালের ১লা জুলাই "আদিবাসী সেবামণ্ডলে"র পক্ষ থেকে প্রকাশিত পুস্তিকায় বলেছেন—'বোমবাই থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইলের মধ্যেই, মনুষ্যজাতির এক বিশাল অংশ যে এইভাবে ক্রীতদাসের চেয়েও নিকৃষ্ট জীবনযাত্রার মধ্যে পচতে-পচতে ক্ষয় হয়ে যাবে, এবং আমাদের উন্নাসিক নাগরিকরা যে তাদের নিঃসীম দুঃখকষ্ট আর অত্যাচারক্লিষ্ট জীবনযন্ত্রণা সম্পর্কে আত্মপ্রসাদে উদাসীন হয়ে থাকবেন, এটা নিশ্চিতভাবে খুব লজ্জার ব্যাপার।' সত্যিই লজ্জার ব্যাপার। কারণ তখন থানা জেলার উম্বরগাঁও, দহানু, পালঘর আর জওহর তালুকের এক হাজার বর্গমাইল-ব্যাপী অরণ্যে হাজার হাজার ওয়ারলি আর অন্যান্য মানুষ অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় অনাহারে কোনো রকমভাবে বেঁচে আছে। বছরের বেশির ভাগ সময় তাদের হয় অনাহারে নয় গাছের পাতা, গাছের শিকড় অথবা কন্দ খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়। একবার একজন মানুষ বেগার খাটতে অস্বীকার করায় তাকে পায়ে বেঁধে গাছের উপর থেকে মাথাটা মাটির দিকে করে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। ঠিক তার নীচেই মুখের কাছে আগুন জেলে তার মধ্যে লঙ্কা দিয়ে দেওয়া হল। আর সেই অবস্থায় পিঠের উপর পড়তে লাগল চাবুকের পর চাবুক।

এই মানুষদের অসহনীয় যন্ত্রণার অবসানের জন্য জেহাদ ঘোষণা করে তিরিশের দশক থেকে ব্যাপক সংগ্রামের সূচনা করেন আম্বেদকর। জীবনের প্রথম দিকে এদের পক্ষে অসাধারণ অক্লান্ত যোদ্ধা আম্বেদকর সঠিকভাবেই উচ্চবর্ণের আর কংগ্রেসের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। ভূমিদাস-নির্ভরতাকে অস্বীকার করে তাদের জন্য জমি আর আলাদা বাসভূমি দাবি করেছেন। সাথে-সাথে গান্ধীজীর আদিবাসী তথা হরিজন-কল্যাণ পরিকল্পনাকে 'রাজনৈতিক অনুকম্পা' বলে ঘোষণা করেছেন। সবশেষে তাঁর অনুগামীদের নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেছেন। এরপরও কিন্তু তারা নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পায়নি।

এখানে ভাগ্যের একটি পরিহাসের কথা অবশ্যই আমাদের স্মরণ করতে হবে। তা হল—আম্বেদকরই ভারতের 'পবিত্রতম সংবিধান'-এর প্রধান প্রণেতাদের একজন। এই সংবিধানে অজস্র-শব্দসংবলিত অনেক কথা ব্যয়িত হয়েছে এই নির্যাতিত মানুষদের কল্যাণকামনায় আর উন্নতিকে সুনিশ্চিত করে। এবং পবিত্রতম সংবিধানকে

রক্ষাকবচ করেই দিনে রাতে এই মানুষদের গণহত্যা সংগঠিত হয়েছে, তাদের ঘর-বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, তাদের জমি আর সামান্য পর্ণকুটির থেকেও উৎখাত হতে হয়েছে। কাজেই এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে এই আম্বেদকরই জীবনের শেষ প্রান্তে পেঁাছে নিজেকে একজন প্রবঞ্চিত মানুষ হিসাবে দেখেছেন, লজ্জায় সংকোচে অবনত হয়েছেন।

৩

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মতো একজন 'সমাজতন্ত্রী মানবতাবাদী' মানুষ। স্বাধীন ভারতে পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে ভারত সরকার কিন্তু প্রথমেই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের আদিবাসী-নীতিকে মেনে নিলেন। তবে একটু উদার হয়ে তিনি সংবিধানে ১১টি ধারা তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য রক্ষাকবচ হিসাবে সংযোজন করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল :

(১) 'অচ্ছুত'প্রথা নির্মূল করা এবং যে কোনো ভাবে (in any form) এই অপ্রীতিকর প্রথা বন্ধ করা [ধারা ১৭]।

(২) শিক্ষা ও আর্থিক উন্নয়নে উৎসাহ দেওয়া এবং সামাজিক অবিচার আর শোষণের থেকে রক্ষা করা [ধারা ৪৬]।

(৩) সমস্ত সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হারে অনুন্নত গোষ্ঠীর জন্য চাকরি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা [ধারা ১৬, ৩৩৫]।

(৪) লোকসভা আর বিধানসভায় বিশেষ প্রতিনিধিত্ব ২৫ জানুয়ারি ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বজায় রাখা [ধারা ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৪]।

(৫) বেগারপ্রথা এবং দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করা [ধারা ২৩]।

এই সাংবিধানিক রক্ষাকবচে "অনুন্নত সম্প্রদায়ে"র উন্নতি আশানুরূপভাবে এগোয়নি। তাই ভারত সরকার এদের জন্য "কল্যাণমূলক" কর্মসূচী আরো ভালোভাবে নেবার তাগিদে ১৯৫৫ সালে কাকা কালেলকরের সভাপতিত্বে কমিশন বসান। কে. কে. কমিশন চারটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে ২৩৯৯টি বর্ণ গোষ্ঠীকে পশ্চাৎপদ বলে চিহ্নিত করেন। চারটি মানদণ্ড হল :

(১) হিন্দু সমাজের চিরায়ত বর্ণভিত্তিক ব্যবস্থায় যাঁরা নীচুতে আছেন।

(২) যে-সমস্ত গোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সাধারণ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

(৩) সরকারি চাকরিতে যে-সমস্ত গোষ্ঠীর অনুপাত নগণ্য বা আদৌ নেই।

(৪) ব্যবসা-বাণিজ্য আর শিল্পে যেসব গোষ্ঠীর স্থান অতি নগণ্য।

কে কে কমিশনের সুপারিশ ভারত সরকার গ্রহণ করেননি। কারণ, সরকারি মতে, যে চারটি মানদণ্ডের এর ভিত্তিতে কমিশন অনুন্নত গোষ্ঠীগুলিকে চিহ্নিত করেন, তা যথেষ্ট বস্তুনিষ্ঠ ছিল না। এরপর ১৯৭৯ সালে ভারত সরকার বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ

মণ্ডলের (বি পি মণ্ডল) সভাপতিত্বে দ্বিতীয় কমিশন গঠন করেন। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮০ সালে মণ্ডল কমিশন সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টটি ভারত সরকারের দপ্তরে পড়ে আছে 'still under consideration' বলে। যাই হোক, মণ্ডল কমিশন-এর রিপোর্টে আমরা যে-সমস্ত তথ্য পাই তার কয়েকটি উল্লেখ করা গেল :

মণ্ডল কমিশন মূলত তিনটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে ১১ টি বিভাগে বিষয়টি বিবেচনা করেন। মানদণ্ড তিনটি হল :

(১) সামাজিক মানদণ্ড (মোট চারটি বিভাগ)

(২) শিক্ষাগত মানদণ্ড (মোট তিনটি বিভাগ)

(৩) অর্থনৈতিক মানদণ্ড (মোট চারটি বিভাগ)

এই বিশ্লেষণে যা পাওয়া যায়, তা হল : ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার ১০০ জনের মধ্যে ৫২ জন অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষ। প্রতি ১০০ জন সরকারি কর্মচারীর মধ্যে ১৩ জন অনুন্নত সম্প্রদায়ের। সবশেষে মণ্ডল কমিশন যে মন্তব্যটি করেন তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—'প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ অনুন্নত সম্প্রদায়-এর মানুষ জানিয়েছে যে স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত তাদের বাস্তব অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি।' কমিশন দেশব্যাপী এক ব্যাপক 'প্রশ্ন-উত্তর' সমীক্ষায় এই মন্তব্যটি করেন।

মণ্ডল কমিশনের মূল সুপারিশগুলির একটি ছিল :

(১) অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য ২৭ শতাংশ, এবং

(২) তপশীলভুক্ত আদিবাসীদের জন্য ২২·৫ শতাংশ সব রকমের সরকারি চাকরি সংরক্ষণ,

(৩) আমূল ভূমিসংস্কার।

পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে ভারত সরকার কে. কে. কমিশনের রিপোর্ট গ্রহণ করেন নি, কারণ 'তা যথেষ্ট বস্তুনিষ্ঠ ছিল না'। আর মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট ১৯৮০ সালে পেশ হলেও 'still under consideration' অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

কার্যত উদাসীন মনোভাব নিয়েও সংবিধানের আওতায় এবং সরকারি প্রশাসনে নিম্নবর্গের এই মানুষদের যে-সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে আর হচ্ছে, এবার তা উল্লেখ করা যাক।

(১) লোকসভার বর্তমান ৫৪২ টি আসনের মধ্যে তফশীলভুক্ত মানুষদের জন্য ১১৯টি এবং বিভিন্ন রাজ্যবিধানসভার মোট ৩,৯৯৭টি আসনের মধ্যে ৮৭২টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(২) সংবিধানের ৩৩৫ ধারা অনুসারে মোট ২২·৫% সরকারি চাকরি এবং উচ্চপদে প্রমোশন-ব্যবস্থার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

(৩) সংবিধানে যেসব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে, তা ঠিকঠাক পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখবার জন্য ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে একটি কমিশন গঠিত হয়। এবং এই একই কাজের জন্য ১৯৬৮, ১৯৭১, ১৯৭৩ সালে সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়।

এখন এই সংসদীয় কমিটিকে স্থায়ী রূপ দেওয়া হয়েছে, কমিটির নিয়োগ এক বছরের মেয়াদে।

(৪) ভারত সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনায় এদের জন্য খরচ করেছেন যথাক্রমে প্রথম পরিকল্পনায় ৩০·০৪ (কোটি টাকায়), দ্বিতীয় ৭৯·৪১, তৃতীয় ১০০·৪০, বাৎসরিক পরিকল্পনা ৬৮·৫০, চতুর্থ ১৭২·৭০, পঞ্চম ২৯৬·১৯, ষষ্ঠ ১৩৩৭·২১। এ ছাড়া বিভিন্ন রাজ্যসরকারও পরিকল্পনাবহির্ভূত খাতে (নন-প্ল্যান বাজেট) প্রচুর টাকা খরচ করেছেন।

(৫) ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ঘোষিত ২০-দফা কর্মসূচী অনুযায়ী তপশীল উপজাতিদের দারিদ্র্যসীমার উপরে তুলে আনার লক্ষ্যমাত্রা ছিল যেখানে ২৭·৬০ লক্ষ পরিবার, সেখানে ৩৯·৬৭ লক্ষ তপশীল উপজাতি মানুষকে দারিদ্র্যসীমাকে অতিক্রম করতে সমর্থ করেছেন। এবং সপ্তম পরিকল্পনার প্রথম বছরেও (১৯৮৫-৮৬) লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮.৩৪,৫৩৭টি পরিবার; সেখানে ৮,৭৩,১০০টি পরিবার উপকৃত হয়েছেন।

সংবিধানের বিভিন্ন ধারা-উপধারায় এই মানুষদের জন্য যে সুযোগ-সুবিধাগুলির আয়োজন আছে তা কতটা ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যের আশ্রয়ে লালিত, আর কতটা নবলব্ধ স্বাধীনতার মৌল চিন্তাভাবনায় উজ্জীবিত, পর্যালোচনা করে দেখা যাক।

ঔপনিবেশিক আমলে পিছিয়ে-থাকা মানুষদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী, সরকারি চাকরিতে আর শিক্ষাক্ষেত্রে সংরক্ষণব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পিছিয়ে-থাকা গোষ্ঠীগুলির মধ্যে উন্নতির আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলে জাতপাতের স্বাতন্ত্র্যবোধকে জিইয়ে রাখা আর প্রয়োজন হলে তাকে উশকে দেওয়া, এবং কার্যক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়িত না করা। মুসলিম লীগ সম্পর্কে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর ভূমিকা প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে।

ফৈজপুর কংগ্রেসের সভাপতিরূপে নেহরুর বক্তৃতায় সমাজতন্ত্রের অনেক কথা শোনা গিয়েছিল। এমনকি স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী-রূপেও বক্তৃতার পর বক্তৃতায় তিনি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গড়ার সংকল্প বারংবার উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু জীবনের অন্তিম লগ্নে ১৯৬৩ সালে লোকসভায় বিখ্যাত দারিদ্র্য-সম্পর্কিত বিতর্কে নেহরু স্বীকার করলেন দেশে শিল্পায়ন এবং জাতীয় আয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও ধনীরা আরো ধনী হয়েছে এবং গরিবেরা হয়েছে আরো গরিব। দেশের পশ্চাৎপদ মানুষদের জীবনযাত্রার কোনো উন্নতিই হয়নি।

ফলত দেখা যায়, স্বাধীনতা-উত্তর কালে এই শ্রেণীর এক-আধজন মানুষকে নিয়ে গঠিত মন্ত্রিসভাও আগেকার ভূমিসম্পর্ক এবং ঔপনিবেশিক মতাদর্শের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। তাই জাতপাতব্যবস্থার বিলোপ অনেক পরের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ অনেকেই এই জাতপাতকে আশ্রয় করেই ক্ষমতার ভাগাভাগিতে অংশীদার হয়ে পড়েন বা হতে চান। সুতরাং দেখা যায়, সমাজের অন্যান্য অংশের মতোই ওই এক-আধজন ক্ষমতা আর সুযোগ-সুবিধার যত কাছাকাছি যেতে পেরেছেন তাঁরা

ততটাই আগ্রহী হয়ে পড়েছেন স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে। এবং রাজনৈতিক ওলট-পালটে ক্ষমতাচ্যুত হলেই এই মানুষদের প্রতি নির্যাতন-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। হরিজনদের বাৎসরিক সমাবেশে সন্ত রুইদাসের ছবির পাশে অস্পৃশ্যদের পুজো পেতে জগজীবন রাম কখনও কুণ্ঠাবোধ করেননি। অথচ এই জগজীবন রামই দশকের পর দশক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকার সময় স্থিতাবস্থা বজায় রেখে চলার ব্রত নিষ্ঠাসহকারে পালন করে গেছেন। এরকম উদাহরণ আরো দেওয়া যেতে পারে। আর শুধু রাজনৈতিক নেতারাই নন, এই শ্রেণী থেকে যেসমস্ত বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষিত মানুষ উপরে উঠে এসেছেন, তাঁরাও মতাদর্শগতভাবে শুধু দাবি জানিয়েছেন আরো চাকরি, আরো আসন-সংরক্ষণ, আরো শিক্ষার সুযোগ। এবং সমতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার বাইরে তাঁরা মৌলিক বিষয়ে কখনও সেভাবে সোচ্চার হন নি, আন্দোলন গড়ে তোলেননি। ফলে তাঁদের কয়েকজনের উন্নতি হলেও সকলের সামাজিক অবস্থার আর বৈষম্যের কোনো পরিবর্তন হয় না। তাই দেখা যায়, সরকারি চাকরিতে এই অনগ্রসর মানুষেরা চাকরি পায় ১০০ ভাগ জমাদার-ঝাড়ুদার হিসাবে, অথচ উপরের দিককার ন্যূনতম সংরক্ষিত চাকরিগুলি তাদের জোটে না। এই কয়েকজনের উন্নতি এবং ব্যাবহারগত উদাহরণ তুলে ধরে অধ্যাপক শ্রীনিবাস এক জাতীয় 'সোশ্যাল মোবিলিটি'র ওপর নির্ভর করে তাঁর বহুখ্যাত 'স্যানসৃক্রিটাইজেশন'-এর তত্ত্ব গড়ে তুলেছেন। তাঁর মতে, নীচুতলার এই মানুষেরা উঁচুজাতির মানুষদের সমান সুযোগ-সুবিধা পেয়ে, তাদের আচার ব্যবহার-সংস্কৃতি-অনুসারী জীবনচর্চার মধ্য দিয়েই দু চার পুরুষের মধ্যে উঁচুজাতির সমকক্ষ হয়ে উঠবে, এবং উঁচুজাতিরূপে পরিগণিত হবে। অবশ্য এ-জাতীয় ধারণার প্রথম লক্ষণগুলি প্রকাশ করেন ম্যাক্স্ হেবর। ভারতবর্ষের উদাহরণ তুলে এই ধারাকে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, কিন্তু বাস্তবে এর ফলপ্রসূতা নিয়ে অবশ্যই সন্দেহ থেকে যায়।

এদের উপর সামাজিক শোষণ আর অত্যাচারের কয়েকটি ঘটনা আমরা আগেই তুলে ধরেছি। এবার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একটি রিপোর্টের অংশবিশেষ দেখা যাক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, গুজরাট, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কেরল, রাজস্থান, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যে সমীক্ষা চালিয়ে যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তাতে দেখা যায়—

১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে পশ্চাৎপদ মানুষদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছে ৫৬৫৯৬টি, এতে নিহত হয়েছেন ১৮৫২ জন, ধর্ষিতা মহিলাব সংখ্যা ১৯৪১ জন। বেশির ভাগ রাজ্য সরকার জানিয়েছেন যে গ্রামাঞ্চলেব বিত্তশালী মানুষই এর জন্য দায়ী।

এ ধরনের ঘটনায় ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত বিহারে ৫৬৫৬টি মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু আসামীরা কেউ সাজা পায় নি। গুজরাতে ১৬২০টি মামলার

মধ্যে মাত্র ২৩টি মামলায় অপরাধীরা শাস্তি পেয়েছে। উত্তরপ্রদেশে ১৭,৪১৩টি মামলার মধ্যে মাত্র ৭২১ জন অপরাধী সাব্যস্ত হয়। মধ্যপ্রদেশে ১২,৩৫৫টি মামলার মধ্যে ৪৪৮২টি মামলার আসামী খালাস পায়, আর বেশির ভাগ মামলা মুলতুবি থাকে। এই হল সামাজিক ন্যায়বিচার।

আর কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনায় যে কোটি-কোটি টাকার হিসাব তুলে ধরেন 'আদিবাসী উন্নয়ন' প্রকল্পের নামে—তা কতটা এই মানুষদের কল্যাণে লাগে আর কতটা দেশবাসী-নামক ঠিকাদারদের পুঁজির বহর বাড়িয়ে চলে এবং আড়কাঠিরা আত্মসাৎ করে, তা ওয়াকিবহাল মহল ভালোভাবেই জানেন। জানেন কেন্দ্রীয় সরকার, জানেন প্রতিটি রাজ্যসরকারও। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে, বিহার সরকার আই-আর-ডি-পি খাতে ছোটোনাগপুরে যে টাকা ঢেলেছেন, তার অধিকাংশই লুঠ করেছে উত্তর বিহারের ঠিকাদারেরা। কারণ, প্রশাসন তাদের দখলে। এমনকি স্থানীয় বিভিন্ন প্রকল্পে ঠিকাদারদের অধীনে সামান্য যে কয়েকজন এই শ্রেণীর মানুষ শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন, তাঁরা ন্যূনতম মজুরিটুকুও পান না। কখনও-কখনও মজুরির অর্ধেক তো দূরের কথা, সিকি ভাগ জোটাও কষ্টসাধ্য। পুরুলিয়ার কাছে বিহারের চাণ্ডিলে সুবর্ণরেখা প্রকল্পের যে কাজ চলছে, সেখানে গেলেই আগ্রহী যে-কেউ তথ্যটা মিলিয়ে নিতে পারবেন। আবার সত্তর দশকের গোড়ায় নতুন করে উপজাতি উন্নয়ন এজেন্সির (ট্রাইবাল ডেভলাপমেনট এজেন্সি) মাধ্যমে বিহার অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যার আটটি জেলায় নির্দিষ্ট সময়ও কর্মসূচী-ভিত্তিক কিছু উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। এই প্রকল্প সম্পর্কে ১৯৭৮-৭৯ সালে ভারতের কমট্রোলার অ্যানড অডিটর জেনারেলের সমীক্ষা রিপোর্টটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সমীক্ষা রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে—উপজাতিদের জন্য ব্যয়িত টাকার একাংশ চিহ্নিত মানুষেরা পাননি, এবং সাহায্যপ্রাপ্তদের তালিকার এক বড়ো অংশের কোনো অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায়নি। যেমন, উড়িষ্যার কেওনঝরের ৭১৪৪০ জন সাহায্যপ্রাপ্ত উপজাতির মধ্যে ৫২৭৫ জনের কোনো অস্তিত্বই মেলেনি। বরাদ্দ টাকা সরকারি কর্মচারী আর অন্যান্যরা আত্মসাৎ করেছেন।

৪

এই অনগ্রসর মানুষের বাসস্থানের যে উল্লেখ আমরা আগেই করেছি তার অধিকাংশই ছিল তাদের নিজস্ব বাসভূমি, জীবিকার ভূমি। কিন্তু পর্যায়ক্রমে আজকে তারা অধিকাংশই জমির মালিকানা থেকে উৎখাত হয়েছে সম্পন্ন দেশবাসীর দ্বারাই, এবং পরিণত হয়েছে ভারতবর্ষের কায়িকশ্রমনির্ভর সুলভ শ্রমভাণ্ডারে। এই সুলভ শ্রমভাণ্ডারের একান্ত প্রয়োজন ছিল জমির মূলধন কেন্দ্রীভবনের ক্ষেত্রে, সরকারি-বেসরকারি শিল্পায়নের তাগিদে। আমরা সংক্ষেপে দুটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি তুলে ধরব। প্রথমটি কৃষিক্ষেত্রের, দ্বিতীয়টি শিল্পক্ষেত্রের।

বিভিন্ন সরকারি পরিসংখ্যানে এবং প্রচারমাধ্যমে আমরা প্রায়ই দেখতে পাই,

শুনতে পাই—এই পশ্চাৎপদ মানুষদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নে হাজার-হাজার একর জমি তাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। তাদের দেওয়া হচ্ছে চাষের সাজসরঞ্জাম, উপরন্তু সরকারি ঋণ। এখানে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি খুবই পরিষ্কার, তবে বাস্তব চিত্রটা কেমন, তাই আমরা দেখব। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালেই এদের মধ্যে বণ্টিত জমির পরিমাণ উল্লেখ করার মতো। যেমন, অন্ধ্রপ্রদেশে ১১০টি পরিবারকে ২৫২৯ একর, বিহারে ৩১৫১টি পরিবারকে ৫৬৪৬ একর, উড়িষ্যায় ১৩৮০টি পরিবারকে ১৯৬৮৭ একর, বোমবাই প্রদেশ ও হায়দরাবাদ রাজ্যে যথাক্রমে ৭২৯৮৫ ও ১০০৭৯ একর জমি দেওয়া হয়। এর সাথে রয়েছে বিনোবা ভাবের "ভূদানযজ্ঞের" মাধ্যমে বণ্টিত জমি। একমাত্র উড়িষ্যার কোরাপুট জেলাতেই ভূদানের মাধ্যমে ৫৯৮৫৫ একর জমি বণ্টিত হয়েছিল ২৮৭১টি পরিবারের মধ্যে ; মধ্যপ্রদেশ আর মহারাষ্ট্রে এইভাবে বণ্টিত জমির পরিমাণ বেশ ভালোই।

উপরের পরিসংখ্যান-চিত্রটি দেশবাসীকে অন্তত ভাবতে উৎসাহিত করে যে এবার অন্তত এদের একাংশ মানুষের মর্যাদায় দেশবাসীর একজন হয়ে উঠবে। বাস্তবে গিয়ে দেখা গেল, এই বিশাল বণ্টিত জমির প্রায় সবটাই পতিত পাথুরে অনুর্বর জমি। আমরা যে উদ্‌বৃত্ত শ্রমভাণ্ডারের কথা উল্লেখ করেছিলাম—সেই শ্রমভাণ্ডারই নিয়োজিত হল যেখানে সম্ভব এই পাথুরে জমিকে চাষযোগ্য করে তোলার কাজে যাতে দেশবাসীর জন্য শস্যভাণ্ডার গড়ে তোলা যায়। আজ বেশ গর্বের সাথেই ঘোষণা করা হয়, 'ভারতবর্ষ খাদ্যে স্বয়ম্ভর'—অবশ্য সেই খাদ্য কিনে খাবার ক্ষমতা অনেকেরই নেই। একবারও উচ্চারণ করা হয় না যে, ভারতবর্ষের ২০ কোটির উপর মহিলার দুবেলা পেট পুরো খাবার জোটে না, অর্ধেক ভারতবাসী অর্ধাহারে কাতরায়, আর লক্ষ-লক্ষ অনগ্রসর মানুষের অনেক দিনই কেটে যায় অনাহারে বা আম্বড়িপাতা, মহুয়া ফুল আর কন্দ খেয়ে।

আজ, ৩৩ বছর পর অনুসন্ধান করলে সরকারি ভাবেই প্রমাণিত হয়ে যাবে সেই বণ্টিত জমি যখনই শস্যশ্যামল হয়ে উঠেছে তখনই হস্তান্তরিত হয়ে গেছে দেশবাসীর কাছে। এর দ্বারা আরেকটি সমস্যারও সমাধান হয়ে গেল—জমি তৈরির কারিগরদের এক পতিত পাথুরে জমি থেকে আরেক পতিত পাথুরে জমিতে সহজেই ঠেলে দেওয়া গেল ; ফলে ওই অসহায় অভুক্ত মানুষগুলিই জমি থেকে জমিতে স্থানান্তরিত হয়ে চলে দেশের শস্যভাণ্ডারকে পূর্ণ করে তোলার জন্য। আর যেখানে তাদের হাতে জমিগুলি এখনও আছে—সেই জমিতে ফসল ফলে না, সেচের ব্যবস্থা হয় না। এর সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ সাম্প্রতিক উড়িষ্যার কোরাপুট আর কালাহাণ্ডির ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। সমগ্র কোরাপুট জেলায় মাত্র ১০ শতাংশ জমি সেচের আওতায় রয়েছে এবং বিহারের ছোটোনাগপুরে মাত্র ৭.২ শতাংশ জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে। এখানে উল্লেখ্য, ভারতবর্ষে সেচযোগ্য জমির পরিমাণ ৩৭ শতাংশ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার-গঠিত সংস্থা ট্রাইবাল ডেভেলপমেনট এজেনসি অথবা

ইনটিগ্রেটেড ট্রাইবাল ডেভলাপমেনট প্রোজেকটের মাধ্যমে এদের আর্থিক-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন আর পরিবর্তনের যে সমস্ত সংকল্প ঘোষণা করা হয়েছিল তার অবস্থা কেমন দাঁড়াল, তাও আমরা জেনে নিতে পারি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত বিশেষবহুমুখী উপজাতি ব্লক গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষির সম্প্রসারণ, ভূমিসংস্কার, সেচের ব্যবস্থা প্রভৃতি। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য এক ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচী নেওয়া হয় মহারাষ্ট্রের আকরানি মহল (পশ্চিম খান্দেশ, দাণ্ডারামপুর (পাঁচমহল), পেনটমহল (নাসিক), মধ্যপ্রদেশের দান্তেওয়াড়া ও নারায়ণপুর (বস্তার), জশপুর (রায়গড়), ভরতপুর (সুরগুজা) রাজস্থানের কুশলগড় (বাঁশোয়ারা), অন্ধ্রপ্রদেশের আরাকু ও হুকুমপেট (বিশাখাপট্টম), মারলাভাই (আদিলবাদ), উড়িষ্যার ভুইঞাপীড় (কেওনঝর), কাশীপুর (কালাহাণ্ডি), নারায়ণ পাটনা (কোরাপুট), বারুণ (ময়ূরভঞ্জ), বিহারের বিষ্ণুপুর (রাঁচি), মহুয়াডাঁর (পালামৌ), বোরিও (সাঁওতাল পরগনা), মনোহরপুর (সিংভুম)-এ। আজকে দেখা যাচ্ছে, ওই-সমস্ত এলাকার মানুষের জীবনে এই প্রকল্প কোনো কল্যাণধারাই বয়ে আনে নি। উপরন্তু, পরিহাসের বিষয় হয়, ব্লগুলিসহ আশেপাশের বিশাল এলাকার জমিও তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে ; তারা পরিণত হয়েছে উদ্‌বৃত্ত শ্রমভাণ্ডারে। তারা নিজভূমি থেকে স্থানান্তরিত।

এবার আমরা দেশের শিল্পায়নের উদাহরণটি তুলে ধরব। প্রগতির স্বার্থে, উন্নতির স্বার্থে দেশের শিল্পায়ন আমাদের অবশ্যই কাম্য। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, তাদের বসত এলাকাগুলি যখনই শিল্পায়নের প্রয়োজনে দেশের কল্যাণে অধিগ্রহণ করা হয়েছে তখন তারা সেই স্থান থেকে উৎখাত হয়েছে, হয়েছে সহায়-সম্বলহীন। কারণ, গড়ে-ওঠা কলে-কারখানায় তাদের কর্মসংস্থান হয়নি, সরকার-প্রতিশ্রুত ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসনও তারা পায়নি। সবশেষের পরিণতি : তাদের বসত এলাকায় তারা ক্রমশ হয়ে পড়ছে সংখ্যালঘু।

ছোটোনাগপুরে স্বাধীনতার সময়েও তারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ৬০ শতাংশের বেশি। কিন্তু যতই দিন গেল, শিল্প গড়ে উঠল, দেশ সমৃদ্ধ হল, দেশবাসীরা চাকরি পেল, ততই তারা হয়ে পড়ল সংখ্যালঘু। এখন তাদের সংখ্যা ৩৮ শতাংশে নেমে গেছে।

প্রথম পরিকল্পনায় উড়িষ্যায় তৈরি হল হিন্দুস্থান স্টীল প্রাইভেট লিমিটেড। উৎখাত হল ২৩৩৩টি পরিবার। পুনর্বাসন পেল মাত্র ১০৮টি পরিবার। তৈরি হল হীরাকুদ বাঁধ, আর উৎখাত হল ১৪৩৫২টি পরিবার। পুনর্বাসনের সংখ্যা ৪৬৪৪। এবং সাম্প্রতিক প্লাইউড, কাগজ-কল, দেশলাই কারখানার জন্য যে 'বনসৃজন-নীতি' নেওয়া হয়েছে, তাও গেছে এই মানুষদের বিরুদ্ধে। অরণ্যভূমিনির্ভর যে জীবিকার উৎস ছিল তাদের, এর ফলে বন্ধ হল তাও। বস্তার ছত্তিশগড় থেকে শুরু করে ঝাড়খণ্ডের সর্বত্র পাইন ইউক্যালিপটাস আকাশমণি গাছে ছেয়ে যেতে

থাকে। এই গাছগুলি তাড়াতাড়ি বাড়ে। তিন-চার বছরের মধ্যে কাগজকলে পাঠাতে বিশেষ অসুবিধা নেই। মহারাষ্ট্রে কর্ণাটকে চাষীদের জমিই লীজ নিয়ে এই গাছ লাগানো হচ্ছে। এতে কাগজকলের লাভ।[৩] এতে লাভের পরিমাণ এতই বেশি যে ভারতের এক বৃহৎ মূলধনী মফতলাল গ্রুপস মহারাষ্ট্রের এরকম অনেক মানুষের জমি নিয়ে নিয়েছে। ঠিক একইভাবে WIMCO, AMCO-র মতো বহুজাতিক সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয় গাছ লাগানো হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের কুমায়ুন, গাড়োয়াল কিংবা হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন অংশ জুড়ে।

শিল্পায়নে দেশের দেশবাসীর উন্নয়নের স্বার্থে এই নিঃস্ব মানুষদের বঞ্চনার এক উজ্জ্বল ছবি পাওয়া যায় ছোটোনাগপুর অঞ্চল জুড়ে। ভারতের মোট ভৌগোলিক সীমার মাত্র ২.৫ শতাংশ বিস্তৃতি নিয়ে এই ছোটোনাগপুর। কিন্তু ভারতের মোট খনিজ সম্পদের ২৫ শতাংশই পাওয়া যায় এখানে। কয়লা, লোহা, তামা, অভ্র, বকসাইট-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের উপর ভিত্তি করে যেমন একদিকে গড়ে উঠেছে সরকারি উদ্যোগে বড়ো-বড়ো শিল্পাঞ্চল তথা "আধুনিক ভারতের মন্দির", তেমনি বেসরকারি উদ্যোগও পিছিয়ে থাকে নি। বোকারো, রাউরকেল্লা, ভিলাই-এর ইস্পাত কারখানা, সিনধ্রির সার কারখানা, চন্দ্রপুরার তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র, হীরাকুদ বাঁধ দেশবাসীকে যতটা স্বয়ম্ভর করেছে ততটাই নিঃস্ব অসহায় করেছে এই-সমস্ত অনগ্রসর মানুষদের। আজকে এই শিল্পসমৃদ্ধ মন্দিরগুলিতে তাই আশ্রয় আর নিরাপত্তা পেয়েছে সারা ভারতের অগ্রসর সমৃদ্ধ দেশবাসী এবং তারই সাথে নিরাশ্রয় হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের সামান্য মাথা গুঁজবার জায়গাটুকু হারিয়ে, দিনান্তের সামান্য আহারটুকু সংগ্রহের অরণ্যভূমি আর চাষের জমি থেকে। এরই মর্মান্তিক পরিণতিতে তাদের জীবনে অন্ধকার গাঢ় থেকে রূঢ় হতে থাকে, তারা হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন। তারা কখনই দেশবাসী হয়ে ওঠে না—হয়ে থাকে ঔপনিবেশিক আদর্শে আর বর্তমান স্বাধীনপ্রশাসনকথিত ভাষ্যেও আদিবাসী।

৫

উপসংহারের বদলে কয়েকটি কথা :

(ক) শিক্ষায় মননে বৈভবে যে দেশবাসীরা অগ্রবর্তী তারা কি কখনো সচেতনভাবে ঘৃণা আর অবজ্ঞার দৃষ্টি সরিয়ে 'আদিবাসী' বা 'হরিজন' বা 'অচ্ছুত' তথা গোটা পশ্চাৎপদ শ্রেণীকে 'মানুষ' হিসাবে আদৌ দেখেছেন, না দেখতে চেয়েছেন? এমনকি রাজনৈতিক চেতনায় উজ্জ্বল বলে যারা দাবি করেন—তাঁরাও। আমাদের সমাজসংস্কারকরা এই মানুষদের সমস্যাগুলি দেখেছেন নিছক জাত-পাত-অস্পৃশ্যতাগত বিভেদ হিসাবে—যা উৎপাদনসম্পর্কের সাথে সম্পর্কশূন্য কিছু অন্যান্য বিষয় মাত্র। এমনকি রাজনৈতিক নেতাদেরও ধারণা হল কুসংস্কারের নিন্দা করলে, আর যারা এসবের প্রশ্রয় দেয় তাদের এসব বর্জন করতে বললেই সমস্যার

সমাধান হয়ে যাবে। এমনকি গান্ধীজীও এর বাইরে দৃষ্টিপাত করতে পারেননি। আমূল ভূমিসংস্কারের প্রসঙ্গ এড়িয়ে নিছক সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলন করে এ-সমস্যার সমাধান সম্ভব কি ?

(খ) কংগ্রেস এবং গান্ধী বোঝাপড়ার মাধ্যমে স্বাধীনতা আর ক্ষমতা পেতে চেয়েছিলেন। ক্ষমতা গান্ধী নন, কংগ্রেস পেয়েছিল। কিন্তু গোটা দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে স্বাধীনতার অর্থ দাঁড়াল : জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত, আর দেশী মন্ত্রী। স্বাধীনতার অর্থ যে এর বাইরে অন্য কিছু হতে পারে, তার আভাসও দেওয়া হল না। ফলে স্বাধীনতা-উত্তর কালে খুব দ্রুত সবারই প্রতিপক্ষ হয়ে গেল ভারতীয়। অন্য বর্গের, অন্য গোষ্ঠীর ভারতীয়। ফলে স্বাধীনতার ৪০ বছর পরেও দেখা গেল, নিম্নবর্গের মানুষদের জন্য অসংখ্য আইনকানুন কমিশন হলেও তাদের প্রতি সামাজিক নির্যাতন আর নৃশংসতার ঐতিহ্য বহমান।

এবং এই মানুষেরা যখন নিছক আত্মরক্ষার তাগিদেই সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে, তখনই গ্রামীণ কায়েমি স্বার্থ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাদের জীবনকে রক্তাক্ত করে তোলে। রাষ্ট্র কায়েমি স্বার্থের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে এবং তাদের যে-কোনো ধরনের আত্মরক্ষার চেষ্টাকেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ আর উগ্রপন্থীদের উশকানি বলেছে।

(গ) পুরনো আমলের 'ব্রাউন সাহেব'দের অর্থাৎ কংগ্রেসিদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে শাসনযন্ত্রের উপরের স্থানগুলিতে দখল নিশ্চিত হল। সাদা সাহেবদের জায়গায় ব্রাউন সাহেবদের রাজত্ব কায়েম হল। এঁরা কেউই কোনো অর্থেই নিম্নবর্গের প্রতিনিধি ছিলেন না ; কিন্তু তাঁদের একটা সর্বভারতীয় পরিচিতি ছিল। যেমন গান্ধী নেহরু রাজেন্দ্রপ্রসাদ আজাদ রাজাগোপলাচারী। অন্তত ভাষা আর আঞ্চলিকতার প্রশ্নে এঁদের আক্রান্ত হতে হয় নি। পরবর্তী ইতিহাস কিন্তু ঠিক এর বিপরীত। বিশেষ করে দীর্ঘ এক দশকের উপর সর্বস্তরে কংগ্রেসের মনোনয়নপর্বের রাজনীতি আঞ্চলিকতা আর জাতপাতের প্রশ্নকে আরো বেশি করে তুলেছে এবং প্রয়োজনমাফিক ইন্ধন জুগিয়েছে। যেমন পঞ্জাবে আসামে ত্রিপুরায় বিহারে পশ্চিমবঙ্গে। তাই দেখা যায়, বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বিভাজনের উপর দাঁড়িয়েও ঔপনিবেশিক পর্বে স্বাধীনতাকেন্দ্রিক যে অসম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল তারই পাশাপাশি নানা ধরনের ক্ষুদ্র, কোথাও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাও গড়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা দিয়ে এইসব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তখনকার মতো ঝিমিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা গেলেও—এখন আর তা সম্ভব হচ্ছে না।

(ঘ) শতাংশে জনসংখ্যার সামান্য হলেও নব শিক্ষিত নিম্নবর্গের মানুষ বুঝতে পারছেন স্বাধীনতার ৪০ বছর পরেও তাঁদের বাস্তব অবস্থাটা কেমন। এবং এই বাস্তবতা বুঝবার জন্য মিশনারি বা বিদেশী ইন্ধনের প্রয়োজন হয় না। স্বাধীনতার পরবর্তী প্রতিটি স্তরেই দেখা যাচ্ছে ক্ষমতা ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে আরো বেশি করে।

তা রাজনৈতিক প্রশাসনিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক দলীয় সংগঠন—যে দিক থেকেই দেখা যাক না কেন। এ ছাড়া নিম্নবর্গের এই মানুষদের যে-কোনো সমস্যাকে, তাদের সংস্কৃতিকে ঘৃণার চোখে দেখার ফলে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের অতিকেন্দ্রিকতা আরও বাড়ছে। ফলে নিম্নবর্গের যে-কোনো আন্দোলনকেই জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক তথা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আন্দোলন বলে চিহ্নিত করা সহজ হচ্ছে। এমনকি বিদেশী চক্রের পদধ্বনিও অনেক সহজেই শোনা যাচ্ছে। মূল সমস্যা হচ্ছে নিম্নবর্গের মানুষেরা এখন আর দেশের নীরব নাগরিক না থেকে সরব দেশবাসী হতে চাইছে। চাইছে তাদের পাওনা গণ্ডা বুঝে নিতে, প্রয়োজনে যুঝে নিতে।

(ঘ) দীর্ঘ সময় ধরে ভারতবর্ষে সমতার আদর্শে সমাজতন্ত্রের-আওয়াজ-তোলা বিভিন্ন দল উপদল নানাভাবেই সমাজের অগ্রসর মানুষদের সংগঠিত করার চেষ্টা চালিয়েছেন আর ভেবেছেন, সমস্ত নিপীড়িত মানুষেরা তাঁদের আওয়াজ শুনেই স্বেচ্ছায় দলের পতাকাতলে শামিল হবে। এমনকি বিভিন্ন পর্যায়ে বামপন্থী দলগুলিও, উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি ক্ষেত্র বাদে, সমগোত্রীয় ভাবের রাজ্যে বিরাজ করেছেন। ফলত, ভারতবর্ষের বিস্তৃত অংশের এই মানুষেরা কখনো আম্বেদকর, কখনো গান্ধী, কখনো জগজীবন রাম, কখনো কাশীরাম-এর নেতৃত্বে আশ্রয় পায়; কিন্তু পায় না মুক্তির পথ।

(চ) ঔপনিবেশিক শাসনে ১৮৭৪ সালে বাঙলা থেকে আসাম আলাদা হল। ১৯১২ সালে কলকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পর্বে বিহার আর উড়িষ্যা বাঙলা থেকে বিচ্ছিন্ন হল। ১৯৩৬ সালে বিহার থেকে উড়িষ্যা আলাদা হল। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে ১৯৫৩ সালে রামালুর নেতৃত্বে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ তৈরি হল। ১৯৬০ সালে বোমবাইকে ভেঙে মহারাষ্ট্র আর গুজরাতের জন্ম হল। ১৯৬৬ সালে হল পাঞ্জাব আর হরিয়ানা। বিভিন্ন পর্বে আসামকে ভেঙে তৈরি হল আলাদা রাজ্য—মিজোরাম, মেঘালয়, নাগাল্যানড, অরুণাচল প্রদেশ। এসব ক্ষেত্রে কিন্তু দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ একবারও বিচ্ছিন্নতাবাদের কথা তুললেন না। এমনকি ১৯৮০ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় যে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সাথে কংগ্রেস গাঁটছড়া বাঁধল তারাই এখন ঝাড়খণ্ড আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতা-বাদী বলে আওয়াজ তুলেছে। নতুন রাজ্য তৈরী হলেই যে সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না, তার প্রমাণ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে-কোনো রাজ্যের বর্তমান অবস্থা। পাঞ্জাব আর হরিয়ানার মধ্যে বিভিন্ন বিরোধও একথাই প্রমাণ করে। বা মহারাষ্ট্রের সাথে ভাষা প্রশ্নে গোয়া আর কর্ণাটকের বিরোধ তুলে ধরা যেতে পারে। তাই আলাদা রাজ্য মানেই সব সমস্যার সমাধান নয়। আসলে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় প্রশাসন সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক দিক থেকে আধিপত্যকারী গোষ্ঠীগুলির কাছে মাথা নত করে বারংবার পৃথক রাজ্য করতে বাধ্য হয়েছেন। অবশ্য অবদমিত নিম্নবর্গের কথা আলাদা।

(ছ) সুতরাং ক্ষমতা আর মূলধনের কেন্দ্রীভবন ঘটছে যেমন একদিকে, তার বিপরীতে কেন্দ্রীভবন ঘটছে দারিদ্র্য আর অবিচারের। গত ৪০ বছরের এটাই হচ্ছে দ্রুত-বিকশিত শ্রেণী-বাস্তবতা। তাই দেখা যায়, দেশে সম্পন্ন মুষ্টিমেয় দেশবাসীর পাশাপাশি দরিদ্রতম অসংখ্য নিঃস্ব পশ্চাৎপদ মানুষ। কিন্তু ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য আর অবিচার যে শ্রেণীচেতনার বিকাশ ঘটায় না ভারতবর্ষের আজকের সমস্যা সেই সত্যকেই তুলে ধরছে। শ্রেণীচেতনার বিকাশের জন্য দরকার নিরন্তর সংগ্রাম আর সচেতন প্রয়াস। সর্বোপরি নিজস্ব শ্রেণীসচেতন সংগঠন।

তথ্যসূত্র

১. Dr. Verrier Elwin, Presidential Address, Section of Anthropology and Archaeology, Indian Science Congress 1944.

২. এম. কে. গান্ধী, 'ইয়ং ইনডিয়া', অকটোবর, ১৯২১।

৩. আদিবাসী অর্থনীতি ও ভূমিব্যবস্থা, ১ম খণ্ড, পশুপতিপ্রসাদ মাহাতো, ১৯৮৪।

৪. Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (K. K. Commission).

৫. Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (B. P. Mondal Commission)

৬. India : A Reference Annual (different years), Publication Division, Govt of India.

৭. Census of India (different years).

ম্যাক্স হেবার ও ভারতে জাতপাতের প্রশ্ন

সৌরীন ভট্টাচার্য

জাতি ও আদিবাসী

আদিবাসীর সঙ্গে প্রতিতুলনায় জাতির তফাত নির্দেশ করতে গিয়ে ম্যাক্স হেবার পাঁচটি প্রধান চরিত্রের উল্লেখ করছেন : ১. আঞ্চলিক নির্দিষ্টতা ২. পেশাগত বিশেষায়ণ ৩. সামাজিক স্তরবিন্যাস ৪. রাজনৈতিক মাত্রা ও ৫. সামাজিক মাত্রা। আঞ্চলিক নির্দিষ্টতা বলতে এ কথাই বোঝানো হচ্ছে যে, এক এক আদিবাসীর জন্য এক একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল আছে, কিন্তু জাতের বেলায় তা নেই। ম্যাক্স হেবার এখানে যে কথা বলতে চাইছেন তা হল যে একটা নির্দিষ্ট আদিবাসী কোনো একটা বিশেষ অঞ্চলে স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন যাপন করে। সেই অঞ্চলের প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত। একটা অঞ্চলে বসবাসকারী ঐ নির্দিষ্ট আদিবাসী অন্য অঞ্চলের বসবাসকারীদের থেকে আলাদা, কিন্তু এদের নিজেদের মধ্যে অন্তর্বিন্যস্ত অন্য কোনো ফারাক নেই। মনে হয় এটাই হেবারের বলার প্রধান কথা। জাতির বেলাতে ব্যাপারটা এমন নয়। সেখানে একই নির্দিষ্ট অঞ্চলে হয়ত কোনো একটি প্রধান জাতিকে অন্যান্য আরো পাঁচ জাতের লোকের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকতে হয়। এক্ষেত্রে অতএব আঞ্চলিক সীমানাই একমাত্র ভেদাভেদের সীমারেখা নয়। অঞ্চলের মধ্যেও অন্তর্বিন্যস্ত অনেক ভেদাভেদ থাকে। বর্তমান প্রসঙ্গে ধারণাটা পরিষ্কার করার জন্য আমরা বামুনপাড়া, কায়েতপাড়া, গোয়ালপাড়া ইত্যাদি উদাহরণের কথা ভাবতে পারি। এসব তো এক হিসেবে আঞ্চলিক ফারাক বা নির্দিষ্টতারই নমুনা। কিন্তু আদিবাসীর ক্ষেত্রে আঞ্চলিক নির্দিষ্টতা বলতে যা বোঝাবে তার থেকে এ আলাদা। আমাদের বামুনপাড়ার মধ্যে বামুনরাই প্রধান, তবে হয়ত ধোপা-তাঁতিও থাকে কয়েক ঘর করে। কোনো একটা নির্দিষ্ট জাতের লোকের প্রাধান্য হলেও নানা জাতের এই মিশ্রণ হেবারের মতে জাতিপ্রথার একটা চরিত্র। আদিবাসীর বেলায় অঞ্চলের ভেতরকার জীবনে এক ধরনের সমতা (স্তরবিন্যস্ত নয় এই অর্থে) লক্ষণীয়।

এই মিশ্রণের সঙ্গে পেশাগত বিশেষায়ণের প্রশ্ন জড়িত। ম্যাক্স হেবারের মতে আদিবাসীর সামাজিক জীবনে পেশাগত বিশেষায়ণের প্রশ্ন তেমন জরুরি নয়। অর্থাৎ, পেশা বা বৃত্তি হিসাবে একই আদিবাসীর মধ্যে মৌলিক গোষ্ঠীবদ্ধতার নমুনা বিশেষ পাওয়া যাবে না। কিন্তু তিনি মনে করেন যে, জাতিপ্রথার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই মৌলিক বৃত্তিনির্ভর বিশেষায়ণ। অর্থাৎ জাতিপ্রথার যে সামাজিক স্তরভেদ তা আসলে বৃত্তি বা পেশানির্ভর স্তরবিন্যাস। এই প্রসঙ্গে তাঁতি, জেলে, জোলা,

কামার, কুমোর, বেনে ইত্যাদি নানা রকমের বৃত্তিনির্ভর মৌলিক গোষ্ঠীর কথা স্বভাবতই সবার মনে পড়বে। কিন্তু এদের প্রকৃত স্বরূপ ও সামাজিক তাৎপর্য সম্বন্ধে ম্যাক্স হ্বেবার যত নিশ্চিন্ত হয়ে রায় দিচ্ছেন তা দেওয়া একটু শক্ত। কারণ, এই বৃত্তিনির্ভর বিশেষায়ণের ব্যাপারে এত রকমের ফারাক আছে যে এর প্রকৃত চেহারা সত্যিই কী তা বলা মুশকিল। বিভিন্ন অঞ্চলে এই বৃত্তিনির্ভর কৌলিকতা নিয়ে নানা রকমের নমুনা মিলবে। সাধারণ সূত্রে পেঁছিনো বেশ শক্ত। যেমন, এমন উদাহরণ পাওয়া যাবে যেখানে জাত হিসেবে যাদের চাষ করবার কথা নয় তারা চাষের কাজ করছে। আধুনিক গবেষণার ভিত্তিতে এমন একটা প্রশ্ন অনেকে তোলেন : জাত বা বৃত্তির মধ্যে সম্পর্কটা কি প্রতিন্যাসের? নাকি এখানে এক ধরনের প্রতিন্যাস আমাদের কাল্পনিক? এ ব্যাপারে হ্বেবারীয় চিন্তার ধরনটা বুঝতে গেলে এটা মনে রাখতে হবে যে, আঞ্চলিক ভিন্নতার নজির তিনি অস্বীকার করবেন তা ঠিক নয়। তিনি বরঞ্চ বলবেন যে, বিভিন্ন অঞ্চলে যে নানা রকমের মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায় তা আসলে জাতিপ্রথার শিথিলতার নমুনা। প্রথার মূল রূপ ছিল কঠোর, নির্দিষ্ট, বৃত্তিনির্ভর কাঠামোয় বাঁধা। তারপর সময়ের সঙ্গে, অন্যান্য নানা রকমের সামাজিক পরিবর্তনের চাপে প্রথার মধ্যে শিথিলতা এসেছে। বৃত্তির মিশ্রণ হ্বেবারের মতে এই শিথিলতার নমুনা। প্রাচীন বর্ণব্যবস্থা, পরবর্তীকালের জাতিপ্রথা, বৃত্তিগত সামাজিক স্তরবিন্যাস এইসব বিভিন্ন মাত্রার মধ্যেকার সম্পর্ক সরল তো নয় বটেই, উপরন্তু এই সম্পর্কের আঞ্চলিক ফারাকও যথেষ্ট। ম্যাক্স হ্বেবারের পক্ষে হাতফেরত তথ্যের ভিত্তিতে এই জটিল প্রশ্নের সাধারণগ্রাহ্য উত্তরে পেঁছিনো খুব সহজ কাজ ছিল না। বিশেষত অপরিচিত সমাজকাঠামোয় অন্তর্বোধের যে-দুস্তর ব্যবধান থাকে তার জন্যে একাজ আরো কঠিন।

আদিবাসী ও জাতির তফাত নির্দেশ করতে গিয়ে ম্যাক্স হ্বেবার আর এক দিক দিয়ে প্রশ্নটা বিচার করছেন। সামাজিক মানমর্যাদার মাপকাঠিতে একটা বিচারের কথা ভাবছেন তিনি। তাঁর মতে একই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা রকমের মানমর্যাদাসম্পন্ন লোক থাকতে পারে। এই মানমর্যাদা কিসের বিচারে ঠিক হবে সে সম্বন্ধে হ্বেবার নীরব। হতে পারে ঐ আদিবাসী জীবনের অভ্যন্তরীণ প্রথানির্দিষ্ট ক্ষমতা বা অধিকার বা দায়িত্বের ভিন্নতার ওপর নির্ভর করে এই মানমর্যাদার স্তর। যা দিয়েই নির্ধারিত হোক না কেন হ্বেবারের মতে জাতির সঙ্গে একটা বড় তফাত এখানে যে, একই জাতির মধ্যে এরকম নানা স্তরের মানমর্যাদাসম্পন্ন লোকের দেখা মিলবে না। একটা জাতির মধ্যে ঐ মানমর্যাদার বিচারে সবই একই স্তরে অবস্থিত। অনেক সময়ে একটু বাইরে থেকে দেখলে হঠাৎ মনে হতে পারে যে, জাতির মধ্যেও নানা স্তরের লোক রয়েছে। ম্যাক্স হ্বেবার বলেন তা কিন্তু নয়। কারণ, একই জাতির মধ্যে যাদের ভিন্নস্তরভুক্ত মনে হচ্ছে তারা আসলে ঐ জাতির সংশ্লিষ্ট উপজাতি। জাতি ও উপজাতির মধ্যে সীমারেখা নির্দেশ করা নিশ্চয়ই

শক্ত। তবে হেবার মনে করেন যে, বিভিন্ন জাতি নিয়ে যেমন একটা গোটা সমাজ, তেমনি বিভিন্ন উপজাতি নিয়ে একটা গোটা জাতি। ঠিক মতো খুঁটিয়ে তথ্যের নিরিখে দেখতে গেলে এখানেও সাধারণ কোনো সূত্রে পেঁছনো শক্ত। কারণ উপজাতি কতটুকু জাতির অন্তর্গত আর কতটুকুই বা তা স্বাধীন অস্তিত্বসম্পন্ন এ প্রশ্নের কিনারা করা সোজা হবে না। অন্তত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে এর উত্তর আলাদা হবেই। এ জটিলতার ইঙ্গিত স্পষ্ট করে না হলেও প্রচ্ছন্নভাবে হেবারের রচনায় মিলবে। তিনি সচেতন যে, অনেকে ক্ষেত্রে উপজাতি হয়ত নেহাতই জাতির নামটা ব্যবহার করছে। তার বেশি আর কোনো মিল নেই। অর্থাৎ, উপজাতি প্রায় যেন স্বতন্ত্র জাতি। ঐ নামের ব্যবহারও বড় জোর কিছুটা ঐতিহাসিক স্মৃতি বহন করছে মাত্র। বিভিন্ন জাতি সমাজের মধ্যে পরস্পর যে-কাঠামোতে অন্বিত থাকে একটা জাতির মধ্যে বিভিন্ন উপজাতি যেন ঠিক সেরকম থাকে। আসলে বৃহত্তর সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে জাতির যে-কাঠামোগত অবস্থান বা পরিচয়, একটা জাতির মধ্যে উপজাতির সেই পরিচয়।

আদিবাসীর সঙ্গে জাতির তফাতের আলোচনায় এর পরে ম্যাক্স হেবার যোগ করছেন একটা রাজনৈতিক ও সামাজিক মাত্রা। তাঁর মতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের একটা রাজনৈতিক মাত্রা আছে যা জাতির মধ্যে খুব একটা নেই। আদিবাসী একটা রাজনৈতিক সংগঠনও বটে। জাতি কিন্তু তেমন নয়। হেবার এই প্রসঙ্গে লক্ষ করছেন যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে, অর্থাৎ বিভিন্ন প্রদেশে একই জাতের লোকের দেখা মিলবে। এর থেকে ম্যাক্স হেবারের মনে হচ্ছে যে, অন্তত জাতি হিসেবে তারা কোনো রাজনৈতিক মাত্রা পাচ্ছে না। আদিবাসীর রয়েছে খানিকটা আঞ্চলিক, সীমাবদ্ধ, ভৌগোলিক অস্তিত্ব, এক কথায় একটা স্বয়ংসম্পূর্ণতা, আর তার জন্যেই আদিবাসীকে তার সমগ্রতার একটা রাজনৈতিক মাত্রাও অর্জন করতে হচ্ছে। জাতি এই অর্থে কোনো সমগ্র সামাজিক জীবনের স্বরূপ নয়। তা সামাজিক জীবনের খণ্ডিত কোনো অংশের প্রতিরূপ। যেমন, জাতিকে তিনি মূলত পেশাগত বা বৃত্তিগত বিন্যাস হিসেবে দেখছেন, কখনো বা একটা সামাজিক সঙ্ঘের মতো। কিন্তু তার রাজনৈতিক মাত্রা কিছুতেই প্রধান নয়। যদিও জাতপাতের প্রশ্ন রাজনীতিতে অনেক সময়ে খুব বড় হয়ে উঠতে পারে। সমকালীন ভারতে তো তার ক্লিন্ন অভিজ্ঞতা আমাদের সকলের। এমনকি আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বেও নানা রকম রাজনৈতিক সমস্যা ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া জাতিপ্রশ্নের ঘূর্ণিতে আটকে গেছে বারবার। এই প্রসঙ্গে ম্যাক্স হেবার মধ্যযুগের ভারতের, বিশেষত বাংলার উদাহরণ উল্লেখ করেন। এমন উদাহরণ মাথায় নিয়েও ম্যাক্স হেবার যে কথাটা বলার চেষ্টা করছেন তা বোধ হয় বুঝতে পারা যায়। গোটা সমাজজীবনের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার কাঠামো যদি সমাজের রাজনৈতিক বিন্যাস বলে ধরা হয় তাহলে শুধু জাতির মাত্রায় সেই ক্ষমতার পূর্ণরূপ চিনে নেওয়া যাবে না। এ ব্যাপারে জাতির সম্ভাবনা

আংশিক মাত্র। আদিবাসীর ধারণা যেহেতু গোটা সমাজবস্তুকে স্পর্শ করে তাই এর বেলাতে ঐ রাজনৈতিক মাত্রা খুব স্পষ্ট।

এখানে বোধ হয় একটা বিপদের ইঙ্গিত লক্ষ করে যাওয়া উচিত। ম্যাক্স হ্বেবারের চিন্তায় রাজনৈতিক মাত্রা নিয়ে জাতি ও আদিবাসীর যে তফাত সেটা নির্ভর করছে জাতিপ্রথা সমাজজীবনের কতটা অংশ জুড়ে আছে তার ওপর। জাতিবিন্যাস সমাজজীবনে কী কাজ করছে বা কী ভূমিকা পালন করছে এই ধরনের একটা কর্মমুখী প্রশ্নের উত্তরের ওপরে এই রাজনৈতিক মাত্রা আছে বা নেই তা অনেকাংশে নির্ভর করছে। ম্যাক্স হ্বেবার যেমন ভাবছেন যে, জাতিপ্রথা মূলত বৃত্তি-নির্ভর সামাজিক বিন্যাস, নির্দিষ্ট পেশাতে আবদ্ধ হওয়াই তার কর্মমুখী নিয়তি। সেক্ষেত্রে একথা ঠিক যে সমাজজীবনের অনেক কিছুই তার আওতার বাইরে থাকছে এবং সেই কারণেই সে রাজনৈতিক মাত্রা অর্জন করতে পারছে না। কিন্তু বিপদ হল যে, জাতির প্রশ্ন যদি একদিন সত্যিই সমাজজীবনের বেশি জমি অধিকার করে নেয়? যদি আমাদের জীবনের এমন কোনো অংশই আর বেশি বাকি না থাকে যা জাতপাতের বিচারে বাইরে পড়ে? এই বিপদের কথাই বলছিলাম, যার জন্য এই মুহূর্তে আমাদের বিচার সদাজাগ্রত রাখতে হবে। নইলে তা আদিবাসীর মতো রাজনৈতিক মাত্রাও অর্জন করবে আবার জাতিপ্রথার মতো খণ্ডিত গণ্ডীবদ্ধও থাকবে। বিপদ সেখানেই।

সামাজিক মাত্রার দিক দিয়েও ম্যাক্স হ্বেবার মনে করেন যে, জাতি ও আদিবাসীর মধ্যে একটা বড়ো রকমের তফাত রয়েছে বিধিনিষেধের কড়াকড়িতে। খাবারদাবারের আচার-বিচার, পংক্তি ভোজন, জলচল না অচল ও সর্বোপরি বিবাহের ব্যাপারে নিষেধ-নির্দেশ এ প্রসঙ্গে প্রধান বিবেচ্য। সাধারণভাবে হ্বেবার মনে করেন যে, এর প্রত্যেকটাতে বাধানিষেধের কড়াকড়ি জাতপাতের ক্ষেত্রে অনেক বেশি। একসঙ্গে খেতে না পারা, জল ছুঁতে না পারা, এক কুয়ো থেকে জল নিতে না পারা, স্বাধীন নির্বাচন মতো বিয়ে করতে না পারা, এই ধরনের নানা রকমের না পারার বা অক্ষমতার উদাহরণ জাতিপ্রথাক্লিষ্ট সমাজে যত বেশি আদিবাসীর সামূহিক জীবনে তত নয়। ম্যাক্স হ্বেবার আলোচ্য পাঠ্যের গোড়ার দিকে ঠিকই লক্ষ করেছিলেন যে, যত দিন যাচ্ছে এইসব বিধিনিষেধও তত শিথিল হয়ে আসছে। এবং এই জাতিশিথিলতা এক অর্থে প্রগতির লক্ষণ। যে অর্থে প্রগতির লক্ষণ বলা হল একটা স্তরে তার মধ্যে বুর্জোয়া সমাজবিন্যাসের ব্যক্তিপ্রধান প্রবণতা নিশ্চয়ই লক্ষ করা যেতে পারে। যদিও অন্যরকম সমাজবিন্যাসের সম্ভাবনা এতে করে মোটেই অস্বীকৃত হয় না। পুঁজিপ্রধান ধনতান্ত্রিক বিকাশই যে প্রগতির একমাত্র পন্থা নয় এটা মনে রাখা ভালো। সমাজজীবনে, 'সামূহিকতা' শব্দটির মধ্যে কিছুটা অবাঞ্ছিত অনুষঙ্গ থাকতে পারে। কেননা, সামূহিকতা বলতে সবটা মিলিয়ে মিশিয়ে এক করে নেওয়া বা দেওয়া যদি [illegible] তাহলে এর মধ্যে আদেশনামানির্ভর নিয়ন্ত্রণবাদ থেকে ফ্যাসিবাদ পর্যন্ত

বিশ শতকী অনেক ঘৃণ্য তন্ত্রের সঙ্গে এর মিল বা অন্তত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যেতেই পারে। তাই এর বদলে সার্বিকতা শব্দটি ব্যবহার করা যাক। সার্বিকতা বলতে আমরা বোঝাচ্ছি সবকিছু বা অনেক কিছুকে একসঙ্গে স্পর্শ করতে পারা, সবকিছু মিলিয়ে মিশিয়ে এক করে দেওয়া নয়। আমাদের আয়োজনের বা কর্মের পরিধির বিস্তৃতির কথা ভাবছি; বিভিন্নতা, বৈচিত্র্য বা স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়ে দেবার চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই। যে-কথা বলার জন্য এই দুই শব্দের অবতারণা তা এই যে, জাতিশিথিলতা বমে আসার সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসী জীবনের সামূহিকতার দিকে যেতে হবেই তারও যেমন কোনো মানে নেই, তেমনি উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ চিহ্নিত হতে হবে তারও তেমন কোনো কথা নেই। আদিবাসীজীবন মূলত সামূহিকতার লক্ষণাক্রান্ত কিনা, বা তার মধ্যেও সার্বিকতার চিহ্ন দেখা দিচ্ছে কিনা এই তথ্যবিতর্কে আপাতত প্রয়োজন নেই; সমাজমুখীন বিকশিত ব্যক্তিময় এক ধরনের সার্বিকতাও যে আমাদের লক্ষ্য হতে পারে আপাতত বলার কথা এটুকু। তবে ম্যাক্স হেবার যখন সামাজিক মাত্রায় জাতিশিথিলতার কথা ভাবছেন তখন তিনি সম্ভবত ব্যক্তিনির্ভর বুর্জোয়া বিকাশকেই প্রগতির সমার্থক মনে করছেন। আর ঐ শিথিল হয়ে আসার প্রশ্নে ম্যাক্স হেবারের রচনাকালের প্রায় সত্তর বছর পরে এসেও আমাদের মনে হয় সত্যিই কতটুকু শিথিল হল। কালাপানি পার হওয়া আজ আর কোনো ব্যাপার নয় ঠিক, তবে ছায়া মাড়ালে জাত যাওয়া তো আজও সত্যি। একুশ শতকের মুখে দাঁড়িয়েও আজ এই জাতপাত থেকে মুক্তির কোনো দিশা দেখা যাচ্ছে না।

হিন্দুদের জাত ও বর্ণপ্রথা

আনন্দগোপাল গুপ্ত

সমাজবিদ লুই ডুমন্ট এর মতে জাত ও বর্ণ এক নয়। 'বর্ণ'কে তিনি বর্ণনা করেন 'ক্যাটিগরি' অর্থাৎ বর্গ হিসাবে। বর্ণ হচ্ছে বিভাজনের বর্গ, আর 'জাত' হচ্ছে যথার্থ মনুষ্যত্ব বিন্যাসেই যাকে চেনা যায় আর পৃথিবীর সর্বত্র সেটা ঠিক এক-ভাবে বিন্যস্ত হয়নি। ভারতে জাতকুলমান বিন্যাসে জন্মসূত্রের সংস্কার-অধিকার যে বৈশিষ্ট্য এনেছে তিনি তার ভিতরকার সামাজিক ভাবাদর্শকে বড়ো করে দেখাতে চেয়েছেন। হিন্দু জাতিভেদ প্রথার যেমন একটা অর্থনৈতিক বা ব্যবহারিক দিক ছিল তেমন ছিল একটা ধর্মীয় দিক। দুটিই ছিল সমান তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন সামাজিক গতিশীলতার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তা সার্থক হতো তখনই যখন কোন জাতির ধর্মীয় পদমর্যাদা বৃদ্ধি পেত এবং সেই উন্নত পদমর্যাদা স্থানীয় হিন্দুসমাজ মেনে নিত। ডুমন্ট-এর মতে এই ধর্মীয় পদমর্যাদা স্থির হতো শুচি-অশুচির মাপকাঠিতে যার নাম তিনি দিয়েছেন পিওরিটি পলিউসন স্কেল। অর্থাৎ কোন্ জাতি কতটা শুচি অথবা অশুচি সেই নিরিখে ঠিক হতো তার সামাজিক স্থান। সাধারণ মানুষের চেতনায় এই ধর্মীর আচার-বিচারের দিকটি ছিল বিশেষ অর্থপূর্ণ। এই ধর্মীয় দিকটির গুরুত্ব স্বীকার করতেই হয়। কারণ বাংলা দেশেও জাতিগুলির আচারগত স্থান নির্ণয় করা হতো এই মাপকাঠিতে—কাদের বাড়িতে সৎ-ব্রাহ্মণরা পুজো করবেন অথবা কাদের ছোঁয়া জল গ্রহণ করা যাবে, এই সমস্ত আচার-বিচারের মধ্যে দিয়েই শুচি-অশুচির আপেক্ষিক বিচারের বহিঃপ্রকাশ ঘটতো।

জাতিভেদ প্রথা যেমন এদেশে খুবই পুরোনো, এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপক্ষপাতী ব্যবহারও তেমনি বড় কম পুরোনো নয়। যারা করে 'জাতের নামে বজ্জাতি সব' বলে স্বদেশী যুগের যে প্রতিবাদ আইন মোতাবেক সমস্ত ব্যক্তির সমান সুযোগ সুবিধার রক্ষার্থে আন্দোলন গড়ার জন্যে যে প্রতিবাদ আর ভক্তিভাব কিংবা ভালবাসার বেগে জাতপাত না-মানা প্রতিবাদ, এই ধরণগুলোর ভেতরে পরিষ্কার অনেকটা পার্থক্য আছে। তবে একথাও অস্বীকার করা যায় না যে দলবদ্ধভাবে জাতবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন কিংবা বিধান যখন ছিল না তখনো ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতিবাদী ভাবনার প্রতিভূ হিসেবে বহু সম্মানিত ব্যক্তিকে পাওয়া গেছে যাঁরা সমাজের সকলের আচরিত রীতি মানেননি কিন্তু সমাজ যাঁদের এখনও মান্য করে। এই প্রতিবাদে কিন্তু জাত বিবেচনায় খুব বড়রকম কোনো হেরফের দেখা যায়নি। বরঞ্চ এই প্রতিবাদী মানুষ-গুলির মত ও পথকে কেন্দ্র করে যাঁরা অন্যভাবে জীবনযাপন করতে গিয়েছেন, দেখা গেছে পরবর্তীকালে তাঁরা একটি নতুন 'জাত'-এ পরিণত হয়ে গিয়েছেন।

পৃথিবীর সর্বত্রই যেমন নানা কারণে, নানা আকারে সামাজিক বৈষম্য এসেছিল

ভারতীয় ভূখণ্ডেও তেমনিই বৈষম্য এসেছিল। প্রাচীন সেই ভেদাভিন্নতায় কতকগুলি কর্মগতবৃত্তি এবং পদমর্যাদার উচ্চনীচাবস্থান ভারতে ইন্দো-আর্যগোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের আগমনের পূর্বে এরকম কাঠামো পেয়েছিল। 'জাত' ছিল তখন থেকেই। এর সঙ্গে চতুর্বর্ণ তথা বর্ণাশ্রম বিভাজনের কোন সরাসরি যোগাযোগ নেই। বর্ণ, বর্ণাশ্রম এসব ইন্দো-আর্যগোষ্ঠীর ভাবনা। তারা যখন এই ভাবনা এবং বেদ নিয়ে উত্তরভারতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে তখন এক-এক বর্ণের ভিতরে জাতকে বিন্যস্ত করে সামাজিক সংস্থান দেওয়া সংহিতার কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এই কাজের সর্বপ্রথম এবং সুসংবদ্ধ বর্ণজাতি সংশ্লিষ্ট বিধিনিয়মের বিবরণ লিখিতভাবে মিলেছে মনুসংহিতাতে। আমরা সবাই প্রাচীন আর্য সমাজের বর্ণভিত্তিক গঠনের কথা জানি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন দ্বিজ আর্য বর্ণের সঙ্গে পরে যুক্ত হয়েছিল অনার্য শূদ্ররা, আর্যরা যাদের প্রথমদিকে দাস বা দস্যু বলে অভিহিত করতো। এই প্রাচীন সমাজ-বিন্যাস প্রথমে ছিল গুণ-ভিত্তিক, কিন্তু পরে হয়ে দাঁড়ালো জন্মভিত্তিক। শুধু তাই নয়, বিয়ে-সাদি ও অন্যান্য সামাজিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিধি-নিষেধের প্রাচীর উঠতে লাগলো ক্রমেই। সমাজের আয়তন যতই বাড়তে লাগলো, সমাজ-বিন্যাস হয়ে দাঁড়ালো ততই জটিলতর। পুরাণ এবং ধর্মশাস্ত্রগুলির মতে এই জাতিগুলি সৃষ্টির প্রধান কারণ ছিল বর্ণসংকর। আবার এই জাতিভেদ প্রথার সঙ্গে অর্থনীতির এক নিগূঢ় সংযোগ ছিল। কারণ প্রত্যেক জাতির জন্যে নির্দিষ্ট একটি বিশেষ বৃত্তি ছিল। কারুর পক্ষেই এই জাত-পেশা ছেড়ে অন্য কিছু করা সম্ভব ছিল না। তেমনি আবার জাতিগত বৃত্তিতে নিয়োজিত থাকলে জীবিকা নির্বাহেরও কোন সমস্যা হতো না। উৎপাদন-ব্যবস্থায় এই ধরনের শ্রম-বিভাজনের ফলে প্রত্যেকজাতি ছিল অন্য জাতিগুলির ওপর নির্ভরশীল। কাজেই অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার কোনো অবকাশ ছিল না। অন্যদিকে প্রতিটি জাতিরই একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় স্থান ছিল, যা নির্ণীত হতো শুচি-অশুচির মাপকাঠিতে নির্ধারিত এক ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ অনুসারে। এই শুদ্ধ বা অশুদ্ধের বিচার নানারকমভাবে হয়ে থাকলেও কোন কোন ইতিহাসবেত্তার মতে সাধারণত আর্থিক প্রাচুর্যযুক্ত জাতগুলিই সামাজিক মর্যাদায় ওপরের দিকে থাকতো। আর ধর্মীয় আচার-বিচারের দিক দিয়েও তাদেরকেই বেশি শুদ্ধ বলে মনে করা হতো অধিকাংশ ক্ষেত্রে। তবে মর্যাদার এই ক্রমবিভাগ কোনো কালেই একেবারে অনমনীয় বা অপরিবর্তনীয় ছিল না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাত তাদের স্থান পরিবর্তন করেছে। কৃষির প্রসার ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতি এবং নতুন কারিগরি কৌশলের উদ্‌ভাবন প্রভৃতি নতুন নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার ফলে অনেক নিচুজাতি আর্থিক দিক দিয়ে উন্নতি সাধন করেছে এবং উচ্চতর মর্যাদার আসন দাবি করেছে। প্রচলিত সামাজিক সংগঠনের মধ্যেই তাদের সেই দাবি স্বীকৃত হয়েছে। অর্থাৎ সামাজিক গতিশীলতাকে মেনে নেওয়া হয়েছে, যার ফলে হিন্দুসমাজের নিচুতলার অসন্তোষকে প্রশমিত করা

গেছে। সামাজিক গতিশীলতার প্রথমটি হলো—একটি জাতির মধ্যেই একটি গোষ্ঠীর সামাজিক গতিশীলতা, যেমন একটি কুলীন শ্রেণী সেই জাতির বাকি অংশের চেয়ে বেশী সম্মানীয় বলে পরিচিত হতো। দ্বিতীয়ত—কোন কোন জাতি কখনো কখনো অধিকতর সামাজিক সম্মান অর্জন করতো, যদিও তার ফলে তাদের জাতিগত স্থানের বিশেষ পরিবর্তন হত না। তৃতীয়ত—একটি জাতির মধ্যে একটি গোষ্ঠীর নতুন জাতি-নাম ধারণ এবং সেই সূত্রে উচ্চতর সামাজিক সম্মান দাবি করা। আর চতুর্থত—সম্পূর্ণ নতুন জাতির গঠন এবং জাতিকাঠামোয় তাদের উচ্চতর স্থানলাভ। এই সমস্ত গতিশীলতাই দেখা দিত প্রধানত বৃত্তিপরিবর্তন থেকে। অর্থাৎ কিছু লোক তাদের জাতিগত বৃত্তি ত্যাগ করে নতুন বৃত্তি গ্রহণ করতো, যে নতুন বৃত্তিগুলি ছিল অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক বেশি লাভজনক। সামাজিক গতিশীলতার ক্ষেত্রে Sanskritisation (সংস্কৃতায়ন) প্রক্রিয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নিচুজাতিরা উঁচুজাতিকে অনুসরণ করে। এই বিষয়ে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নির্মলকুমার বসু এবং পরে এটাকে তত্ত্বের রূপ দেন এম. এন. শ্রীনিবাস। তিনি বলেছেন, "Sanskritization is the process by which a 'low' Hindu caste, or tribal or other group change its customs, ritual, ideology and way of life in the direction of a high and frequently 'twice-born' caste. Generally such changes are followed by a claim to a higher position in the caste hicarehy than that traditionally conceded to the claimant caste by the local community."

স্তরবিন্যস্ত বর্ণব্যবস্থার মধ্যে বোঝাপড়ার উপাদান আছে। এর কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তের কিছুটা সুযোগ থাকায় পরিবর্তন হচ্ছে কিছুটা। খুব আটসাট ব্যবস্থা হলে তা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু বর্ণব্যবস্থা তা নয়, এখানে কিছু কিছু বাইরের জিনিস গ্রহণ করার সুযোগ আছে। নতুন উত্থিত ক্ষমতালোভী গোষ্ঠীগুলি যখন ক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদা চাইছে তখন তাদেরকে এর মধ্যে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কাঠামোকে চালেঞ্জ করা যাচ্ছে না। একটা গোষ্ঠী বা জাতির জায়গায় অন্য একটা জাতি বা গোষ্ঠীকে আনা হচ্ছে। কিন্তু বর্ণব্যবস্থা অক্ষুণ্ণই থাকছে। যখনই বলা হচ্ছে আমি নিচুজাত থাকব না উঁচুজাত হব তখন সেটা একটা বিদ্রোহ কিন্তু তা অত্যন্ত সীমিত অর্থে, কারণ বর্ণব্যবস্থাকে অস্বীকার বা চ্যালেঞ্জ না করে তাকে বরং মেনেই নেওয়া হচ্ছে। উঁচুজাত হবার আকাঙ্ক্ষাটাই প্রমাণ করে যে বর্ণব্যবস্থা রয়েছেই। কখনও কখনও এটা কাঠামোকে শক্তিশালী করেছে। নির্মলকুমার বসু এটিকে বর্ণব্যবস্থার রক্তসঞ্চালন বলেছেন। বর্ণব্যবস্থাকে ড্রাকুলার সঙ্গে তুলনা করা যায়। ড্রাকুলাকে বাঁচতে গেলে যেমন রক্ত খেতে হয় তেমনি বর্ণপ্রথাকে সজীব থাকতে হলে নতুন নতুন গোষ্ঠী বা জাতকে তার ভেতরে আনতে হয়।

প্রাচীনকালে ভারতে বৃত্তি অনুযায়ী সমাজ চারভাগে বিভক্ত ছিল। বৃত্তি বদল বা আন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু আস্তে আস্তে এটা পরস্পরের মধ্যে ভোজন, বিবাহ আর এক জাতি থেকে অন্য জাতিতে চলে যাওয়ার বাধা-নিষেধের ওপরই ভিত্তিশীল হয়ে পড়ল। মধ্যযুগে এসে আমরা দেখি যে মধ্যযুগীয় সমাজ ও অর্থনীতিতে এই জাতিভেদ প্রথা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসারের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা সহায়ক হয়েছিল না বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে নিয়ে খুব বিতর্ক আছে।

গ্রামীণ হস্তশিল্প ছিল মূলতঃ পরিবারাভিত্তিক। বাংলাদেশের তাঁতীরা বহির্বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তারা বেশীর ভাগ গ্রামেই বাস করত। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি বাংলাদেশ ও করমণ্ডলের এমন কোনো গ্রাম ছিল না যেখানে শিশু বা বয়স্ক লোক কাপড় তৈরীতে হাত লাগত না। রবার্ট অর্ম বলেছেন, হস্তশিল্পের ধারা ছিল পরিবারভিত্তিক ও বংশানুক্রমিকভাবে পিতা থেকে সন্তানে চলে এসেছে। ভারতীয় বণিকরা শুধু 'দাদন' দিয়ে কাপড় নিয়েছে। আমরা দেখি যে কৃষির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে যে বিশেষ কারিগরী জ্ঞানের প্রয়োজন তার সঙ্গে যে শিক্ষানবিশীর ব্যবস্থা ছিল তাও বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেই (castegroup) সীমাবদ্ধ। বাইরের লোক এখানে আসতে পারবে না। একটা গ্রুপ যে জিনিস উৎপাদন করবে অন্য গ্রুপ তা করবে না। নির্মলকুমার বসু মনে করেন যে এর ফলে এক একটা গ্রুপ এক একটা বিশেষ বিশেষ শিল্পে দক্ষ হয়ে উঠেছে এবং পূর্ণতা বা সম্পূর্ণতা (perfection) আসছে যা স্বতস্ফূর্ত (spontaneous)। মেথওয়াল্ডের বিবরণ থকে জানা যায় যে খনির কাজে বিশেষ দক্ষতার দরকার হত না বলে অনেক লোক এই বৃত্তি ছেড়ে চলে যেত।

জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েবার এবং অনেক ভারতীয় ইতিহাসবিদ বিশেষতঃ অরুণ দাসগুপ্ত বলেন ভারতীয় caste system-এর দরুণ উৎপাদন ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি হয়নি। নির্মলকুমার বসু মনে করেন, উৎপাদন থেকে যে প্রযুক্তিবিদ্যা উন্নত হয় সেটা সংকীর্ণ, কারণ caste-এর বাইরে এটা যায় না। এখানে প্রযুক্তিবিদ্যার কোন বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রভাব নেই। তাছাড়া এখানে কোন প্রতিযোগিতা নেই। আর মাক্স ওয়েবার মনে করেন প্রতিযোগিতা ছাড়া প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি ঘটা অসম্ভব। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে মাক্স ওয়েবার যখন এসব লিখছেন তখন জার্মানীতে বিসমার্কের যুগ চলছে। তাই স্বভাবতঃই প্রতিযোগিতার একটা লজিক তাঁর মনে কাজ করছেই। যাইহোক, নির্মলকুমার বসু, অরুণ দাসগুপ্ত এবং মাক্স ওয়েবার—এঁরা প্রত্যেকেই কিন্তু caste system-এর নিগড়কে এতই সুদৃঢ় মনে করেন যে এখানে বৃত্তিপরিবর্তন নাকি অসম্ভব। কিন্তু গৌতম ভদ্র মনে করেন, বৃত্তিপরিবর্তন অনতিক্রম্য ছিল না। চণ্ডীমঙ্গলে আমরা দেখি যে একই বর্ণের লোক দুটো কাজ করে স্বতন্ত্র হচ্ছে। যেমন,

হালি গোপ ও পল্লব গোপ বা চাষা ধোপা ও চাষা কৈবর্ত। অন্যদিকে কলুরা তাঁতিদের কাজ করছে। গুজরাটে দেখা যায় যে, পারসিরা হিন্দু তাঁতীদের জায়গা করে নিয়েছে। ফুকাজাওয়া জানিয়েছেন যে, মহারাষ্ট্রে অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে দর্জিরা নীল ছোপানোর কাজে নেমে পড়ে। সুতরাং আমরা অবশ্যই বলতে পারি যে বর্ণব্যবস্থার আওতায় কারিগরদের বৃত্তি বা অন্যান্য পরিবর্তন একেবারে অসম্ভব ছিল না। বর্ণ 'গিল্ড' ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের মত আঁটসাঁট ছিল না।

সমগ্র আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, পরিবর্তনকে স্বীকার করে নেবার ক্ষমতা ছিল বলেই হিন্দুসমাজে জাতিভেদ ও বর্ণপ্রথা এতদিন টিকে থেকেছে। ভক্তি আন্দোলন, ইসলাম বা খৃষ্টধর্মের প্রভাব একে দুর্বল করতে পারেনি। একমাত্র ইংরেজ ঔপনিবেশিক যুগেই এই ব্যবস্থায় ভাঙন দেখা যায় কিছুটা। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে গ্রামসমাজের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্কটা ভেঙে পড়লো। জাতিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা নষ্ট হল। ফলে, জাতিভেদপ্রথার অর্থনৈতিক বনিয়াদ হয়ে পড়লো দুর্বল এবং এর প্রাসঙ্গিকতা ক্রমে অর্থহীন শুচি-অশুচির দ্বন্দ্ব আর আচার-বিচারের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লো। পরিশেষে আশা রাখি যে, ভারতের বিভিন্ন জাত ও বর্ণের মানুষ বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির একতার ভিত্তিতে মুক্তি, অর্থনৈতিক সুষম বিকাশ ও জাতিগুলির সমন্বের জন্যে জোরদার সংগ্রাম গড়ে তুলে শীঘ্র আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন। তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বিচ্ছিন্নতার পিচ্ছিল পথ ও অতীতাশ্রয়ী চিন্তার বিফলতা কাটিয়ে উঠে, ভ্রাতৃপ্রতীম বহুজাতিক জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্যেই তাঁদের মুক্তির পথের সন্ধান পাবেন।

সূত্র ঃ

১। Louis Dumont : Homo Hierarchieus : The Caste System and its implications, Paladin edition, 1972.

২। Andre Beteille : Castes : Old and New, 1961.

৩। Nirmal Kumar Bose : Culture and Society in India, 1967

৪। Hiteshranjan Sanyal : Social Mobility in Bengal, Calcutta, Papyrus, 1981.

৫। M. N. Srinivas : Caste in Modern India and other essays, Bombay, 1962.

৬। Sekhar Bandyopadhyay : Caste Class and Census Aspects of Social mobility under British Rule in the Late Nineteenth and Early Twentieth Century Bengal, 1872—1931, Mimeo, Centre for Southeast Asian Studies, C. U.

৭। গৌতম ভদ্র : মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ, সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, ১৯৮৩।

বিবেকানন্দ ও তাঁর শূদ্র শ্রেণী

সুজিত সেন

সম্প্রতি রুশদেশে বহুবিতর্কিত পেরেস্ত্রৈকা ও গ্লাসনস্তের ঝড় উঠেছে। পুনর্গঠনের তাগিদে এবং মুক্তচিন্তার আলোকে সেখানে অনেক ইতিহাসশ্রুত ব্যক্তিত্বেরই পুনর্মূল্যায়ন শুরু হয়েছে। এঁদের মধ্যে বিবেকানন্দ হলেন একজন। সোভিয়েত দেশে 'ইন্ডিয়ান ফিলসফি ইন মডার্ন টাইমস' নামে একটি অভিনব পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে অনেক ভারতীয় দার্শনিকের সঙ্গে বিবেকানন্দের ওপরও একটি দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। এছাড়া মস্কোতে স্থানীয় উদ্যোগে 'বিবেকানন্দ সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানে প্রতি সপ্তাহে ভারততত্ত্ব নিয়ে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমরা জানি—অধ্যাত্মচেতনা, সমাজভাবনা অর্থনীতিচিন্তা শিক্ষা দর্শন ইত্যাদি নানাবিষয়ে বিবেকানন্দ তাঁর সৃজনশীলতার দুরন্ত টিপছাপ রেখে গেছেন। কিন্তু এবংবিধ সার্বিক বিশ্লেষণের অবকাশ এখানে আমাদের নেই। শুধুমাত্র শূদ্র শ্রেণীর অস্তিত্ব ও জাগরণ সম্পর্কে বিবেকানন্দ কী ধারণা পোষণ করেছেন মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তারই ওপর এক নতুন আলোকপাত করার উদ্দেশ্য নিয়েই বর্তমান অবতারণা।

শূদ্র : কিন্তু কারা

শূদ্র শ্রেণীর উদ্ভব ও চারিত্রবৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। তথাপি এমন একটা মত আমরা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করবো সেটা মোটামুটি বিবেকানন্দীয় স্বীকৃতি পেতে পারে : বিবেকানন্দ যা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন।

'এনসাইক্লোপেডিয়া অফ রিলিজিঅন অ্যান্ড এথিক্স'-এ খণ্ডে দ্বাদশ 'শূদ্র' অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে তার ভাষ্য এইরকম : এক আক্রমণাত্মক পটভূমিতে পশুপালক আর্যদের ভারতে আগমন ঘটে। তাঁরা এখানকার আদিবাসীদের সঙ্গে তীব্র সংঘর্ষে অবতীর্ণ হন। এই আদিবাসীরা ছিলেন আর্যেতর কৌম। আর্যরা এঁদের 'অসুর' 'দস্যু' ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করতেন। এই অনার্য কৌমসমূহের একটি অংশ আর্যদের দ্বারা পরাজিত হয়ে আর্যসমাজের মধ্যে নিম্নতম পর্যায়ে স্থান পেয়েছিলেন। এঁরাই তখন 'শূদ্র' নামে পরিচিতিলাভ করলেন : অনুমান করা যায়, পঞ্জাবে বসবাসকালে আর্যরা প্রথম যে বৃহৎ অনার্য কৌমটিকে পরাস্ত করে আর্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন সেইটির নাম ছিল 'শূদ্র'। পরে আর্যরা যতই পূর্বদিকে অগ্রসর হতে লাগলেন তাঁরা নতুন নতুন অনার্য কৌমকে পরাজিত করে আর্যসমাজভুক্ত করে নিচ্ছিলেন এবং তখনও এই নতুন আর্যীকৃত অনার্য কৌমগুলিও সমষ্টিগতভাবে 'শূদ্র' নামে পরিচিতি পেলো।[১]

তবে কেউ কেউ এই 'শূদ্র' শব্দটিকে আর্যভাষাভুক্ত মনে করে এর একাধিক ব্যুৎপত্তিগত অর্থও অনুমান করেছেন। দক্ষিণ ভারতের পণ্ডিত বাদরায়ন 'শূদ্র' শব্দটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন : 'যে শোচনা করে সে শূদ্র'। বিধুশেখর শাস্ত্রী আবার সংস্কৃত 'সুদ্র' থেকে 'শূদ্র' শব্দটির নিষ্পত্তি ঘটেছে বলে মনে করেন। তাঁর মতে : সুদ্র পেশার সঙ্গে জড়িত মানবগোষ্ঠীই হলো শূদ্র। ২৩. ৪. ১৯২৫ তারিখে 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় গান্ধীজী লিখেছিলেন : অস্পৃশ্যদের শূদ্রজাতিভুক্ত করাই শ্রেয়, কারণ পঞ্চম কোনো জাতিতে বিশ্বাস স্থাপন করা অন্যায্য।[২] কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে শূদ্রদের 'আর্য' বলেছেন। গোলামের ছেলেও 'আর্য', একথা বলেছেন তিনি।[৩] এইসব তৎকালীন ভাষাতাত্ত্বিক ও আধুনিক নরতাত্ত্বিক অনুমানের খুব বেশি বাস্তব তাৎপর্য হয়তো নেই। কিন্তু এগুলি শূদ্রজীবনের একটি নিম্নবর্গীয় ভাবমূর্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে প্রভূত সফল হয়েছে সেবিষয়ে প্রায় প্রত্যেকেই একমত হবেন।

'শূদ্র' শ্রেণীর অস্তিত্ব সম্পর্কে বিবেকানন্দের বোধন ছিল অন্যরকম : হিন্দুদের প্রাচীন শাস্ত্রে সমাজস্থিত চারটি বর্ণ বা জাতের উল্লেখ আছে। এঁদের মধ্যে সর্বনিম্ন চতুর্থ জাত বলে পরিচিত চিরনিপীড়িত মজুর শ্রেণীকে 'শূদ্র' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। অগ্রগণ্যতার ভিত্তিতে অন্য তিনটি জাত হলো যথাক্রমে : পুরোহিত—ব্রাহ্মণ, সৈনিক—ক্ষত্রিয়, এবং ব্যবসায়ী—বৈশ্য। এঁরাই পর্যায়ক্রমে পৃথিবী ভোগ করেন। জেনে রাখা দরকার : এই জাতিবিভাজনের মৌল ভিত্তি হলো কর্ম বা পেশা। অন্য কোনো মানদণ্ড নয়। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদের শোষণ আর ঔপনিবেশিক শাসন যারা প্রতিবাদহীনভাবে সহ্য করা যাচ্ছে বিবেকানন্দের চোখে তারাও 'শূদ্র'।

প্রসঙ্গত এখানে একটি জরুরি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে : 'শূদ্র' তো একটা জাত, তাহলে 'শ্রেণী' হিসেবে তাকে চিহ্নিত করা হচ্ছে কেন ? এর এক সঙ্গত যৌক্তিক কারণ আছে : শ্রেণী বিভাজনের ভিত্তি হলো মূলত আর্থ-সামাজিক বিন্যাসের চারিত্রিক ও প্রকৃতিগত গড়ন। বৈদিক সমাজে জাত-বৈষম্যের শিকড় নিহিত ছিলো আর্থ-সামাজিক কাঠামোগত বাস্তবতার একেবারে গভীর খোপে। এই প্রেক্ষিতে জাত ও শ্রেণী ছিলো তখন একাকার / সমার্থক। বিবেকানন্দও তাই জাত ও শ্রেণীর মধ্যে কোনো বিভেদের চৈনিক পাঁচিল তুলে দেননি। 'শূদ্র' জাত এক শ্রেণীভিত্তিক তাৎপর্যে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। এছাড়া সংস্কৃতে 'জাতি' শব্দের অর্থ শ্রেণীবিশেষ। বিবেকানন্দ এই ঐতিহ্যাশ্রয়ী ধারণাটি গ্রহণ করেছিলেন।[৪]

শূদ্র জাগরণ : বিবেকানন্দের সমাজতাত্ত্বিক দর্শন

বিবেকানন্দের সমাজতাত্ত্বিক দর্শন মূলত শূদ্র শ্রেণীর জাগরণ-চেতনার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। আগেই বলা হয়েছে : বিবেকানন্দ শূদ্র বলতে চিরনিপীড়িত দলিত শ্রেণীকেই বুঝিয়েছেন অর্থাৎ মার্কসীয় ব্যঞ্জনায় প্রোলেতারিয়েত

শ্রেণীই শূদ্র শ্রেণী। প্রোলেতারিয়েত শ্রেণী মূল উৎপাদন-প্রণালীর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও উৎপাদনের সমূহ ফল থেকে বঞ্চিত এবং বাধ্যতামূলক মজুরিশ্রম বিক্রয়ের মাধ্যমে কোনো মতে বাঁচার তপস্যায় নিয়োজিত। শূদ্র শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক অস্তিত্বের প্রকৃতিও তাই। এর থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়ঃ শূদ্ররা একটি শোষিত শ্রেণী। কিন্তু তাঁরা চিরকাল শোষণের শিকার হন না। তাঁরাও একসময় শাসন কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত হন ঃ মানব সমাজ ক্রমশ্বয়ে চারটি বর্ণ দ্বারা শাসিত হয়—পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য), এবং মজুর (শূদ্র)।··· সর্বশেষে শূদ্রশাসন যুগের আবির্ভাব হবে—শূদ্র যুগ আসবেই আসবে —এ কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না।[৫] আজ উচ্চশ্রেণীরাই 'চলমান শ্মশান'। আর পদদলিত শ্রমজীবীগণ যারা প্রাচীনকালে 'শূদ্র' বলে কথিত হতো, তারাই ভবিষ্যতের ভারতীয় সভ্যতার স্রষ্টা।[৬] লেনিন সোভিয়েত রাশিয়ার প্রোলেতারীয় একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কল্পনা করবার অনেক আগেই এবং মাও সে-তুং-এরও জন্মের বহু পূর্বেই বিবেকানন্দ এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঃ শ্রমজীবী শূদ্র শ্রেণী আর্থ-রাজনীতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক শাসনক্ষমতা অর্জন করবে। তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল সেই দেশগুলির ওপর যেখানে প্রথম শূদ্র (সর্বহারা) রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সমন্বয়সাধন সার্থক হবে। এই কারণেই তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, সম্ভবতঃ রাশিয়াতেই পৃথিবীর প্রথম শূদ্ররাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। স্বামীজীর এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হল ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়াতে শ্রমিক ও কৃষকের সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দ্বারা। আজ যাকে 'সর্বহারার একনায়কত্ব' নামে অভিহিত করা হচ্ছে, স্বামীজী বহু পূর্বেই এই নীতির অপরিহার্য জয়লাভ সম্পর্কে ছিলেন সুনিশ্চিত। বলশেভিকরা এই নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করে। স্বামীজী ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে তার সার্থকতা দীপ্যমান, জনগণতন্ত্রী চীনেও তারই নবরূপায়ণ লক্ষ্য করছি।[৭] এখানে উল্লেখ্য, মার্কস ও এঙ্গেলস ধরে নিয়েছিলেন জার্মানি হবে 'ইওরোপীয় প্রোলেতারিয়েতের প্রথম মহান বিজয়ের মঞ্চ'।

বিবেকানন্দ একজন সমাজতন্ত্রী

বিবেকানন্দই প্রথম ভারতীয় যিনি নিজেকে একজন 'সমাজতন্ত্রী' বলে ঘোষণা করেছিলেন।[৮] তিনি ভারতীয় সমাজকে মূলত দুটো শ্রেণীতে ভাগ করেছেন ঃ ধনী অর্থাৎ উঁচুশ্রেণী এবং দরিদ্র অর্থাৎ নিচুশ্রেণী। তাঁর কাছে নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি শূদ্ররাই হলো জনগণ—'ভবিষ্যতের চাবি তাদেরই হাতে'।[৯] সুতরাং '··· নিচু জাতকে তুলতে হবে'।[১০] তাঁর মতে ঃ দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত হইতেছে।[১১] দরিদ্ররাই পৃথিবীতে চিরকাল মহৎ ও বিরাট কার্যসমূহ সাধন করিয়াছে।[১২] আধুনিক জাতিভেদ ভারতের উন্নতির একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক।

উহা সংকীর্ণতা ও ভেদ আনয়ন করে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর একটা গণ্ডী কাটিয়া দেয়। চিন্তার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে।[১৩] 'আঠারোই ব্রুমেয়ার'-এ মার্কস একটি মূল্যবান ক্রান্তিধর্মী কথা বলেছেন: 'মানুষ নিজেই তার ইতিহাস সৃষ্টি করে, কিন্তু তাই বলে তার খেয়াল-খুশিমতন সে ইতিহাস রচনা করতে পারে না। যে ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মুখোমুখি সে হয় সেই পরিস্থিতি অনুযায়ী তাকে নয়া ইতিহাস গড়তে হয়।'[১৪] বিবেকানন্দের কণ্ঠেও এই ধরনের প্রত্যয় ধ্বনিত হয়েছে: তিনি জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা ক্ষুধা-দারিদ্র্য দূর করে একটি নতুন আর্থ-সামাজিক জীবন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন 'আমূল সংস্কার'। শাসনক্ষমতার উত্তরোত্তর গণতন্ত্রীকরণই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি বিশ্বাস করতেন: এমন সময় আসবে যখন পৃথিবীর সমস্ত দেশে শূদ্র-জনতার জাগরণ ঘটবে, উঁচুশ্রেণী অধিষ্ঠানচ্যুত হবে এবং নিচুশ্রেণী হিসেবে শূদ্ররা একচ্ছত্র আধিপত্য অর্জন করবে।

মার্কসবাদীরা চান—সর্বাত্মক বিপ্লব: আর্থ-সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন। কারণ: এযাবৎ সব সমাজের ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস।[১৫] কিন্তু বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন সংস্কার: সমাজের যে সম্পূর্ণ সংস্কার আবশ্যক—এবিষয়ে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত।[১৬] অর্থাৎ বিবেকানন্দ পুরোনোকে সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়ে নতুন ভিত্তি সৃষ্টি করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই তিনি সাবধানী নির্দেশ দিয়েছেন: 'কোন কিছু একেবারে ভাঙিওনা, একেবারে ধূলিসাৎ করিওনা, বরং গঠন কর। যদি পারো সাহায্য কর; যদি না পারো, হাত গুটাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকো, এবং যেমন চলিতেছে চলিতে দাও।'[১৭] মূল কথা: বিবেকানন্দ শ্রেণীসংগ্রাম আশা করেননি—ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বিবাদ যেন বাধিয়ে ব'সো না।[১৮] তিনি সংরক্ষণপন্থী ছিলেন। সংস্কারধর্মিতায় বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। তিনি পুঁজিবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু শ্রেণী-সংঘর্ষ ছাড়াই সামাজিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন। এ যেন সেই এম. এন. শ্রীনিবাসের সংস্কৃতিকরণের ধারণা: সামাজিক চলিষ্ণুতা দেখা যাবে, সমাজব্যবস্থায় স্থিতিগত পরিবর্তন আসবে, কাঠামো থাকবে অপরিবর্তিত।[১৯] দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী সূত্র অনুসারে এখানে একটি কথা অনায়াসে বলা যায়: বিবেকানন্দ সমাজজীবনে পরিমাণগত পরিবর্তনকে (সংস্কার) স্বাগত জানিয়েছেন। আর মার্কসবাদীরা গুণগত পরিবর্তনে (বিপ্লব) বিশ্বাসী। অবশ্য সংস্কার এবং বিপ্লবের মধ্যেকার সম্পর্ক বিপরীত হবে বা পরিপূরক হবে সেটা অবস্থার উপর নির্ভর করে।[২০]

একথা ভুলে গেলে চলবে না যে বিবেকানন্দ ছিলেন একজন ভাববাদী দার্শনিক। তাই তিনি রবার্ট ওয়েন, সাঁ সিমোঁ, ফুরিয়ে, টমাস মোর প্রমুখের মতো ইউটোপিয় সমাজতন্ত্রের অনুসারীতে পরিণত হয়েছেন। তিনি পুঁজিবাদকে ঘৃণা করেছেন।

তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল ভারত একদিন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হবে: ক্ষুধা-দারিদ্র থেকে আমাদের সমাজ মুক্ত হবে। কিন্তু কীভাবে কোন্ পথ-প্রণালীতে সেই সমাজতান্ত্রিক সমাজ জনগণ দখল করবে সে সম্পর্কে কোনো বাস্তব নিয়মানুগ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে তিনি পৌঁছতে পারেননি। তিনি ভাবতেন: 'উচ্চশ্রেণী স্বেচ্ছায় নিম্নশ্রেণী অর্থাৎ শূদ্রদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেবে...' এরকম অবস্থায় বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক প্রত্যয় পেটি বুর্জোয়াধর্মী ইউটোপিয় ব্যঞ্জনায় পরিপ্লুত হয়ে উঠেছে। মার্কস-এঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কণামাত্র উপাদান এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। মার্কস-এঙ্গেলসের কথায়:...In its positive content 'this form of socialism aspires either to restoring the old means of production and of exchange, and with them the old property relations, and the old society, or to cramping the modern means of production and of exchange, within the framework of the old property relations that have been, and were bound to be, exploded by those means'.[২১]

প্রাসঙ্গিক সূত্র ধরে এখানে আরেকটা কথাও যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা দরকার: বিবেকানন্দ সমাজতন্ত্রকে কোনো 'চরম সমাজব্যবস্থা' বা 'নিখুঁত পদ্ধতি' বলে মনে করেননি। তিনি তাঁর এই বোধন / বোধিকে এইভাবে তুলে ধরেছেন: আমি যে একজন সমাজতন্ত্রী (সোস্যালিস্ট), তার কারণ এই নয় যে, আমি ঐ মত সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে মনে করি, কেবল 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো'—এই হিসাবে।[২২] তাঁর মনোভাব ছিল, 'কিছু না-থাকার চেয়ে' সমাজতন্ত্রের দ্বারা 'কিছু তো পাওয়া যাবে'। অর্থাৎ সমাজতন্ত্র আর্থ-সামাজিক বিন্যাসের কোনো চরম পূর্ণাঙ্গ নিখুঁত অবিতর্কিত আদর্শ বা মডেল নয়। এখানেও অনেক স্ববিরোধ আছে, সীমাবদ্ধতা আছে, নিজস্ব দ্বন্দ্ব ও সমস্যা আছে। তবে একটি সুস্থ মানবিক জীবন-যাপনের জন্য মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলি নিবৃত্তির জন্য সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা একান্ত জরুরি। এই মুহূর্তে এছাড়া মুক্তির কোনো বিকল্প পথ নেই একথা বিবেকানন্দ খুব জোরের সঙ্গে স্বীকার করেছেন। যাঁরা ভাবেন সমাজতন্ত্রে মানুষের তাবৎ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে—সেইসব অবস্তুবাদী মানুষের দলে তিনি ছিলেন। সমাজতন্ত্রের প্রতি মানুষের থাকবে সপ্রশ্ন সজীব নির্ভরতা। অর্থাৎ তাঁর মতে: সমাজতন্ত্র কোনো সর্বরোগহর এক বিশল্যকরণী নয়। বস্তুমানবিক এমন অনেক সমস্যা আছে যে তাদের কোনো একটি বিশেষ তত্ত্বের ছকে ফেলে দিয়ে বিচার-বিবেচনা করা যায় না বা সার্বিক সমাধানসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। তার জন্য দরকার হয় অন্যতর এক সুস্থ জীবনধর্মী সৃজনদৃষ্টি: সমস্ত তত্ত্বের সীমান্ত উপড়ে দিয়ে নতুন এক মানবিক প্রজ্ঞার সহৃদয়হৃদয়সংবাদী জীবনগত উত্তাপ তখনি জরুরি হয়ে ওঠে—মানুষ খুঁজে পায় সারস্বত চেতনার আলো।

জাতপাত ও রাজনীতি

বিবেকানন্দ তাঁর রচনাবলীর একজায়গায় বলেছেন: কাপুরুষতা কি রাজনৈতিক বাঁদরামির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই; আমি রাজনীতিতে মোটেই বিশ্বাস করি না।[২৩] তিনি স্বয়ং যাই বলুন না কেন আসলে তিনি পাকে-প্রকারে রাজনীতির ভাবই প্রচার করেছেন।[২৪] রাজনীতিতে তিনি সরাসরি যোগ দেননি। কিন্তু চরমপন্থী জাতীয় বিপ্লবীদের কাছে তিনি ছিলেন এক অনুকরণীয় আদর্শ / প্রতীকী পুরুষ। অর্থাৎ ভারতের জঙ্গী জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করেছিলেন।[২৫]

এছাড়া বিবেকানন্দ রাজনীতির আঙিনায় কদাচ যাননি—এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভুল। তিনি প্রকাশ্যে বলেছেন: সত্যই আমার কাছে একমাত্র রাজনীতি, বাকি সব আবর্জনা। তৎকালীন ভারতীয় বাস্তবতার আলোকে তাঁর রাজনীতির মর্মবস্তু ছিল: জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠা, গভীর দেশপ্রেম। স্বামীজীর ঈশ্বরপ্রীতি ততখানি নয়, যতখানি তাঁর স্বদেশপ্রীতি তাঁকে এই স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। কিন্তু ধর্মের আবরণে তিনি যা প্রচার করেছেন তা হলো, স্বদেশপ্রেম ও রাজনীতি। রামকৃষ্ণ যদি হন একান্তভাবে ঈশ্বরপ্রেমী, শিষ্যকে তাহলে বলা যেতে পারে একজন দেশপ্রেমী। তাঁর সমাজতন্ত্রের আকর্ষণীয় বাণী ও 'ফিরিঙ্গি জয় ব্রত' তাঁকে দেশবাসীর মনে একটা স্থায়ী আসন করে দিয়েছে।[২৬]

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে জাতপাত ও রাজনীতি ওতপ্রোতভাবে পরস্পরকে জড়িয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে রাজনীতির আয়ুধেই জাতপাতের সমস্যাটি দীর্ঘদিন সযত্নে লালিত হয়েছে ও হচ্ছে। বর্তমানে জাতপাতের দ্বন্দ্ব-উত্তেজনা এতটা তুঙ্গে উঠতে বা জটিল আকার ধারণ করতে পারতো না যদি না তাতে রাজনীতির জোরালো ইন্ধন থাকতো। স্বামীজী তো পরিষ্কার বলে দিয়েছেন: জাতিভেদ রাজনীতিক ব্যবস্থাসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র।[২৭] এছাড়া অনেকে বলতে পারেন: ভারতীয় সমাজে ধর্মই জাতপাতের প্রশ্নটিকে সমস্যার আবর্তে ছুঁড়ে দিয়েছে। বিবেকানন্দের মতে একথা ঠিক নয়: ধর্মে জাতিভেদ নাই: জাতিভেদ কেবল সামাজিক ব্যবস্থা,...সুতরাং ধর্মের কোনো দোষ নাই, লোকেরই দোষ।[২৮] এরকম অবস্থায় তিনি দেশবাসীকে ডাক দিয়েছেন: হে ভারত, ভুলিও না...নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।[২৯] এইভাবে তিনি বিকৃত স্থূল অস্বাস্থ্যকর পেশাদারি রাজনীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে জাতপাতের দ্বন্দ্ব-মুখর স্থিতিকে মূলসুদ্ধ নিড়িয়ে দেবার প্রয়াসী হয়েছিল। অতএব তিনি সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি ঠিকই, কিন্তু তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতি তাঁর দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। নিবেদিতা পরবর্তীকালে রাজনীতির কুরুক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল একটাই: ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে ভারতকে বাঁচিয়ে তোলা এবং দেশের আমূল পুনর্গঠন। বিবেকানন্দের আদর্শে

অনুপ্রাণিত নেতাজী সুভাষচন্দ্রেরও অবিশ্বাস ছিল। এমনকি অতিশয়োক্তি না করেও বলা যায়—বামপন্থী আন্দোলনের নেতৃবর্গ ও ক্যাডারগণ বিবেকানন্দের এই ধ্যান-ধারণার স্বরূপটি নির্দ্বিধায় এড়িয়ে যেতে পারেন না। বিবেকানন্দের দেশপ্রীতির আদর্শ দ্বারা এদেশের মার্কসবাদীদের উদ্‌বুদ্ধ হওয়া একান্তই দরকারি। রোলাঁর গ্রন্থে উল্লেখ আছে, গান্ধীজী একবার বেলুড় মঠে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় স্বীকার করেছিলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থপাঠের ফলে তাঁর দেশাত্মবোধ বৃদ্ধি পেয়েছিল। স্পষ্টতই দেখা যায় যে, স্বামীজীর বজ্রনির্ঘোষ বাণী—'ওঠো জাগো' ধ্বনির পরেই সমস্ত দেশে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত, যার পরিণতি হিসেবে ভারতের স্বাধীনতার জন্য গান্ধীজীর আন্দোলনের সৃষ্টি।[৩০] দেশের জনসাধারণের মুক্তিসাধনই ছিল স্বামীজীর একমাত্র রাজনীতিক কর্মসূচি। এর পরও কি তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল বা প্রতিবিপ্লবী বলা যায় ?

ভিত্তি ও সৌধ

বিবেকানন্দকে নিয়ে আলোচনা করবার সময় ভিত্তি ও সৌধের প্রশ্নটি অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। তিনি ভিত্তির পরিবর্তে সৌধের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই বলেছেন: আমাদের নিম্নশ্রেণীর জন্য কর্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদের বিনষ্টপ্রায় ব্যক্তিত্ববোধ জাগাইয়া তোলা…তাহাদিগকে ভালভাল ভাব দিতে হবে।[৩১] অর্থাৎ তিনি সর্বাগ্রে সৌধের বদল চেয়েছেন। তারপর ভিত্তির প্রশ্ন তাঁকে নাড়া দিয়েছে। কিন্তু মার্কসবাদীরা ভিত্তির ওপর প্রাথমিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তারপর সৌধের প্রসঙ্গ আসে। শিবরাম চক্রবর্তীর কথায় মার্কসীয় বীক্ষা হলো এইরকম: আত্মিক দারিদ্র্য দূর করবার আপাতত দায়িত্ব কমিউনিজমের নয়, আর্থিক দারিদ্র্য দূর করাই তার প্রথমতম কাজ। অর্থলোকে সে আনতে চায় স্বাচ্ছন্দ্য, অন্তর্লোকে স্বচ্ছন্দ হবে তার ফলেই।[৩২] এর অর্থ এই: আগে মানুষ দুবেলা পেট ভরে খেতে চায়, পরে আসে চেতনার প্রশ্ন। ব্রেশটের কথায়: শরীরটাতো বাঁচলে আগে তবে মনের কাজ।[৩৩] এর অর্থ সৌধকে অস্বীকার করা নয়। দ্বান্দ্বিক জ্ঞানতত্ত্ব বলে: বস্তু চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে আবার চেতনাও বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে।[৩৪] পাভলভীয় মনোবিদ্যা অনুযায়ী ব্যক্তিমানসিকতা শুধুমাত্র পরিবেশের দ্বারাই নির্ধারিত নয়: ব্যক্তিও পরিবেশকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে…।[৩৫] সুতরাং বলতে পারি: মার্কসবাদে ভিত্তি ও সৌধের সম্পর্ক একেবারে দ্বান্দ্বিক—পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে চে গেভারার মূল্যবান কথাটি সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে: বস্তুভিত্তিযুক্ত কমিউনিজমের সঙ্গে নতুন মানুষও গড়া চাই। তার কারণ, বন্দুকের নল থেকেই রাজনীতিক সমতা জন্ম নেয়—মাও সে-তুং-এর এই বহুপরিচিত কথাটি যদি মেনে নিই তাহলে বলা যায়: যিনি বা যাঁরা বন্দুকটির হস্তক্রিয়ায় নিযুক্ত হবেন তাঁকে বা তাঁদের সর্বাগ্রে শক্তসমর্থ হতে হবে,

অন্যথায় বিপ্লব নৈব নৈব চ। তবে এই কাজটি চলবে যুগপৎ ঃ ভিত্তিধ্বংসী সংগ্রামের পাশাপাশিই চলতে থাকবে মন-বদলের দ্বান্দ্বিক প্রণালী।

অবশ্য এর থেকে আমরা এরকম কোনো একপেশে সিদ্ধান্তে পেঁছতে পারি না যে বিবেকানন্দ বাস্তব সমস্যার দিকে ঠিকমতো দৃষ্টিপাত করেননি। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় ঃ বৈরাগ্য সাধনায় বিমুখ এই বীর সন্ন্যাসী পার্থিব জগতের সমস্যাগুলির প্রতি অনীহা দেখাননি। তিনি বিশ্বাস করতেন কুরুক্ষেত্রের মতো দ্বন্দ্বমুখর এই জীবনই তপস্যার যথার্থ পটভূমি।[৩৬] স্বামীজী নিজেই বলছেন ঃ যে ভগবান রুটি দিতে পারে না, সে ভগবানে আমার বিশ্বাস নেই।[৩৭] অবশ্য তিনি বাস্তব সমস্যার চেয়ে আধ্যাত্মিক ধর্মীয় জাগরণকেই মুক্তির চরমতম পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কারো কারো ধারণা ঃ এইখানেই তাঁর স্ববিরোধিতা। কিন্তু প্রখ্যাত ইউরোপিয় ভারততত্ত্ববিদ শ্রীমতী বি. হাইম্যান-এর মত অন্যরকম ঃ…all forms of Indian philosophical doctrines are displayed in the general consolidating and reconciling principle of "transcendental materialism," which "rises above single empirical observations and postulates the transformation of one empirical form into another and finally of all these into a static shaplessness which is beyond all empirical experience।"[৩৮] ইংল্যান্ডের রেস্টোরেশান যুগের মানবতাবাদী কেমব্রিজ প্লেটোনিস্ট আর. এইচ. গ্র্যানভিল-এর কথাও এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে ঃ তিনি যান্ত্রিক বস্তুবাদী এবং ধর্মধ্বজীদের বিপরীতে থেকে ধর্মের যৌক্তিকতা দেখাতে চেয়েছিলেন। এই ইউটোপিয় ভাবুক মননের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন, কিন্তু মুক্তবুদ্ধির সঙ্গে ধর্মকে মেলাতে চেয়েছিলেন। বেকনের পরীক্ষামূলক বস্তুবাদ এবং কেমব্রিজ প্লেটোনিস্টদের যুক্তিনির্ভর মরমিয়াবাদের মধ্যে তিনি সেতুবন্ধন ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি ধর্মকে যুক্তিসিদ্ধ আধুনিক সরল এবং সম্ভ্রান্ত একটি প্রত্যয়রূপে উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন। এ ছিল বিবেকানন্দেরও অভিপ্রায়। গ্র্যানভিল-এর মতো বিবেকানন্দও রাজনীতিবিদ ছিলেন না। কিন্তু রাজনীতিতে যৎসামান্য আগ্রহ সত্ত্বেও তাঁরা দুজনেই ইউটোপিয়ার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব।[৩৯] একটি প্রয়োজনীয় কথা মনে রাখা দরকার ঃ ভারতে ধর্ম ও দর্শন যে অবিচ্ছেদ্য তাতে আশ্চর্য হওয়ার কোনো কারণ নেই। নৈতিবাচকতার অপবাদ দিয়ে ধর্মকে সবসময় উপেক্ষা করা যায় না। তার একটা ইতিবাচক সামাজিক মানবতাধর্মী মূল্যও রয়েছে ঃ মার্কসের একটি কথা, 'ধর্ম জনগণের আফিং,' বিখ্যাত। তবে প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে এই উদ্ধৃতি কিছুটা একপেশে মনে হয়। আসলে মার্কস বলেছেন, ধর্ম নামক আফিং দু' ধরণের। এক যা জনগণের উপর শাসক শ্রেণী শোষণের যন্ত্র হিসেবে চাপিয়ে দেয়। অন্যটি, যা তারা নিজেদের প্রয়োজনে, অবস্থার তাগিদে নিজেরাই প্রতিবাদের অস্ত্ররূপে সৃষ্টি করে। সেক্ষেত্রে ধর্ম অসহায়ের শেষ সান্ত্বনা, নির্যাতিতের দীর্ঘ

নিঃশ্বাস। অতীতে, যখন ধর্মই মানুষের আত্মপ্রকাশের প্রধান উপায় ছিল, অনেক গণবিদ্রোহ, এমনকি বিপ্লব, ধর্মীয় রূপ নিয়েছিল। স্বয়ং এঙ্গেলস্ ষোড়শ শতাব্দীর জার্মানির কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে সে কথা স্বীকার করেছেন। আজকের দিনেও ক্যাথলিকপ্রধান ফিলিপিনস্ বা ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিকামী ধর্মের (Liberation theology) গুরুত্ব কম নয়। নিকারাগুয়ার বিপ্লবোত্তর বহুদলীয় রাষ্ট্র ও মিশ্র অর্থনীতির রথ টেনে নিয়ে চলেছে বাম ও ক্যাথলিক জোট। কলম্বিয়ায় ধর্মযাজক ক্যামিলো তরুণ গেরিলা যুদ্ধে প্রাণ দেন। ল্যাটিন আমেরিকার মানুষেরা তাঁর স্মৃতিকে স্থান দেয় চে-গুয়েভারার পাশে।[৪০] এখানে সি. শ্মিঠের কাছে লেখা এঙ্গেলসের একটি চিঠিরও (২৭ অক্টোবর, ১৮৯০) দ্বারস্থ হতে পারি আমরা, সেখানে তিনি বলেছেন : কোনো কোনো দেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর হলেও দর্শনের ক্ষেত্রে মূলগায়েনের ভূমিকা নিতে পারে।[৪১] এখানে বলা যায়—বস্তুগত প্রাচুর্য নেই ঠিকই কিন্তু আত্মিক সভ্যতা রচনার সূজ্যমান ক্ষেত্রে দর্শনের দিক থেকে পৃথিবীকে দেওয়ার মতো ভারতের অনেক কিছুই আছে। এটা যে-কোনো প্রকৃত সৃজনশীল মার্কসবাদী অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য। এবং এদিক থেকে ভারতের এই দার্শনিক মর্মতেজ সভ্যতা-সংস্কৃতির বিচ্ছুরিত উদ্যান গড়ে তোলার আয়ুধ হিসেবে অসংকোচে সম্যক গ্রহিষ্ণুতার দাবি রাখে। বিবেকানন্দ ভারতীয় আত্মিক সম্পদের এই অনালোচিত দিকটির ওপর আলোকপাত করেছিলেন এবং মুক্তচিন্তা-প্রসূত এই প্রত্যয়টির বাস্তব বোধন ঘটাতে চেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত দৃষ্টান্ত টেনে বলা যায় : রুশ সাহিত্যিক লিও তলস্তয় বুর্জোয়া সভ্যতাকে বাতিল করে দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের মধ্যে এমন কিছু মূল্যবোধের সন্ধান করেছিলেন যা আধুনিক বিশ্বে উন্নত নৈতিকতার মান, কল্যাণ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সহায় হবে।[৪১ক]

উপসংহার অথবা

কোনো মানুষই ইতিহাস-নিরপেক্ষ নয়। কান্ট বলেছেন : যদি কোনো মানুষকে জানতে চাও, তাঁর পরিবেশকে তোমার অবশ্যই জানতে হবে।[৪২] অতএব সমকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতি আর ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকেই শূদ্র শ্রেণী সম্পর্কে বিবেকানন্দের তাবৎ ধ্যান-ধারণার সম্যক মূল্যায়ন দরকার। তিনি প্লেটোর মতো একটি আদর্শ সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাই তাঁকে অনেকে এক ভাববাদী রোমান্স-প্রসূত ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তাঁকে উনিশ শতকী বাস্তব পরিবেশের ভিত্তিতেও বিচার করতে হবে। এবং সেই দিক থেকে তৎকালীন পটভূমিতে স্বামীজী ছিলেন একজন প্রগতিবাদী প্রতিনিধি : প্রগতিশীল ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডে তিনি সর্বদাই উৎসাহী ছিলেন। এছাড়া তাঁকে পুরোপুরি ভাববাদী বলাও ঠিক হবে না। কারণ তাঁর মধ্যে একধরণের চার্বাকধর্মী ভারতীয় বস্তুবাদের প্রতিফলন

লক্ষ করা যায়, যদিও তা মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বাস্তুবাদী দর্শনের অনুসারী নয়। তিনি বলেছেন: যে ভগবান আমাকে এক টুকরো রুটি দিতে পারবেন না। তিনি স্বর্গে আমাকে অনন্ত শান্তি প্রদান করবেন, তাঁকে আমি বিশ্বাস করি না।[৪৩] গীতার চেয়ে ফুটবলের মধ্য দিয়ে স্বর্গ নিকটতর।[৪৪] যে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক মহুয়া ফুলের রস খেয়ে জীবন ধারণ করে, সেখানে একি ধর্ম, না শয়তানের তাণ্ডব নৃত্য?[৪৫] ভাববাদী উপাদানের অস্তিত্ব সত্ত্বেও এইসব উক্তির মধ্যে যতটুকু বস্তুবাদী মর্মবস্তু রয়েছে তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

বিবেকানন্দ নির্বাণের মধ্যেই সৃষ্টির অন্ত খোঁজেননি। পার্থিব সব জটিল বাস্তব সমস্যাকে তিনি প্রচণ্ড গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা বলছেন: স্বামীজী সমাজব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন চেয়েছিলেন।[৪৬] নবভারতের গঠনের এই ভবিষ্যৎদ্রষ্টার আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে তিনি যে সংক্ষিপ্ত কর্মসূচী দিয়ে গেছেন তার মূল কথা হল, ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পুনর্গঠন। ভারতের পুনরুজ্জীবনের এর চেয়ে বৈপ্লবিক সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মসূচী আর কে-ই বা দিয়েছেন?[৪৭] তিনি রাজনীতিক দিক দিয়ে ছিলেন বিপ্লববাদী।[৪৮] তাই দ্বিতীয়বার ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তন করবার পর স্বামীজীর সঙ্গে এক তরুণ বেলুড়ে সাক্ষাত করতে গেলে তাঁকে বলেছিলেন, এখন ভারতের প্রয়োজন হচ্ছে বোমা।[৪৯] প্রসঙ্গত বলা বাহুল্য হবে না যে তিনি স্বদেশের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতেই বিপ্লবের চরিত্র ও প্রকৃতি নির্ধারণে উৎসাহী ছিলেন: যে মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছো, সেটা কত শক্ত তা বুঝে অগ্রসর হও, ক্রমে ওপরে ওঠবার চেষ্টা কর।[৫০] স্তালিনও একথা বলেছিলেন: যারা নিজেদের দেশের মাটির সঙ্গে যুক্ত নয়, তারা শুকিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে।[৫১] এই দৃষ্টিকোণ থেকে মাও সে-তুংও 'বাস্তবভিত্তিক মার্কসবাদে'র প্রতি তুমুল গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের মতো বিবেকানন্দও মনে করতেন: মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। স্বামীজীর মতে: পৃথিবীতে যত সম্পদ আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান হলো মানুষ।[৫২] তাই জনতাগণই ভারতের একমাত্র ভরসা।[৫৩] ১৮৪৫ সালে প্রকাশিত 'হোলি ফ্যামিলি' নামক গ্রন্থে মার্কস ও এঙ্গেলস বলছেন: বড় মানুষেরা নন, জনসাধারণই ইতিহাসের প্রকৃত স্রষ্টা।[৫৪] প্লেখানভ লিখছেন:...কে ইতিহাস তৈরী করে? সামাজিক মানুষই এর স্রষ্টা, সেই প্রধান এবং একমাত্র উপাদান।[৫৫] স্বামীজীও এই বক্তব্যের সঙ্গে একাত্মিক: বড় মানুষেরা কোন্ কালে কোন্ দেশে কার কি উপকার করেছে? সকল দেশেই বড় বড় কাজ গরীবরা করে।

বিবেকানন্দ যতটা না বাস্তববাদী তার চেয়ে বেশি অধ্যাত্মবাদী। একথা ঠিক। কিন্তু তাঁর কাছে আধ্যাত্মিকতার অর্থই হলো: সত্যোপলব্ধি, চরিত্রসৃষ্টি। বিবেকানন্দের ধর্মসাধনা জীবনবিচ্ছিন্ন আত্মকেন্দ্রিক সাধনা ছিলো না। তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তার কেন্দ্রবীজ ছিলো মানুষ ও মানুষের সমাজ। তাই তিনি 'নতুন

মানুষ' গড়ার ওপর বেশি জোর দিয়েছিলেন। তিনি মানুষকে শিকড়সুদ্ধ নাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন : ব্যক্তির সত্তার উপরে তিনি যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন তার প্রয়োজনীয়তা আমাদের জীবনধারায় যে অপরিসীম, তা বলাই বাহুল্য। ব্যক্তির মুক্তির প্রশ্ন নিয়ে ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসও গভীরভাবে চিন্তা করেন। তাঁর "অ্যানটি ড্যুরিং" গ্রন্থে এই বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে এঙ্গেলস লেখেন : 'society cannot free itself unless each individual is freed' (প্রতিটি ব্যক্তি মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সমাজ নিজেকে মুক্ত করতে পারে না)।[৫৬] তবে সমাজতন্ত্রে ব্যক্তির মুক্তি বলতে বোঝায় 'সশ্রম মুক্তি', বস্তুবাদী মানবিকতার উজ্জ্বল স্বীকৃতি : আত্মোৎপন্নবঞ্চিত ব্যক্তিত্বের কারাগার থেকে মুক্ত করে মানুষকে খোলা হাওয়ার উন্মুক্ত প্রান্তরে নিয়ে আসা। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে 'সমাজতান্ত্রিক আত্মিক সভ্যতা' (socialist spiritual cultivation) গড়ে তোলার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে : 'আত্মিক সভ্যতা' বলতে যা কিছু বোঝায়, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে সেগুলির প্রকৃতি নির্দেশ করতে 'সমাজতান্ত্রিক আত্মিক সভ্যতা' আখ্যাটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 'সমাজতান্ত্রিক আত্মিক সভ্যতার' গঠনক্ষেত্র দুটি ভাবাদর্শের ক্ষেত্র এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র। সাম্যবাদী ভাবধারায়ই সমাজতান্ত্রিক আত্মিক সভ্যতার মর্ম, এবং এই কারণে পুঁজিবাদী আত্মিক সভ্যতার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক আত্মিক সভ্যতার মর্ম, এবং এই কারণে পুঁজিবাদী আত্মিক সভ্যতার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক আত্মিক সভ্যতার আকাশ-পাতাল পার্থক্য।[৫৭] বিবেকানন্দের সমাজভাবনাতেও এই আত্মিক সংস্কৃতির উজ্জ্বল ইঙ্গিত পাওয়া যায়। খাঁটি মানুষ নতুন মানুষরাই সুস্থ-সবল শোভন সমাজগঠনের প্রাণবন্ত ইন্ধন যোগাতে পারে বলে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। এই খাঁটি মানুষ গড়ার দায়িত্ব পালনে বিবেকানন্দকে আমাদের উত্তুঙ্গ মর্যাদা দিতে হবে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। কারণ সমাজবিজ্ঞানে একথা সুবিদিত যে মনোজগতেই জাগে প্রথম বিপ্লব ; পরে উহা বস্তুজগতে বিস্ফোরিত হয়।[৫৮] স্বামীজী শূদ্র জনগণের উন্নতিসাধনের জন্য চেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার ও প্রসার, ব্যক্তিত্বের উদ্‌বোধন : তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে তারা জানিতে পারে—জগতে কোথায় কি হইতেছে। তাহা হইলে তাহারা নিজেদের উদ্ধার নিজেরাই সাধন করিবে।[৫৯] মার্কসও একথা বলেছেন : শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি শ্রমিক শ্রেণীরই নিজস্ব কাজ হতে হবে।[৬০] তাই এদিক থেকে প্রতিটি মার্কসপন্থী বিপ্লবীর কর্তব্য বিবেকানন্দীয় দর্শনের বাস্তব অংশটি সাদরে গ্রহণ করা। পার্থক্য নিরূপণ করে বলা যায় : মার্কসবাদের সঙ্গে তাঁর মৌলিক অমিল এই যে তিনি ধর্মকে লেনিনের ভাষায় 'opium of the people' বলে মনে করেননি। দ্বিতীয়তঃ মার্কসের দ্বান্দ্বিক (Dialecties) প্রণালীতে বস্তুতন্ত্রী বিচারবিশ্লেষণও তাঁর মতের পরিপন্থী। তৃতীয়তঃ প্রয়োজনে হিংসাত্মক কাজকে কিছুটা সমর্থন করলেও বিবেকানন্দের চিন্তায় মার্কসীয় শ্রেণীসংগ্রাম ও রক্তঝরা বিপ্লবের স্থান ছিল না।

তবে মার্কসের সঙ্গে তাঁর কিছু কিছু মিল থাকা খুবই স্বাভাবিক ; কারণ প্রাক্-মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তা উভয়েরই মনকে স্পর্শ করে।[৬১]

স্বামীজী মার্কসবাদীও ছিলেন না, তিনি অর্থনীতিবিদও নন। কিন্তু তাঁর ভবিষ্যৎদৃষ্টি দিয়ে তিনি ভারতে শ্রেণীহীন, জাতিভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং নতুন সংস্কৃতি প্রবর্তনের কর্মসূচী দেশবাসীকে দিয়ে গেছেন।[৬২] তাই প্রখ্যাত মার্কসতাত্ত্বিক বিনয় রায় বলছেন : বিবেকানন্দ মহৎ ছিলেন এই কারণে যে তিনি তাঁর দেশ এবং দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি নিখাদ সততার সঙ্গে অনুভব করেছিলেন দেশের সম্মুখে যে বিরাট সমস্যা উপস্থিত তার সমাধানকল্পে কোনোরকম আংশিক সংস্কারই যথেষ্ট নয়, এর জন্য চাই মানসিক, দৈহিক, সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে সর্বাত্মক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি প্রকাশ্যে নিজেকে একজন সমাজতন্ত্রী বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং বলিষ্ঠ প্রত্যয় সহকারে বলেছিলেন : নতুন যুগ আসবেই—যখন শ্রমজীবী শ্রেণী তথা শূদ্র জনগণ হবে সবকিছুর শাসনকর্তা।[৬৩] কিন্তু মার্কস কথিত প্রোলেতারীয় একনায়কত্বের সঙ্গে বিবেকানন্দের শূদ্র জাগরণের আপাত মিল থাকলেও মৌল পার্থক্য আছে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসের প্রগতির ব্যাখ্যা না করে বিবেকানন্দ বিবর্তনের একটি ধর্ম ও দর্শননির্ভর ভাববাদী ভাষ্য রচনা করেছিলেন এইভাবে : যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যর জাগরণের পর শূদ্র জাগরণ ঘটবে কিন্তু চক্রটি পরিবর্তিত হওয়ায় শূদ্র জাগরণের শেষে আবার ব্রাহ্মণদের আধিপত্য দেখা দেবে। তাঁর সময় ও সমাজের পটভূমিতে এই ভাষ্য স্বাভাবিক মনে হলেও আজকের দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেকানন্দের শূদ্র জাগরণের তত্ত্বটিকে পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন থেকে যাচ্ছে।

উৎস নির্দেশ

১। নিরঞ্জন ধর, বিবেকানন্দ অন্য চোখে, উৎস মানুষ সংকলন, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃঃ ৬৬।

২। দ্রষ্টব্য : শিবনারায়ণ রায়, ফুলে থেকে আম্বেদকার : এক অসমাপ্ত বিপ্লব, জাতপাতের রাজনীতি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৯।

৩। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃঃ ২৫০।

৪। স্বামী বিবেকানন্দ, জাতি সংস্কৃতি ও সমাজতন্ত্র, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃঃ ৪৫।

৫। তদেব, পৃঃ ৫৪।

৬। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৭৭।

৭। তদেব, পৃঃ ২৩৫-৩৬।

৮। দ্রষ্টব্য : স্বামী বিবেকানন্দ, জাতি সংস্কৃতি ও সমাজতন্ত্র, পূর্বোক্ত।

৯। এমিল বার্নস, মার্কসবাদ, এন বি এ, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ ১৪।

১০। স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতের পুনর্গঠন, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃঃ ১৩।

১১। স্বামী বিবেকানন্দ, জাতি সংস্কৃতি ও সমাজতন্ত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৫।

১২। স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতের পুনর্গঠন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১।

১৩। স্বামী বিবেকানন্দ, জাতি সংস্কৃতি ও সমাজতন্ত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫।

১৪। উদ্ধৃত : মরিস কর্ণফোর্থ (অনুবাদ : ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, প. ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃঃ xxvii।

১৫। K. Marx and F. Engels, Menifesto of the Communist Party, Progress Publishers, Moscow, 1975, p. 40.

১৬। স্বামী বিবেকানন্দ, জাতি সংস্কৃতি ও সমাজতন্ত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫।

১৭। স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতের পুনর্গঠন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩।

১৮। তদেব, পৃঃ ২৫।

১৯। দ্রষ্টব্য : এম. এন. শ্রীনিবাস, সংস্কৃতিকরণ, ভারতের সমাজভাবনা (সজল বসু সম্পাদিত), প্রথম খণ্ড, প্রাচী পাবলিকেশনস্‌, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃঃ ৬৭।

২০। পরিমলচন্দ্র ঘোষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূলসূত্র, প. ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮০, পৃঃ ১৫৯।

২১। Quoted in, V. Brodov, Indian Philosophy in Modern Times, Progress Publishers, Moscow, 1984, pp. 290-91.

২২। স্বামী বিবেকানন্দ, জাতি সংস্কৃতি ও সমাজতন্ত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৪।

২৩। উদ্ধৃত : নিরঞ্জন ধর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬৪।

২৪। তদেব।

২৫। দ্রষ্টব্য : শঙ্করীপ্রসাদ বসু, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ষষ্ঠ খণ্ড), মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৮৫।

২৬। নিরঞ্জন ধর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭৯।

২৭। স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতের পুনর্গঠন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫।

২৮। তদেব, পৃঃ ১০।

২৯। স্বামী বিবেকানন্দ, বর্তমান ভারত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃঃ ৩৩।

৩০। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৬৩।

৩১। স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতের পুনর্গঠন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১।

৩২। শিবরাম চক্রবর্তী, মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী, আজকাল, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ ৩৮।

৩৩। বীতশোক ভট্টাচার্য, হাজার বছরের বাংলা কবিতা, বাণীশিল্প, কলকাতা, ১৩৮৮, পৃঃ ১৬২।

৩৪। উদ্ধৃত : সুজিত সেন, বিবেকের দিকে, চৈতী, এপ্রিল-মে, ১৯৮৬, পৃঃ ৪০।

৩৫। ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ, ২য় খণ্ড, বিচ্ছিন্নতা ও বর্তমান, মানব মন, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ২৩০।

৩৬। অমলেশ ত্রিপাঠী, ভারতের মুক্তিসংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব, আনন্দ পাব ~শার্স, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃঃ ৩৪।

৩৭। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১১১।

৩৮। Quoted in, N. P. Aneckiv, Modern Ideological struggle for the Ancient Philosophical Heritage of India, Indian Studies : Past and Present, Calcutta, 1969, p. 44.

৩৯। A. L. Morton, The English utopia, Seven Seas Publishers, Berlin, 1968. pp. 105-6.

৪০। পর্যবেক্ষক, রথের রশি, অনীক, আগস্ট, ১৯৮৮, পৃঃ ২৮।

৪১। উদ্ধৃত : রেন থাও সম্পাদিত, চীনা-ধাঁচের আধুনিকীকরণ, বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়, পেইচিং (চীন), ১৯৮৬, পৃঃ ১৩৫-১৩৬।

৪১ ক.। অকাদিমিশিয়ান ইপি চেলিশেভ, সৌন্দর্য এবং প্রজ্ঞা—মৌলিক ও কৃত্রিম, সময় সরণি, বর্ষ ৮ সংখ্যা ৮-৯, ১৯৮৯, পৃঃ ৪৩।

৪২। উদ্ধৃত : ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১০৩।

৪৩। তদেব, পৃঃ ৫।

৪৪। তদেব, পৃঃ ১।

৪৫। তদেব, পৃঃ ১০।

৪৬। তদেব, পৃঃ ১২।

৪৭। তদেব, পৃঃ ২২।

৪৮। তদেব, পৃঃ ২।

৪৯। তদেব, পৃঃ ১৬৩।

৫০। উদ্ধৃত : স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতের পুনর্গঠন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬।

৫১। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৩।

৫২। Quoted in, V. Brodov, op. cit, p. 284.

৫৩। উদ্ধৃত : ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬।

৫৪। উদ্ধৃত : অমলেন্দু দে, স্বামী বিবেকানন্দের সমাজভাবনা ও তার প্রাসঙ্গিকতা, চতুরঙ্গ, ৪৯ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, আগস্ট ১৯৮৮, পৃ পৃঃ ৩২৮-২৯।

৫৫। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৮৩।

৫৬। অমলেন্দু দে, চতুরঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪০-৪১।

৫৭। রেন থাও সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৩০।

৫৮। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৬২।

৫৯। উদ্ধৃত : স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতের পুনর্গঠন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১।

৬০। উদ্ধৃত : অমলেন্দু দে, চতুরঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২৯।

৬১। সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃঃ ২৪৬।

৬২। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৪০।

৬৩। Binoy K. Roy, Socio-political Views of Vivekananda, Peoples Publishing House, New Delhi, 1979, p. 63: